ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত

আশকার ইবনে শাইখ

মদীনা পাবলিকেশান্স

ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত

আসকার ইবনে শাইখ

মদীনা পাবলিকেশান্স
মদীনা ভবন ঃ ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।
শাখা অফিস ঃ ৫৫/বি পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০।

ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত

আসকার ইবনে শাইখ

প্রকাশক ঃ
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রথম সংস্করণ ঃ
রমযান ঃ ১৪১৪ হিজরী
ফাল্গুন ঃ ১৪০০ বাংলা
ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৯৪ ইংরেজী

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
যিলহজ্জ্ব ঃ ১৪২২
ফাল্গুণ ঃ ১৪০৮
ফেব্রুয়ারী ঃ ২০০২

বর্ণ মুদ্রণ ঃ মদীনা গ্রাফিক্স সিস্টেমস
৫৫/বি, পুরানা পল্টন (দোতালা) ঢাকা-১০০০। ফোনঃ ৭১১০৪৬০

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ৮০ টাকা মাত্র।

ISBN-984-8367-024-0

Crusader Itibritta

An analytical account of Crusades, written by Askar Ibne Shaikh and published by the Madina Publications, 38/2, Bangla Bazar, Dhaka-1100; First Edition, February 1994; Second Edition, February 2002; Price Tk. 100, US$ 7.

ভূমিকা

আসকার ইবনে শাইখ মূলতঃ একজন নাট্যকার হিসাবেই সুপরিচিত। বিগত প্রায় পাঁচ দশক ধরে নাটক রচনা, মঞ্চায়ন, অভিনয় ও পরিচালনার ক্ষেত্রে একটানা অবদান রেখে তিনি নাটকের ক্ষেত্রে নিজেই এক জীবন্ত ইতিহাস হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, নাটক ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গনেও তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা। তাঁর নাট্যপ্রয়াসের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে ইতিহাস-আশ্রিত নাটক। ইসলামের ইতিহাস এবং বাংলা-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় অত্যন্ত জীবন্ত রূপে উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন নাটকে। অথচ আশ্চর্য, কোথাও ইতিহাসের সত্য এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি। তাঁর বিভিন্ন ঐতিহাসিক নাটক-গ্রন্থ পড়তে যেয়ে বারবার মুগ্ধ হয়েছি ইতিহাস-গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য সাফল্যে। কিন্তু এবারে আর নাটকের মাধ্যমে নয়- বিশ্ব-ইতিহাসের এক তাৎপর্যময় অধ্যায়ই তিনি সরাসরি তুলে ধরেছেন "ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত" নামক গবেষণা-গ্রন্থের মাধ্যমে।

একাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত খৃস্টীয় ইউরোপ জেরুজালেম উদ্ধারের নামে মুসলিম-বিদ্বেষ সঞ্জাত যে দানবীয় তাণ্ডবলীলা চালায় মুসলিম এশিয়া-আফ্রিকার বুক জুড়ে, বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যে, ইতিহাসে সেটাই 'ক্রুসেড' হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছে। সে ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটেছিল ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু খৃস্টীয় ইউরোপ সে পরাজয়কে যে বহুদিন ধরে মেনে নিতে পারেনি তার প্রমাণ মেলে পরবর্তীকালে বারবার তাদের মুসলিম শক্তি নির্মূল অভিযান থেকে। ইতিহাসে এই পর্ব পরিচিত হয়ে আছে 'পরবর্তী ক্রুসেড' নামে। 'পরবর্তী ক্রুসেড'- এর পরও দেখা যায় 'আরও পরবর্তী ক্রুসেড'। কিন্তু তারপর?

আসকার ইবনে শাইখ খৃস্টান, হিন্দু প্রভৃতি অমুসলমান সূত্রের দলিল-দস্তাবেজ থেকেই প্রমাণ করেছেন, ক্রুসেড কখনও শেষ হয়নি। অন্ততঃ ১৯১৭ পর্যন্ত খৃস্টীয় ইউরোপের মন থেকে ক্রুসেড বিকার দূর হয়নি। আসকার আরও দেখিয়েছেন- ক্রুসেড এখনও শেষ হয়নি। বসনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর তার প্রমাণ।

আসকার ইতিহাস লেখেননি। একাদশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত বিশাল সময়ের খৃস্টীয় প্রতীচ্যের মুসলিম-বিদ্বেষের ধারাবাহিক ইতিহাসের একটা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন তিনি। ইতিহাসের সাদামাটা বিবরণী তুলে ধরার চাইতে ইতিহাসের ধারার অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কার করা চিরকালই কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজে আসকার অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আসকার অমুসলিম সূত্রের তথ্য দিয়েই প্রমাণ করেছেন, একাদশ শতকের জেরুজালেম উদ্ধারের নামে নারকীয় তাণ্ডবলীলা, আঠার শতকের পলাশী আর হাল আমলের বসনিয়া একই সূত্রে গাঁথা।

মূলতঃ নাট্যকার বলেই বোধ হয় আসকারের গদ্য রচনা, এমন কি ইতিহাসের ভাষায়ও থাকে এক ধরনের নাটকীয় আমেজ, যার ফলে গদ্য পাঠ করতে যেয়েও গদ্যপাঠের হয়রানিতে ভুগতে হয় না। বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে এ গ্রন্থ বিশ্বমুসলিমের চোখ খুলে দিতে বিপুলভাবে সাহায্য করবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি লেখক ও প্রকাশককে যথাক্রমে এই মূল্যবানগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

ঢাকা
২১ নভেম্বর ১৯৯৩ ইং

আবদুল গফুর

প্রসঙ্গত

একাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে মুসলিম-অধিকার থেকে 'পবিত্র ভূমি' জেরুযালেম উদ্ধারের নামে ইউরোপের খৃষ্টান সেনাবাহিনী ও লোকদের রক্তক্ষয়ী 'ধর্মযুদ্ধের' বিভিন্ন অভিযানকেই 'ক্রুসেড' বলা হয়ে থাকে। খৃস্টান বাহিনীর শ্লোগানে জেরুযালেম উদ্ধারের সঙ্কল্প উচ্চারিত থাকলেও কার্যতঃ এসব যুদ্ধাভিযান ছিল সমগ্র আফ্রো-এশীয় মুসলিম শক্তি তথা মুসলিম উম্মাকে নির্মূল করার দানবীয় বাসনা। যে 'পবিত্র ভূমি' উদ্ধারের নামে খৃস্ট-শক্তির তরফ থেকে এই রক্তলোলুপ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ, সেই 'পবিত্র ভূমি'র অধিকার সংক্রান্ত কিছু পূর্বকথা ঃ

পবিত্র কোরআনুল করীমের উল্লেখ অনুযায়ী 'পবিত্র ভূমি' হচ্ছে সমগ্র সিরিয়া। এই ভূভাগটিতে বর্তমান মসজিদে-আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ওফাতের পর সুদীর্ঘকালের মধ্যে এমন ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যার সারমর্ম এই যে "বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলার ফয়সালা ছিল এই ঃ তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না, বরং তাদের পরম প্রিয় কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। .... কোরআন পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা মুসা (আঃ)-এর শরীয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা ঈসা (আঃ) এর আমলের। উভয়ক্ষেত্রেই বনী-ইসরাঈল সমকালীন শরীয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপূজক সম্রাটকে তাদের উপর এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্রাটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃতের পুরীতে পরিণত করে দেয়"। (পবিত্র কোরআনুল করীম-বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর, মূল ঃ তফসীরে মাআরেফুল ক্বোরআন, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রহঃ), অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ্ ফাহদ, কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পৃঃ ৭৬৭)।

এরপরেও বহুদিন চলেছে জেরুযালেমের অধিকার নিয়ে বিভিন্ন শক্তির হয়রানি এবং শেষ পর্যন্ত তা এসেছে নবধর্মী খৃস্টানদের অধিকারে। অতঃপর পূর্ণ-দ্বীন ইসলামের আর্বিভাবের পর ৬৩৪ খৃস্টাব্দে হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সেনাপতি আমর ইবনুল আ'স খৃস্টানদের নিকট থেকে জেরুযালেম দখল করেন এবং খলিফা স্বয়ং জেরুযালেমে উপস্থিত হয়ে খৃস্টানদের কাছ থেকে শহরের হস্তান্তর গ্রহণ করেন। খলিফারই নির্দেশে সেখানে অক্ষুণ্ন রাখা হয় সকল মতাবলম্বীর ধর্মীয় স্বাধীনতা। তবুও পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, জেরুযালেম হারানোর তীব্র জ্বালা বিদ্যমান ছিল ইহুদী-খৃস্টানদের মনে। এখানে উল্লেখ্য যে, মূল সংজ্ঞানুযায়ী ইহুদী হল বণী-ইসরাঈলের সেই জনগোষ্ঠীর লোকেরা যারা হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্ম অনুসরণের দাবী করে। আর প্যালেস্টাইনে জন্মগ্রহণকারী হযরত ঈসা (আঃ) বা যীশু খৃস্টের ধর্মানুসারী বলে দাবী করে খৃস্টানরা। এই হিসাবে হযরত দাউদ (আঃ), হযরত মুসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) ও সর্বশেষ ইসলামের মহান নবীজি (সাঃ)-এর মে'রাজ গমনের স্মৃতি বুকে ধারণকারী মসজিদুল আকসা তথা সমগ্র জেরুযালেম যেমন মুসলমানদের কাছে, তেমনি ইহুদী-খৃস্টানদের কাছেও 'পবিত্র ভূমি' হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

কিন্তু কালপ্রবাহে তথাকথিত রাজতন্ত্রী মুসলিম 'খেলাফত' যখন প্রকৃত ইসলাম থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়ে ভোগ-বিলাস আর শান-শওকতের চোরাবালিতে আটকা পড়ে শক্তিহীন, তখনই খৃস্টান বাহিনী ১০৯৬ খৃস্টাব্দে মুসলিম-অধিকার থেকে জেরুযালেম উদ্ধারের অছিলায় বিভিন্ন মুসলিম শক্তি-কেন্দ্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চরম দানবীয় আক্রোশে। খৃস্টান ঐতিহাসিক হিট্টির কথায়, "ক্রুসেড ছিল মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে খৃস্টান প্রতীচ্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ"। অন্য ঐতিহাসিক গীবনের কথায় "খৃস্টান ইউরোপের অর্বাচীন, বর্বর ও অশিক্ষিত লোকেরাই ক্রুসেডে যোগদান করে"।

কিন্তু কেন সংঘটিত হয়েছিল এই ক্রুসেড? কেন ঘটেছিল মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে খৃস্টান প্রতীচ্যের এই তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ? তারই এক বিশ্লেষণধর্মী বিবরণ দেওয়ার প্রয়াস রয়েছে এই 'ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে। একথা অনস্বীকার্য যে ধর্মীয় সামাজিক-বাণিজ্যিক-মনস্তাত্বিক কারণসমূহ বিদ্যমান থাকলেও ধর্মীয় কারণটিই ছিল সর্বপ্রধান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়-পূর্ণ-দ্বীন ইসলামের আবির্ভাবের আগে জেরুযালেম বিভিন্ন জীবনবিশ্বাসী জাতির অধিকারে এসেছে, বিভিন্ন রাজ্য-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ফলে জেরুযালেমেরও হস্তান্তর ঘটেছে। তবুও তো সেসব বিভিন্ন জীবনবিশ্বাসী জাতির মধ্যে সংঘটিত হয়নি এমন রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড। হয়েছে শুধুমাত্র মুসলিম-শক্তির বিরুদ্ধে। তাহলে তো ধর্মীয় কারণটিই ছিল এর প্রধানতম চালিকা-শক্তি। বস্তুতঃ ইসলামের আবির্ভাব গ্রীক ও রোমান সভ্যতার প্রতি ছিল এক বিরাট হুমকি। শুধুমাত্র মুসলিম সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তৃতির জন্য নয়, তওহিদভিত্তিক ইসলামী সংস্কৃতি-সভ্যতার বাস্তব অবদানে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ধারা ও প্রভাব ব্যাহত হচ্ছে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সমগ্র ইউরোপ। তাই ইসলাম ধ্বংসের উদগ্র বাসনাই ইউরোপকে উম্মাদপ্রায় করে তুলেছিল। ধর্মীয় কারণ ছাড়া অন্যান্য কারণ ছিল খৃস্টান সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী সহায়ক মাত্র।

১০৯৫ খৃস্টাব্দের শেষ থেকে ১২৯১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জারি ছিল খৃস্ট-শক্তির আরম্ভ করা এই ক্রুসেড এবং তারই জবাব হিসাবে মুসলিম শক্তির জেহাদ। প্রথম পর্যায়ে খৃস্টানরা বিজয়ী হলেও পরবর্তী দু'টি পর্যায়ে জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বিজয়ী হয় মুসলিম-শক্তি।

১২৯১ খৃস্টাব্দের পরেও জারি ছিল এই ক্রুসেড, যদিও তার উত্তেজনা তখন নিঃশেষপ্রায়। ইতিহাসে সেসব ক্রুসেড 'পরবর্তী ক্রুসেড' নামে অভিহিত; আর তাতেও পরাজিত হয় খৃস্ট-শক্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম-শক্তি এই বিজয়ের ফসল ঘরে তুলে সমৃদ্ধশালী হতে পারে নি; বরং বিজিত খৃস্টানরাই রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূর্যালোকে স্নাত হয়ে বিভূষিত হল নবযুগ স্রষ্টার গৌরবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, খৃস্টানদের করায়ত্ত এই নবযুগে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-কৌশলে-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা মুসলিম প্রতিপক্ষকে ধ্বংসের নবতর উপায় উদ্ভাবনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। ফলে, মধ্যপ্রাচ্য ও প্রাচ্যাংশের এই ভারতবর্ষেও তারা ছুটে আসে নিজ স্বার্থ উদ্ধার ও

বহুকালপোষিত মুসলিম-বিদ্বেষ চরিতার্থতার লক্ষ্যে। মুসলিম শক্তির অযোগ্যতা ও চরিত্রহীনতার সুযোগে তারা সে-লক্ষ্য অর্জনে সফলও হয়। ভারতবর্ষের মুসলিম মুঘল-শক্তিকে ধ্বংস করে তারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হয়ে বসে। ইউরোপীয় খৃস্ট-শক্তির এসব কর্মকাণ্ডকেই আমরা চিহ্নিত করেছি 'আরও পরবর্তী ক্রুসেড' রূপে।

একেবারেই হালে আমরা পৃথিবীময় কি দেখতে পাচ্ছি? বসনিয়ায়, ফিলিস্তিনে, কাশ্মীরে ও ভারতের নানা স্থানে এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগে? মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টান-ইহুদী-ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির এসব কর্মকাণ্ড কি সেই ক্রুসেডকেই স্মরণ করিয়ে দেয় না?

এমনি পরিস্থিতিতে ইসলাম অনুসারীদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন তো জরুরী হয়েই দাঁড়ায়। এবং এই আত্মরক্ষা যেহেতু বৈরী শক্তির সঙ্গে মোকাবিলারই নামান্তর মাত্র, সেহেতু মোকবিলার প্রতি প্রান্তরে যোগ্যতা অর্জনই হবে মুসলিম উম্মার আশু করণীয় কাজ। সে যোগ্যতা জ্ঞান-গুণ ও শক্তি অর্জনের মাধ্যমে শত্রুর মোকাবিলা করার যোগ্যতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা, সর্বোপরি মানব মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ্-রসুলের নির্দেশিত-অনুসৃত পথে চলবার যোগ্যতা। এসব যোগ্যতা অর্জন করেই শুধু আমরা আশা করতে পারি আল্লাহ্র রহমত। অন্যথায়, পবিত্র কোরআনুল করীমের আলোকে পূর্বে-উদ্ধৃত বণী-ইসরাঈল প্রসঙ্গ টেনে বলা যায়, "বণী-ইসরাঈলদের এসব ঘটনা কোরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ এই যে, মুসলমান এ খোদায়ী বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, শান-শওকত, অর্থ-সম্পদও আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফেরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, যাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহেরও অবমাননা হবে"। (প্রাগুক্ত, ৭৬৮)

'ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত' প্রথমে প্রবন্ধ-সিরিজ হিসাবে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়। এজন্য ইনকিলাব কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ করে এর ফিচার সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গফুর সাহেবের নিকট, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখন মাসিক মদীনা সম্পাদক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব 'ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত'কে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে আমাকে প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ করলেন। 'ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত' পাঠকবৃন্দের কাছে আমার বক্তব্য যথাসম্ভব তুলে ধরতে পারলে নিজের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা — বিনীত

১ নভেম্বর ১৯৯৩ ইং — আসকার ইবনে শাইখ

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতরণিকা

ক্রুসেডের অর্থ ধর্মযুদ্ধ হলেও ১০৯৫ সাল থেকে আরম্ভ করে ১২৯১ সাল পর্যন্ত চলমান ক্রুসেডগুলো কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠা প্রচার কিংবা রক্ষার জন্য সংঘটিত কোন যুদ্ধক্রম ছিল না। তা ছিল ভৌগোলিক ও ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিম ও খৃস্টান বলে চিহ্নিত দু'টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একের বিরুদ্ধে অন্যের, প্রকৃত প্রস্তাবে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সীমাহীন ঘৃণা-বিদ্বেষ ও নির্মূল করে দেওয়ার তীব্র বাসনার প্রকাশরূপে এক উন্মুক্ত রক্ত-খেলা, আফ্রো-এশীয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় খৃস্টানদের এক দানবিক ধ্বংসোল্লাস, বৃহত্তরভাবে প্রাচ্যের বিরুদ্ধে প্রতীচ্যের এক নির্মম মোকাবিলা।

কেন সংঘটিত হয়েছিল এসব ভয়ঙ্কর ক্রুসেড যার মাধ্যমে অগণিত আদম সন্তানের অসহায় রক্ত-খেলায় রচিত হল মানবেতিহাসের এক চরম কলঙ্ক-কাহিনী?

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক হিট্টির কথায়, "ক্রুসেড ছিল মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে খৃস্টান ইউরোপের তীব্র প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ'। অন্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিক গীবনের মতে, "খৃস্টান ইউরোপের অর্বাচীন, বর্বর ও অশিক্ষিত লোকেরাই ক্রুসেড যোগদান করে"।

মুসলিম প্রাচ্যের এমন কি কর্মকাণ্ড খৃস্টান ইউরোপের উপর বিরূপ 'ক্রিয়া' সৃষ্টি করেছিল যার, 'তীব্র প্রতিক্রিয়া' রূপে সংঘটিত হল এই ধ্বংসলীলা? রোমীয় ধর্ম-রাজ্যের অধিকর্তা পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বানে সাড়াদানকারী ইউরোপের তদানীন্তন যেসব রাজন্যবর্গ কর্তৃক সংগঠিত 'অর্বাচিন-বর্বর-অশিক্ষিত' লোকদের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রাচ্যের উপর, তাঁরাও কি ছিলেন অর্বাচীন-বর্বর-অশিক্ষিত? আক্ষরিক অর্থে তা তো সত্য নয়! তাহলে?

এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে দু'টি পক্ষেরই ক্রুসেড-পূর্বকালীন সার্বিক অবস্থা, অন্য কথায়, ক্রুসেডের পেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

প্রতীচ্য-প্রাচ্যের পূর্বকথা

হেলেনীয় যুগে এরিস্টটলের ভাবশিষ্য আলেকজাণ্ডার গুরুর মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন এক বিশাল সাম্রাজ্য। সে সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল গ্রীস, আলতোনিয়া, মেসোপটেমিয়া, মিশর, পারশ্য এবং সিন্ধু অববাহিকার বিরাট এলাকা পর্যন্ত। এই যুগে গ্রীক ভাষা লাভ করে এক আন্তর্জাতিক মর্যাদা এবং মিশরে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত নগরী আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে ওঠে সুবিখ্যাত এক বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরি শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। বাণিজ্যিক এলাকা ভূমধ্যসাগরে আর সীমাবদ্ধ না থেকে তা বিস্তৃত হয় মধ্যইউরোপ থেকে উত্তর আফ্রিকা এবং আটলান্টিক উপকূল ও চীন পর্যন্ত। কিন্তু অচিরেই ঘনিয়ে আসে গ্রীকদের পতনকাল।

ম্যাসিডোনীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে দরিদ্র, বেকার, অসন্তুষ্ট জনসাধারণ ও দাসদের বিপ্লবী আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অনেক স্থানেই বিদ্রোহীরা ধনী ভূস্বামীদের

সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়। এ অবস্থায় দাস মালিকেরা রোমানদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। রোমানরা ইতিপূর্বেই খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে গ্রীসও কতক গ্রীক রাজ্য দখল করে নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। গোড়া থেকে দাস-ব্যবস্থার উপরই নির্মিত হয়েছিল এই রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি। রোমানরা ছিল অভিজাতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সিনেট শাসিত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। এদিকে গ্রীক আমল থেকে চলে আসা অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা রোমান আমলেও চলতে থাকে। এই মন্দাবস্থা কাটতে আরম্ভ করে তাদের দেশ জয়ের মাধ্যমে। ক্রমে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, কার্থেজের রাজ্যসমূহ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিশর। তবুও খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষার্ধে রোমান অভিজাতদের মধ্যে দেখা দেয় গৃহবিবাদ। ফলে, সিনেটীয় প্রজাতন্ত্র রূপান্তরিত হয়ে সে স্থলে প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রেরই অনুরূপ এক শাসন। গৃহবিবাদ থেকে উদ্ভূত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, অতঃপর বংশানুক্রমিক শাসন, আবার গৃহযুদ্ধ এবং অবশেষে গথ, হুন, ভ্যাণ্ডল, মঙ্গোল প্রভৃতি 'বর্বর' জাতিসমূহের আক্রমণে নড়বড়ে হয়ে যায় রোমান সাম্রাজ্যের ভিত।

এমনি অবস্থায় সাম্রাজ্যে রোমান আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণের যে প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করা হয়, তাতে করে গড়ে ওঠে প্রথমে ছোট বড় চারটি রাজধানী এবং পরে কালক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত বেশ ক'টি রাজ্যাংশ। দুইভাগে বিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশে ও পূর্বাংশে একজন করে 'অগাস্টাস' বলে অভিহিত অধিকর্তা এবং তাঁদের অধীনে প্রতি অংশে একটি করে দু'টি ছোট রাজধানীতে 'সিযার' নামে অভিহিত দু'জন শাসনকর্তা। এড্রিয়াটিক সাগরের পশ্চিমের জনপদ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। রাভেন্না প্রকৃত প্রস্তাবে তার প্রশাসনিক হলেও রোমই থাকে তার রাজধানী।

আর এ ব্যবস্থারই সূত্র ধরে গড়ে উঠা রাজ্যাংশগুলোতে অধিষ্ঠিত হয় কাউন্ট-ডিউক-ব্যারন ইত্যাদি শব্দে অভিহিত স্থানীয় শাসকবর্গ। অতঃপর কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যাংশ নিয়ে এক সময় গড়ে ওঠে কয়েকটি বড় বড় এলাকা, ক্রমে যেগুলো পরিণত হয় বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি স্ব-শাসিত রাজ্যে। এসব রাজ্য নিয়েই চিহ্নিত হয় পশ্চিম রোমান এলাকা বা সত্যিকারের প্রতীচ্য; এবং পূর্বাংশের এলাকা পরে পরিচিত হয় বাইজানটাইন সাম্রাজ্য নামে, কনস্টান্টিনোপল হয় যার রাজধানী বলকান ও এশিয়া মাইনরের জনপদসমূহ নিয়ে গড়ে ওঠে এই সাম্রাজ্য ৩৩৫ খৃস্টাব্দে রাজা কনস্টাটাইন দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পূর্ব রোমান বা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যও অন্তর্বিরোধ ও আত্মকলহে হয়ে পড়ে অন্তঃসারশূন্য। এখানে উল্লেখ্য যে, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অধিকর্তাদের দৃষ্টিতে ঐতিহ্যগতভাবেই রোমান সাম্রাজ্যের এই পূর্বাংশ প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত বলেই বিবেচিত হত। এবং এ বিবেচনায় সংযুক্ত ছিল বেশ একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি। গ্রীক বীর যে আলেকজাণ্ডার এক হেলেনিক দুনিয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে সিরিয়া-মিশর-ইরান জয় করে ছুটে এসেছিলেন সমরকন্দ-কাবুল হয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত, উৎসাহের আতিশয্যে যিনি এশিয়াকে হেলেনিক করে তোলার উদ্দেশ্যে ইরান-কন্যাদের সঙ্গে গ্রীক সৈন্যদের ঢালাও বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত প্রতীচ্যের দৃষ্টিতে সেই আলেকজাণ্ডারও চিহ্নিত হয়ে গেলেন এক 'প্রাচ্য বীর' রূপে! ল্যাটিনভাষী প্রতীচ্যের কাছে গ্রীকভাষী আলেকজাণ্ডার পুরাপুরি আপনজন হিসাবে গৃহীত হলেন না।

আপনজন গৃহীত হলেন না পরবর্তী কালের রাজা কনস্ট্যান্টটাইনের মত বিখ্যাত রাজন্যবর্গও।

এদিকে ভোগ-বিলাসে ও আত্ম-কলহে লিপ্ত পশ্চিমাংশের রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক গীবন এই মত ব্যক্ত করে গেছেন যে, রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যার জন্য বহিঃশত্রুর কোন আক্রমণ ছাড়াই তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। এমনি অবস্থায় সে ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে উপরিউক্ত 'বর্বর' জাতিগুলোর আক্রমণে। সেটা পঞ্চম শতকে। এ আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়, রাস্তাঘাট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ডাকাতি আর লুটতরাজ বেড়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও চলাচল ব্যবস্থা। শহরের লোকসংখ্যা হ্রাস পায় এবং অনেকেই চলে যায় গ্রামাঞ্চলে। উদিত হয় কয়েক শতাব্দীব্যাপী এক তামস যুগ।

এই অবস্থা থেকে সেখানে জন্ম নেয় সামন্ততন্ত্র। "সামন্ত যুগের শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল 'ফিউড' অর্থ্যাৎ শর্তাধীনে জায়গীর প্রদানকে কেন্দ্র করে। ফিউড থেকেই 'ফিউডাল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ফিউডের পরিবর্তে জায়গীরদার তার প্রভুর 'ভাসাল' বা অনুগত সামন্তে পরিণত হয়। .... প্রভুর স্বার্থ সংরক্ষণ, প্রভুর শত্রুপক্ষীয়দের গোপন ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা উদঘাটন ইত্যাদি তো ছিলই; তা ছাড়া প্রয়োজনের সময়ে প্রভুকে সসৈন্য সাহায্য করা, প্রভুর দুঃসময়ে তাকে আর্থিক এবং অন্যান্য সাহায্য প্রদান করা এগুলোও সামন্তদের দায়িত্বের মধ্যে ছিল। সামন্তেরা সকলেই যে রাজা বা উচ্চতম প্রভুর কাছ থেকে জায়গীর লাভ করত এমন নয়; হয়ত রাজার কাছ থেকে পেত ডিউক, তার থেকে কাউন্ট, তার থেকে ভাইকাউন্ট, ব্যারন বা নাইট। এভাবে সেকালের ইউরোপ নাইট থেকে ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে রাজা পর্যন্ত বহু বিস্তৃত সামন্ত সম্পর্কের জালে ছেয়ে গিয়েছিল"। (ইতিহাসের রূপরেখা, আবদুল হালিম, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৯০-৯১)। এই সামন্ত ব্যবস্থায়ই গঠিত রাজ্য বৃটেন, জার্মানী, স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল প্রভৃতি।

এই প্রতীচ্যে তখন ধর্মীয় পরিস্থিতি কেমন ছিল? কনফিউয্ড, বিভ্রান্তিময়। ধর্মীয় ভাবধারার দিক থেকে গ্রীকদের মত রোমানরাও ছিল প্রকৃত-পূজক। আরাধ্যদের মধ্যে সবার উপরে ছিলেন জুপিটার, তারপর মার্স, ভেস্তা, ভেনাস, মিনার্ভা এবং আরো অনেকে। এই দেব-দেবীরা ছিলেন, এক-একটি শক্তির প্রতীক, বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট কল্পিত শক্তির অধিকারী। তদুপরি, কোন কোন পরাক্রান্ত সম্রাটও মৃত্যুর পর পূজিত হতেন দেবতারূপে; অবশ্যি সিনেটের অনুমোদনক্রমে। শ্রদ্ধার প্রতীক হিসাবে জনসাধারণ নব-নব আরাধ্য আবিষ্কার করলেও রোমান কর্তৃপক্ষ তাতে কোন বাধার সৃষ্টি করতেন না। তাই বলে, সেই আবিষ্কার অনুমোদনযোগ্য ছিল না। কারণ, ৬৪ খৃস্টাব্দে ইহুদীদের বিদ্রোহ থেকে রোমান কর্তৃপক্ষ লাভ করেছিলেন এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। ফলে, সে ধর্মমতকে পঙ্গু করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জেরুযালেমে অবস্থিত ইহুদী মন্দিরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। ইহুদী ধর্মের প্রতি রোমানদের মনোভাব যখন এতটা বিরূপ, তখন খৃস্টধর্মের প্রতি তাদের মনোভাব কেমন ছিল? একই রকম বিরূপ ছিল তারা খৃস্টানুসারীদের প্রতিও। কারণ, রোমানদের কাছে খৃস্টধর্ম ছিল ইহুদীধর্মেরই একটি শাখা মাত্র। রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদীদের মত খৃস্টানদের অবস্থাও ছিল সঙ্কটজনক। জান-মালেরও নিরাপত্তা ছিল না তাদের। তবুও সব কিছু সহ্য করে সুকৌশলে প্রচারকার্য চালাতে লাগল তারা। দল তাদের বাড়তে লাগল। এই ধর্মমত সাড়া জাগাতে আরম্ভ করল শিক্ষিতদের মনে। খৃস্টানদের সবিনয় বক্তব্য ছিল-তারা দেশের প্রচলিত আইন মান্যকারী অনুগত নাগরিক, নবজীবনের

সন্ধান পেয়েই তারা খৃস্টানুসারী হয়েছে, খুঁজে পেয়েছে জীবনের প্রকৃত শান্তি। কিন্তু দিনের পর দিন দল যখন ভারী হয়ে ওঠে এবং পূর্বোক্ত 'বর্বরদের' আক্রমণ নেমে আসে, তখন তাদের ভোল যায় বদলে। রোমান রাষ্ট্রশক্তির বিপর্যয়জনিত দুরস্থার সুযোগে তারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চার্চ নির্মাণের অনুমতি আদায় করে নেয়।

রোমান সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থায় সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবকালে খৃস্টান সমাজের জন্যও সূচিত হয় এক শুভ সময়। সামন্তরা যখন তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, সাংস্কৃতিক ও মানসিক দিক থেকে জনসাধারণ যখন তাদের ট্রাডিশনাল ধর্মীয়বোধ সংরক্ষণের কোন সহায়তাই আর পাচ্ছিল না রোমান প্রভুদের কাছ থেকে, তখন এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণে এগিয়ে আসে খৃস্টান পাদ্রীরা। তাতে করে শুধুমাত্র তাদের দলই ভারী হয় না, চার্চ নির্মাণের অনুমতি বলে গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন চার্চ। তাছাড়া, সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওই সময়টাতে চার্চের লোকদেরও ভূস্বামী হওয়ার পথে কোন অন্তরায় ছিল না। আগে থেকেই চার্চের ধনার্জনের পথ ছিল একাধিক। মানুষের পারত্রিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত থাকায় অর্থার্জনের ব্যাপারে যাজকমণ্ডলীর সুযোগ ছিল অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী। তদুপরি, সেই 'অন্যদের' পাপ স্খালনের জন্য চার্চ অর্থের বিনিময়ে তাদের কাছে 'ইনডালজেন্স ও (ইনডালজেন্স মানে স্বর্গপ্রাপ্তির সার্টিফিকেট) বিক্রি করত। এক কথায়, চার্চ হয়ে ওঠে প্রচুর সম্পদের মালিক। এবং ভূস্বামী হওয়ার পথে বাধা না থাকায় চার্চও হয়ে ওঠে সামন্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে চার্চই হয়ে যায় তখনকার ইউরোপের সবচেয়ে বড় সামন্ত মালিক। জার্মানীতে চার্চ ছিল অর্ধেকের ও বেশি জমির মালিক। সমগ্র ক্যাথলিক জগতের এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিক হয়ে ওঠে চার্চ। বিভিন্ন স্তরের চার্চ হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন স্তরের সামন্ত। উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, বিভিন্ন স্তরের চার্চের প্রশাসনিক সম্পর্কের মাধ্যমে আপনা আপনিই গড়ে ওঠে এক যাজক শ্রেণী, সামন্ততন্ত্রের পাশাপাশি তারই অনুরূপ এক যাজকতন্ত্র। এ সকল পন্থায় বৈষয়িক উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে চার্চের রাজনৈতিক প্রভাব। চার্চ রাজার কাছ থেকে লাভ করে শুল্ক আদায় ও বিচার-আচারের ক্ষমতা। রোমের ধর্মযাজক, যাঁকে বলা হত পোপ, তিনি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে শক্তিশালী। ফ্র্যাঙ্কদের সাহায্য করার পুরস্কারস্বরূপ পোপ লাভ করেন সমগ্র মধ্য-ইটালির জমিদারী। অতঃপর রোমে রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে মহামান্য পোপ তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়ে তাঁকে 'হোলি রোমান এম্পারার' বলে ঘোষণা করেন। এভাবে চার্চ ও রাষ্ট্র শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্ষমতা ও অধিকারের সীমা নিয়ে এ দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্বও দেখা দেয় অচিরেই। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সংগ্রামের পর চার্চই জয়লাভ করে এবং সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হয় চার্চের নিরঙ্কুশ প্রভাব।

সে যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বলতে যা কিছু ছিল, তার উৎসস্থল ছিল চার্চ। ধর্মমত প্রচারের জন্য যাজকদেরও কিছু লেখাপড়া শিখতে হত। মুদ্রিত বইপত্রের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে তখন শিক্ষাদান করা হত প্রধানত বিতর্ক ও বক্তৃতার মাধ্যমে, আর ধর্মীয় ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। তাই বলতে হয়, সাম্রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রায়-অশিক্ষিত ও অনুন্নত এমনি এক মধ্যযুগীয় প্রতীচ্য সমাজের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রতিটি রাজ্যের সামন্ত-নির্ভর শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা, যাঁর সেনাবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি পেত সামন্তদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছোট ছোট সেনাদলের সমন্বয়ে। এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি যাজকতন্ত্র ছিল একক শক্তিশালী ধারক। সব ক'টি রাজ্যের আর্চবিশপ বিশপদের নিয়ে

সমগ্র প্রতীচ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী একক অধিকর্তা ছিলেন রোমের মহামান্য পোপ। ক্রুসেড-পূর্বকালীন ইউরোপে এই-ই ছিল রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-আধ্যাত্মিক অবস্থার বিদ্যমান রূপরেখা।

এবার স্বাভাবিক প্রশ্ন ঃ কেমন ছিল ক্রুসেড-পূর্বকালীন মুসলিম প্রাচ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি? আর এ পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্টতর অবহিতির জন্যই ইসলাম-পূর্ব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন।

মানব সভ্যতার ইতিহাস ক্রম-সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বা একই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে নানা জাতির মেধা ও প্রতিভার অবদানে গড়ে ওঠে নিজেদের কৃষ্টি। আর সেসব বিশেষ কৃষ্টির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে কোন একটি সভ্যতা। এভাবেই একদা সুমেরীয়, আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় ও কালদীয় কৃষ্টির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল সেমেটিক সভ্যতা, ইতিহাসে যা মেসোপোটেমীয় সভ্যতা নামে অভিহিত; গড়ে উঠেছিল মিশরীয় সভ্যতা, গ্রেকোরোমান-বাইজানটাইনীয় তথা হেলেনীয় সভ্যতা এবং ভারতীয় ও চীন সভ্যতাসহ পৃথিবীর আরও আরও সভ্যতা; গড়ে উঠেছিল ইসলামী সভ্যতা। সমন্বয় শুধু কৃষ্টির নয়, সমন্বয় ঘটে সভ্যতারও। হেলেনীয় সভ্যতার সঙ্গে ইসলামী সভ্যতার সমন্বয়ে সূচিত ইউরোপীয় জীবনের নব জাগরণে গড়ে উঠেছিল আধুনিক সভ্যতার ভিত। কালপ্রবাহে মানুষের সভ্যতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া যেন বিভিন্ন ছোট বড় স্রোতধারার সংমিশ্রণে বৃহৎ নদী সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মত। নদীর সাগর-সঙ্গমে মিলিত হওয়ার প্রয়াসের মতই যুগ-যুগান্তরের বিভিন্ন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যুগ-যুগান্তরের বিভিন্ন সভ্যতার সংমিশ্রণ-সমন্বয় যেন মহামানবতার পূর্ণতায় মিলিত হওয়ার লক্ষ্যেই মানুষের চিরন্তন প্রয়াস।

কালে কালে বহু বাধার সম্মুখীন হয়েছে এ প্রয়াস, সম্মুখীন হয়েছে অনেক বিপথগামীতার। যুগে যুগে মানুষের ইতিহাস রক্তাক্ত হয়েছে এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতির সংঘর্ষে, এক দেশের বিরুদ্ধে অন্য দেশের প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টায়। সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রযাত্রা স্তব্ধপ্রায় হয়েছে উচ্চাভিলাষী রক্তপিপাসু দিগ্বিজয়ীর গণহত্যায়। তবুও নীরবে নিভৃতে মানুষের আশা ভোরের প্রত্যাশায় কাটিয়েছে অন্ধকার রাত। আবার এগিয়েছে মহাকালের রথ। সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষের ইতিহাস পারস্পরিক হানাহানির ইতিহাস, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাস, একের উপর অন্যের রক্তক্ষয়ী প্রাধান্য বিস্তারের ইতিহাস। তবুও, রক্তারক্তি হানাহানির মাঝেও লোকচক্ষুর অন্তরালে রচিত হয়ে চলেছে মানব সভ্যতার পরবর্তী স্তর। এই-ই হচ্ছে ইতিহাসের সত্য।

প্রাগৈতিহাসিক কালের পুরনো প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ পেরিয়ে লৌহ যুগের পথ-পরিক্রমা শেষ করে ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতায় প্রবেশ করল মানুষ। নিজেদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে ক্রমে আবিষ্কৃত হল লিখন পদ্ধতি; বিকশিত হল সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারণা, দ্রব্য বিনিময় প্রথা এবং ধর্মীয় বোধ; সূচিত হল কৃষিকাজ, সেচ ব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় বিধান ও ধর্মীয় অনুশাসন; আর তারই সঙ্গে উন্মোচিত হতে আরম্ভ করল শিল্প-স্থাপত্য-শিক্ষা-বিজ্ঞানের চেতনা। সবকিছু মিলে তখন মানব সভ্যতার বিকাশ-লগ্ন। তার স্বাক্ষর মিলেছে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায়, নীল ও সিন্ধু বিধৌত বিস্তৃত এলাকায়। সেসব স্বাক্ষর

বলে দিচ্ছে মেসোপোটেমীয় ও মিশরীয় সভ্যতার কথা, সিন্ধু সভ্যতার কথা।

টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিক নদী-বিধৌত এলাকা ছিল খুবই উর্বর। পরবর্তীতে এ এলাকা মেসোপোটেমিয়া বলে অভিহিত হয়। বহু আগে সেখানে গড়ে উঠেছিল সামেরী বা সুমেরী নামে অ-সেমিটিক জাতির এক রাজ্য। খৃস্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আরবের সেমিটিক জাতির একটি শাখা এই এলাকায় এসে সামেরীদের পরাস্ত করে স্থাপন করে নিজেদের রাজ্য। কিন্তু চার শ'বছর পর সে এলাকায় আবার প্রতিষ্ঠিত হয় সামেরী রাজ্য। আরম্ভ হয় নব্য-সামেরীয় যুগ, যে যুগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা দুঙ্গী। তিনিই সে রাজ্যে সর্বপ্রথম প্রচলিত করেন একটি নিষিদ্ধ আইন বা কোড। রাজা দুঙ্গীর মৃত্যুর পর সে রাজ্যের আধিপত্য চলে যায় সেই সেমিটিক জাতির হাতেই। সেমিটিকদের অন্যান্য অংশ এসে উপস্থিত হয় ওই অঞ্চলের আশেপাশে। অভিহিত হয় তারা আমোরাইট ও ইলামাইট নামে। আমোরাইটরা বসতি স্থাপন করে ব্যাবিলন নামক স্থানে, আর ইলামাইটরা মেসোপোটেমিয়ার উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায়। ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে আমোরাইটরা গড়ে তোলে এক রাজ্য, তাদের বিখ্যাত রাজার নাম হাম্মুরাবি। এই অঞ্চলে সামেরীয়রা লিখন পদ্ধতি থেকে আরম্ভ করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদির সূচনা করে বলে তারা চিহ্নিত হয় সভ্যতার অন্যতম অগ্রদূতরূপে। ইলামাইটরা তাদের অঞ্চলে গড়ে তোলে আক্কাদীয় রাজ্য। কালক্রমে ওই অঞ্চলের সকল জাতির কৃষ্টি-সমন্বয়েই গড়ে ওঠে মেসোপোটেমীয় সভ্যতা। দুঙ্গীর বিধিবদ্ধ আইন বা কোড এবং পরবর্তীকালে হাম্মুরাবির বিধিবদ্ধ আইন বা কোড এই সভ্যতার কথাই প্রকাশ করে। সমসাময়িককালে মিশরেও গড়ে ওঠে অনুরূপ সভ্যতা। তবে দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, আইনভিত্তিক মেসোপোটিমীয় সভ্যতার পাশাপাশি মিশরীয় সভ্যতা ছিল নীতি ও ধর্মীয় বোধভিত্তিক।

সামেরীদের মত মেসোপোটেমীয় জাতিগুলোও ছিল প্রকৃতি-পূজক। সামেরীদের মত সূর্যকে মারদুক নামে পূজা করত ব্যাবিলনবাসীরা। প্রধান দেবতা মারদুক ছাড়া তাদের আরও পূজ্য ছিল প্রেমের দেবী ইশতার, বায়ুর দেবতা বারুত্তস এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি প্রকাশক দেব-দেবী।

খৃস্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আরবের সেমিটিক জাতির অপর একটি শাখা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে এসে এক রাজ্য গড়ে তোলে এবং সূচনা করে হিব্রু সভ্যতার। হিব্রু ও ইহুদী শব্দ দু'টি সমার্থবোধক হলেও হিব্রু শব্দটি প্রাচীনতর। এখানে স্মরণযোগ্য যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ) প্রমুখ নবী রসূলগণের অবদানে হিব্রু সভ্যতা সমুজ্জ্বল। হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর পর হিব্রু জাতির অধঃপতন সূচিত হয় এবং তাদের সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, উত্তরাংশে ইসরাইলী রাজ্য এবং দক্ষিণাংশ জুডাহ্ রাজ্য। খৃস্টপূর্ব ৭২২ অব্দের দিকে আসিরীয়দের দ্বারা ইসরাইলী রাজ্য অধিকৃত হয়। অতঃপর হিব্রুগণ বিচ্ছিন্নভাবে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে বলে তাদের অভিহিত করা হয় 'বিলুপ্ত দশটি গোত্র' বলে। অন্যদিকে ৫৮৬ খৃস্টপূর্বাব্দে কালদীয়রা জুডাহ্ রাজ্য অধিকার করে নেয়।

অন্যান্য সেমিটিকদের মত এই হিব্রুরাও ছিল প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক। হযরত মুসা (আঃ) তাদের ফিরিয়ে আনেন একক উপাস্য 'জেহোভা'র পথে। কিন্তু পরে আবার তাদের মধ্যে দেখা দেয় স্পষ্ট বিভ্রান্তি। সভ্যতার ক্রমবিকাশে হিব্রুদের অবদান

যথেষ্ট। দুঙ্গী হাম্মুরাবির আইনের মত তারাও প্রণয়ন করে 'ডিউটোরোনোমিক কোড' যাতে বিধিবদ্ধ ছিল দাসমুক্তির কথা, ভোজবাজির নিন্দা, সুদগ্রহণে শাস্তির ব্যবস্থার মত বিভিন্ন অনুশাসন। কিন্তু পথভ্রান্ত ইহুদীরা এসব অনুশাসনের কোনটিই পালন করত না।

ওই সময়টায় দেখা যায়ঃ অ-সেমিটিক, সেমিটিক ও আর্য নামে অভিহিত জনগোষ্ঠী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বসবাস করছে, রাজ্য গড়ে তুলছে, নিজেদের মেধানুযায়ী কৃষ্টি-সভ্যতা নির্মাণে অবদান রাখছে। ভারতবর্ষেও এসেছিল এমনি এক বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। আর্য বলেই তাদের পরিচয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, আর্যদের আদি বাসস্থান পোল্যান্ড থেকে আরম্ভ করে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশু চারণকারী যোদ্ধা যাযাবর এই জনগোষ্ঠী কালক্রমে জীবন ধারণের প্রয়োজনেই নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে চলে আসে পারশ্যে অর্থাৎ বর্তমানে ইরানে। ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডির মতে, এই ইরান থেকে তাদের একাংশ এসেছিল ভারতবর্ষে। আর্যদের আগমনকালে ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে প্রজ্জ্বলিত ছিল সিন্ধু সভ্যতার দীপশিখা। সেই দীপশিখাই নিভে গিয়েছিল আর্যদের সদর্প হুঙ্কারে। সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকারীদের বিপর্যস্ত করে এবং দাসে পরিণত করে একদা যাযাবর যে আর্যরা বসবাস করতে আরম্ভ করল সম্পদে ভরপুর এই ভারতবর্ষে, কালক্রমে তারা এখানে শুধু এক বিশাল সাম্রাজ্যই গড়ে তুলল না, গড়ে তুলল বেদ-উপনিষদভিত্তিক এক সুসমৃদ্ধ কৃষ্টি। আর সিন্ধু সভ্যতার অনেক অবদান নিয়ে এবং তার সঙ্গে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আর্যরা গড়ে তুলল যে সভ্যতা তাকে বলা হয় আর্য সভ্যতা।

সিন্ধু সভ্যতার অনুরূপ এক সভ্যতা তখন বিদ্যমান ছিল ভারতবর্ষের এই পূর্বাঞ্চলীয় জনপদেও। "প্রাচীন যুগে অন্তত তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করিত ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ..... মোটের উপর আর্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ..... আর্যগণের উপনিবেশের ফলে আর্যগণের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাচীন অনার্য ভাষা লুপ্ত হইল, বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ জৈন ধর্ম প্রচারিত হইল, বর্ণাশ্রমের নিয়ম অনুসারে সমাজ গঠিত হইল এক কথায় সভ্যতার দিক দিয়াও বাংলাদেশ আর্যাবর্তের অংশরূপে পরিণত হইল"। (বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খন্ড (প্রাচীন যুগ), ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃঃ ১৩-১৫)।

ধর্মীয় দিক থেকে আর্যরাও ছিল তদানীন্তন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অন্যান্য জাতির মতই বিভিন্ন কল্পিত শক্তির উপাসক; সেই সূর্য-চন্দ্র-অগ্নি প্রভৃতির শক্তিতে বিশ্বাসী। সেসব শক্তির পরিতুষ্টির জন্য আর্যরা সেসবের স্তব ও যজ্ঞ করত। এভাবেই তাদের অনুসৃত ধর্মে হল ইন্দ্র-বরুণ-উষা-অগ্নি প্রভৃতি দেব-দেবীর সৃষ্টি। বাংলাদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় 'ভেড্ডিড' বলে চিহ্নিত। তারাও ছিল প্রকৃতি-পূজক। আর্য-উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ফলে এ জনপদে আর্য-অনার্য আরাধ্যদের মধ্যেও সংঘটিত হয় এক সংমিশ্রণ-সমন্বয়ের প্রক্রিয়া। এখানে এসব ঘটছে যখন, প্রতীচ্যে তখন

এথেনীয় যুগের অবসানে আরম্ভ হয়েছে হেলেনীয় যুগ। উদ্ভবকালের বিচারে হেলেনীয় সভ্যতা নবীনতর হলেও প্রথমে গ্রীক ও পরে রোমানদের অবদানে সমুজ্জ্বল। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস আয়োনীয় যুগ, এথেনীয় যুগ ও হেলেনীয় যুগ, এই তিনটি স্তরে বিভক্ত। আয়োনীয় যুগে মাইলেটাস ছিল গ্রীক রাজ্যে বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ও সমৃদ্ধতম অঞ্চল এবং গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র। গ্রীক মনীষার অপূর্ব বিকাশ ঘটে এই আয়োনীয় যুগেই। প্রাচ্যের সকল সভ্যতার ক্রম-সঞ্চিত অবদান নিয়েই গড়ে ওঠে গ্রীক সভ্যতা। এথেনীয় যুগে গ্রীক জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় এথেন্সে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার স্থলে এ যুগে দেখা দেয় ভাববাদী প্রতিক্রিয়া। সক্রেটিস-প্লেটো-এরিস্টটলের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিল এই যুগ।

অতঃপর হেলেনীয় যুগে প্রতীচ্য ও প্রাচ্যাংশ নিয়ে একের পর এক গড়ে ওঠে বিশালকার গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য। জ্ঞানে-বৈভবে-গরিমায় উন্নতশির এ দু'টি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির বিবরণ আগেই দেয়া হয়েছে। ইসলাম-পূর্ব প্রাচ্যে-প্রতীচ্যের পটভূমিতে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন, তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও প্রাধান্য বিস্তারে সকল প্রয়াসের মধ্যে যে অন্যতম বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান ছিল, তা হল প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অর্থাৎ এশিয়া-ইউরোপের মনোবৃত্তিতে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতা সম্পর্কিত। আলোচ্যকালে পারস্পরিক সংঘাত থেকে দেখা যায় যে, এশিয়া প্রাচীনতম সভ্যতার অধিকারী হয়েও প্রথমে ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তার করতে এগিয়ে যায় নি; বরং সভ্যতায় নবীনতর হয়েও ইউরোপই প্রথম এগিয়ে এসেছে এশিয়ার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে। আরবের উপরও রোমানরা তাদের শাসন চাপানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে কোন কোন রাজ্য দখলও করেছিল। খৃস্টপূর্ব ১১৫ অব্দ থেকে ৩০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম আরবে রাজত্ব করছিল হিমাইয়ারী রাজবংশ। এ রাজ্যেও হানা দিয়েছিল রোমানগণ। কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল তাদের সে প্রচেষ্টা। উত্তর-আরবের নাবাতিয়ান রাজ্যের রাজধানী পেত্রাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল যে সমৃদ্ধ জনপদ, ১০৫ খৃস্টাব্দে সেখানেও পরিচালিত হয় রোমান অভিযান। পার্থিয়ান ও রোমান সাম্রাজ্যের মাঝখানে অবস্থিত পালমিরা রাজ্যেও অভিযান চালিয়ে রোমানরা তা দখল করে নেয় খৃস্টীয় প্রথম শতকে।

৬১৪ খৃস্টাব্দে পারশ্যের নেস্টোপিয়ানরা জেরুযালেম অধিকার করে খৃস্টানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নষ্ট করে ও খৃস্টের মর্যাদাবোধক নানা দ্রব্য নিয়ে চলে যায় তাদের রাজধানী সেতিফনে। নেস্টোরিয়ানরাও ছিল খৃস্টান। তবে গ্রীক চার্চের ঘোষিত বিধান মতে ধর্মবিরোধী বলে প্রচলিত খৃস্টধর্ম থেকে তারা ছিল বহিষ্কৃত। শুধু মানবতাবাদী খৃস্টান বলেই নয়, নেস্টোরিয়ানদের মুখের ভাষাও গ্রীক ছিল না। তদুপরি, খৃস্টান হলেও তারা ছিল প্রাচ্যবাসী। প্রতীচ্যের বিবেচনায় তাই তারা ছিল অনভিজাত।

প্রতীচ্য চার্চের প্রাচ্যবাসীদের গীর্জা এবং জেকোবাইটরাও নেস্টোরিয়ানদের মতই খৃস্টান হিসাবে ছিল অপাঙক্তেয়! পারশ্যের নেস্টোরিয়ানরা তাই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। প্রতীচ্য ধারণার অধিকারী খৃস্টানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে জেরুযালেম দখল করে গীর্জার অপমান করা ছিল সেই প্রতিশোধপরায়ণতার প্রকাশ। অবিশ্যি কিছুকাল পর সম্রাট হেরাক্লিয়াস তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। কিন্তু পারশ্য শক্তিকে বিপর্যস্ত করতে হেরাক্লিয়াসকে একাধিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে এসব যুদ্ধের ফলে দু'টি শক্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে।

এদিকে ভারতবর্ষে আর্যরা তাদের প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্যে ধর্মভিত্তিক মতবাদের হানাহানিতে লিপ্ত। সেই হানাহানি ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধবাদের মধ্যে। তারপর খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ফলে এই হানাহানিতে যুক্ত হল নতুন মাত্রা। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে কিছুকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হল গ্রীক শাসন। এই অঞ্চলটা এর আগেও কিছুকালের জন্য পারশ্যের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে বিদেশাগত হুনগন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে পাঞ্জাব-রাজপুতনা-মালব এলাকায় রাজ্য স্থাপন করে। এই দুর্ধর্ষ বিদেশাগতরা ছিল আর্যদেরই মত মধ্যএশিয়ার এক যাযাবর জনগোষ্ঠী। এদের রাজত্বের অবসান হয় আনুমাণিক ৫৩২ খৃস্টাব্দের দিকে।

হুনশক্তির অবসানে ভারতবর্ষে চারটি শক্তির উদ্ভব ঘটেঃ এক, গৌড় রাজ্যে রাজা শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত বাহ্মণ্যবাদী শক্তি; দুই, থানেশ্বরে বর্ধন বংশীয় বৌদ্ধশক্তি; তিন, কনৌজে মৌখরী বংশীয় বৌদ্ধ শক্তি; এবং চার, মালবে কনিষ্ঠ গুপ্তবংশীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ কাটে গৌড়-রাজ শশাঙ্ক আর থানেশ্বর-রাজ হর্ষবর্ধনের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে। অতঃপর এই পূর্বাঞ্চলে আরম্ভ হয় শতবর্ষের জন্য এক অরাজক অবস্থা। এই অরাজক অবস্থার অবসান ঘটে ৫৭০ খৃস্টাব্দে বৌদ্ধ বংশীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সমগ্র ভারতবর্ষেই তখন আর কোন একক প্রবল রাজশক্তির অস্তিত্ব ছিল না। ছিল বিভিন্ন বংশের বিভিন্ন রাজ্য।

ধর্মীয় ও সামাজিকভাবেও এই উপমহাদেশের অবস্থা তখন মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধবাদের হানাহানিতে বিপর্যস্ত হয়ে গেল বৌদ্ধ শক্তি এবং বেশ কিছু সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত যে 'হিন্দু ধর্ম' তা-ও নেমে গেল আচার-সর্বস্ব সাধারণ স্তরে। সাধারণ মানুষের জন্য হিন্দু বা বিপর্যস্ত বৌদ্ধধর্ম কোনটাই তখন আর মুক্তি-দিশারী হয়ে রইল না। ভারতবর্ষের এই যুগ তখন মানবতা'র চরম লাঞ্ছনার যুগ। গৌরবোজ্জল বৈদিক যুগের কথা ভুলেই গেল ওই যুগের মানুষ।

ইসলাম-পূর্ব সময়টায় বিদ্যমান তখন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দু'টিমাত্র প্রবল শক্তি, পারশ্য শক্তি ও বাইজানটাইন শক্তি। ইরাক থেকে ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত পারশ্য সাম্রাজ্য, আর এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকার অংশবিশেষে বিস্তৃত বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। আর ষষ্ঠ শতকের দিকে পারশ্যের সাসানীয় শান-শওকত ও কায়ানী জৌলুষ প্রতাপ তার প্রাণশক্তি হারিয়েছে। রাজপুরুষদের অত্যাচার-অবিচার-অকর্মণ্যতা ও ভোগ-বিলাসের প্রাধান্য সেখানে। ততদিনে খৃস্টধর্মেও এসে গেছে মহাভ্রান্তি। পল নামক এক ইহুদী খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। বিন্যস্ত করেছে খৃস্টান ধর্মগ্রন্থ, এবং ত্রিত্ববাদের জন্ম দিয়ে খৃস্টীয় একত্ববাদকে করেছে সমাধিস্থ।

হযরত মুসা (আঃ) পরিচালিত একত্ববাদীরাও ততদিনে পুরাপুরি পথভ্রান্ত। দুনিয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে ধন-দৌলতকে বানিয়েছে তারা একমাত্র উপাস্য ও কাম্য। ইসলাম-পূর্ব প্রাচ্য-প্রতীচ্যের তখন এই-ই ছিল সাধারণ অবস্থা। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ঘোরতর শত্রু, এক জাতি অন্য জাতির চরম বৈরী, এক গোত্র অন্য গোত্রের রক্তপিপাসু। লোভ-লালসা-জিঘাংসা-হত্যা-লুণ্ঠনের তখন অবাধ রাজত্ব।

এতদিনকার চলমান মানব-সভ্যতা যেন স্তব্ধবাক। ইংরেজ ঐতিহাসিক ম্যাককেবের মতে, মানুষের জ্ঞান-চর্চার যে ক্রমসঞ্চিত অবদান পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত

গ্রেকো-রোমান নগরীগুলোর লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল লক্ষ লক্ষ গ্রন্থরাজিতে, তা ধ্বংস করে দিয়েছিল খৃস্টান ধর্মান্ধরা। পুড়িয়ে দিয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার বৃহত্তম গ্রন্থাগার। আরব দেশে চলছে তখন 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বা 'অন্ধকার যুগ'।

এমনি এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবেই জন্ম নিলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য সত্যপথ-প্রদর্শক, সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তির দিশারী রহমাতুল্লিল আলামীন, ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ের অবসানে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রারম্ভকাল। এই প্রারম্ভকাল সারা বিশ্বের মানুষের সামনে প্রথম এক আদর্শ কল্যাণ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গৌরবে সমুজ্জ্বল। সেই আদর্শ কল্যান-রাষ্ট্রের মহান রূপকার ছিলেন ইসলামের মহানবী (সাঃ)। মদিনার সকল ধর্মমতাদর্শীদের পূর্ণ সম্মতিক্রমে প্রণীত 'মদিনা সনদ' এর নীতিমালার উপর স্থাপিত হয়েছিল যে ক্ষুদ্র কল্যান রাষ্ট্রটির ভিত্তি, তার লক্ষ্যে ছিল ঃ এক. বহুধাবিভক্ত মদিনাবাসীদের গৃহযুদ্ধ, গোত্রযুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, দুই. জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের সমান অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করা; তিন. মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে মৈত্রী, সদ্ভাব ও পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা; এবং চার. মদিনায় ইসলাম-ভিত্তিক মানবকল্যাণধর্মী এক সার্বজনীন প্রজাতন্ত্রের মূল প্রতিষ্ঠিত করা।

মোটামুটিভাবে মদিনা-সনদের সারমর্ম ছিল ঃ "মদিনার ইহুদী নাসারা পৌত্তলিক এবং মুসলিম সকলেই এই দেশবাসী। সকলেরই নাগরিক অধিকার সমান। ইহুদী নাসারা পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ ধর্ম পালন করিবে। কেহই কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কেহই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিনানুমতিতে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবে না। নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে আল্লাহ ও রসূলের মীমাংসার উপর সকলকে নির্ভর করিতে হইবে। বাহিরের কোন শত্রুর সহিত কোন সম্প্রদায় গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে না। মদিনা নগরীকে পবিত্র মনে করিবে এবং যাহাতে ইহা কোনরূপ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। যদি কোন শত্রু কখনও মদিনা আক্রমণ করে তবে তিন সম্প্রদায় সমবেতভাবে তাহাকে বাধা দিবে। যুদ্ধকালে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করিবে। নিজেদের মধ্যে কেহ বিদ্রোহী হইলে অথবা শত্রুর সহিত কোন রূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করা হইবে- সে যদি আপন পুত্রও হয়, তবুও তাহাকে ক্ষমা করা হইবে না। এই সনদ যে বা যাহারা ভঙ্গ করিবে, তাহার বা তাহাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত"। (বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তফা, চতুর্দশ সংস্করণ ১৯৭৬, পৃঃ ১৭৮)। সপ্তম শতকের প্রথম পাদে রচিত এই সনদ নিঃসন্দেহে অভাবিতপূর্ব। ঐতিহাসিক ম্যুরের মতে, এই মদিনা সনদ মুহাম্মদ (সাঃ) এর অসামান্য মাহাত্ম্য ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগেই নয় বরং সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানবদের কাছেই তা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। তারপরই ইসলামের সর্বব্যাপী উত্থান ও মানব মুক্তির প্রত্যাশা।

অতঃপর প্রত্যাশার চড়াই-উৎরাই'র মধ্য দিয়ে এই কল্যাণ রাষ্ট্রটির দ্রুত বিস্তৃতি এবং নবীজি (সাঃ)-এর রেসালতকালে ও পরে খোলাফায়ে রাশেদার শাসনকালের

অবদান নিয়ে ইতিহাস চিরমুখর। ইতিমধ্যেই পারশ্য, বাইচানটাইন সাম্রাজ্যের সিরিয়া-জর্ডান-প্যালেষ্টাইন ও মিশরের বিশাল ভূখণ্ড, ত্রিপলি এবং সাইপ্রাস ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত। বলা যায়, গ্রেকোরোমানদের অধিকৃত অনেক রাজ্যের পুনরুদ্ধার।

তারপর? খোলাফায়ে রাশেদা যুগের অবসানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল বংশানুক্রমিক মুসলিম রাজতন্ত্র। ৬৬১ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত উমাইয়া বংশীয় শাসনকাল। বিলুপ্ত হল রাষ্ট্র পরিচালনায় খলিফাকে পরামর্শ দানকারী মজলিশ। খলিফাই হলেন রাষ্ট্রের সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। খলিফা মুয়াবিয়া ইসলামী শাসনের বদলে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত করলেন মুসলিম শাসনের ধারা। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পঞ্চম উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় উমর ইবনে আবদুল আজিজের প্রায় তিন বছরের শাসনামল, যখন স্বল্পকালের জন্য আবার ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল ইসলামী খেলাফতের দ্যুতি।

এরপর বহুদিন ধরে অমিতবিক্রম মুসলিম শাসনের শান ও শওকতময় অভিযান, তার গৌরব সূর্যের মধ্য গগণে অবস্থান এবং এক সময়ে অপরাহ্নের অপরিহার্যতায় আত্মসমর্পণ। তাই তো স্বাভাবিক। খলিফা হযরত মুয়াবিয়া ছিলেন সুদক্ষ এক সমরনেতা, সুযোগ্য এক শাসক এবং গযনী-কাবুল-উত্তর আফ্রিকা বিজয়ী অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক আরব নৃপতি। 'আরবদের সিযার' বলে অভিহিত এই প্রতিভাধর নৃপতিটির ধ্যান-দিগন্তে ভেসে উঠত যেন রোমান সাম্রাজ্যের জৌলুষময় দীপ্তি, ইসলামী খেলাফতের স্নিগ্ধ মাধুর্য নয়।

উমাইয়া বংশের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য খলিফা ছিলেন আব্দুল মালিক (৬৮৫-৭০৫ খৃঃ) ও প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খৃঃ)। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময় বিজিত হয় মধ্য এশিয়ার বলখ্-ফরগনা-তুখারিস্তান, ভারতের সিন্ধু ও মুলতান রাজ্য, সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা এবং ইউরোপের স্পেন। তারপর খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে অবসান হয় উমাইয়া শাসন।

খলিফা আবুল আব্বাসের মসনদ প্রাপ্তির মাধ্যমে আরম্ভ হয় ৭৫০ থেকে ১২৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫০৮ বছরের আব্বাসীয় শাসনামল। এই আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেস্ক থেকে স্থানান্তরিত হয় বাগদাদে। আব্বাসীয় শাসনের কাল ছিল প্রধানত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের কাল। কিন্তু এ কালের দ্বিতীয় খলিফা আল-মনসুর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণেও মনোযোগী হন। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে এই সম্প্রসারণের প্রয়োজনও ছিল। বিভিন্ন বিদ্রোহী ও আক্রমণকারীকে পরাস্ত করে আল-মনসুর তাবারিস্তান, আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান ও উত্তর আফ্রিকায় আব্বাসীয় আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। তিনি বাইজানটাইন সম্রাটের আক্রমণ প্রতিহত করে তাকে কর দানে বাধ্য করেন। পরবর্তীতে খলিফা হারুন-অল-রশীদের সময়ে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। তার আমলেই প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যে বাগদাদ নগরী পরিণত হয় দুনিয়ার এক রূপকথার নগরীতে। অতঃপর তদীয় পুত্র খলিফা আল মামুনের ২০ বছরের শাসনকাল আব্বাসীয় খেলাফতের স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত হয়। রাজ্য বিস্তারের দিক দিয়ে খলিফা আল-মামুন সিসিলি ও ক্রীট দ্বীপ দখল করে নেন। তার আমলেই চাপাপড়া গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্যকে আত্মস্থ করে এবং তাতে নিজেদের প্রতিভার অবদান মিশিয়ে মুসলিম মনীষীরা বিস্তৃত করতে থাকেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণ দিগন্তকে। "বিখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন ইসলামের উত্থান ও ব্যাপ্তিকে

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে যেসব বিপ্লব একটা নতুন ও চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম ও স্মরণীয় বলে বর্ণনা করে গেছেন। নতুন বিশ্বাসে ঐকান্তিক আগ্রহ সমন্বিত আরব মরুভূমির অপেক্ষাকৃত ছোট একটা বেদুইন দলের নিকট প্রাচীনকালের দু'দুটো বৃহৎ সাম্রাজ্য অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে কিভাবে ধর্মান্তর গ্রহণ ও পরাজয় বরণ করলো, তা ভাবলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সশস্ত্র অভিযানের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের শান্তিবাণী প্রচারের অতুলনীয় ধর্মদিশারী ভূমিকা অবলম্বনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তার অনুসারীরা একদিকে ভারতের প্রান্ত সীমানা থেকে অন্যদিকে অতলান্তিক সাগর তীর পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে জয়যুক্ত করে তুলেছিলেন। .... জগতে যত অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, ইসলামের প্রসার তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ"। (ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত The Historical Role of Islam এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ, মুহম্মদ আবদুল হাই, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯, পৃঃ ১০-১১)।

ইসলাম অনুসারীদের এ বিজয় অভিযান সম্পর্কে শ্রী রায় আরও বলেন, "এ যেন এক ভীষণ ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড। কিভাবে এতবড় আজগুবি ব্যাপার সম্ভব হলো, এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা আজও হতভম্ব হয়ে যান। আজকে জগতের সত্যিকার শিক্ষিত লোকেরা 'ইসলামের উত্থান শান্ত ও সহিষ্ণু লোকদের উপর গোড়ামির জয়' এই ঘৃণ্য অভিমত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। ইসলামের এই বিজয় অভিযানের কারণ ছিলো এক অননুভূতপূর্ব বৈপ্লবিক সুরের মধ্যে লুকিয়ে; গ্রীস, রোম, পারশ্য, চীন, এমন কি ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় ঘুণ ধরে যাওয়ায়, বিপুল জনসাধারণ যে চরমতম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হলো, তা থেকে বাঁচিয়ে ইসলাম এক আলোঝলমল দেশের নির্দেশ তাদের দিতে পেরেছিলো বলেই তার এই অসাধারণ বিস্তার সম্ভব হয়েছিল"। (প্রাগুক্ত, পৃ ১৩)।

কিন্তু তারপরেই আরম্ভ হয় আব্বাসীয় খেলাফতের দুর্বলতার যুগ। এর মধ্যে সেলজুক বংশের উত্থান (১০৫৫-১১৯৪ খৃঃ) বেশ গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা। ততদিনে বাগদাদ কেন্দ্রিক আব্বাসীয় খেলাফত যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই দুর্বলতা থেকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে চলে সেলজুকেরা। খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে সুলতান হিসাবে সেলজুকরা প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসকই হয়ে দাঁড়ায়। গযনীর সুলতান মাহমুদ সেলজুকদের এক বিখ্যাত সুলতান। তাঁর মৃত্যুর পর গযনীর ক্ষমতায় আসে তুর্কী গোত্রীয় সেলজুকগণ। তুগ্রীল বেগের আমলে সেলজুকগণ এশিয়ায় একটি পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হয়। তিনি আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারই করেন নি শুধু বাইজানটাইনদের বাকি রাজ্যাংশও দখল করে নেন। তুগ্রীলের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আল্‌প্‌ আরসালান (১০৬৩-৭২ খৃঃ) এবং তাঁর পুত্র মালিক শাহ্‌ (১০৭২-৯২ খৃঃ) বীরত্বের সঙ্গে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে বিপদমুক্ত রাখেন। মালিক শাহ্‌র শাসনামলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্বে কাশ্মীর থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং উত্তরে জর্জিয়া থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ওদিকে ফাতেমীয় বংশের উদ্যোগে মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয় এক শক্তিশালী শিয়া খেলাফত। তার স্থায়ীকাল ৯০৯ থেকে ১১৭১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। মিশর ছিল আব্বাসীয় খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ্‌ আল-মাহদী ৯০৯ খৃস্টাব্দে বাগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে শিয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফাতেমীয় বংশের চতুর্থ খলিফা আল-মুইজ মিশরে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। ৯৫৫ খৃস্টাব্দে তিনি দখল করে নেন মরক্কো। আল-মুইজের পুত্র আল-

আজিজ মসনদে আরোহণ করেন ৯৭৫ খৃস্টাব্দে। তাঁর রাজত্বকালেই ফাতেমীয় প্রতিপত্তি ও গৌরব চরম শিখরে উন্নীত হয়। রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয় আটলান্টিক মহাসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত। পরাক্রমশালী খলিফা আল-আজিজ হয়ে ওঠেন বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত এবং স্পেনের উমাইয়া খেলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী। (দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট)

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের উপরিউক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা যে, ক্রুসেড-পূর্বকালে মুসলিম প্রাচ্যে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি সূর্য অস্তায়মান, কিন্তু তার আঞ্চলিক শক্তি বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তখনও অস্তিত্ববান। ভৌগোলিকভাবে ইউরোপ বা প্রতীচ্য তখন মুসলিম শক্তিসমূহ দ্বারা প্রায় তিন দিক থেকেই পরিবেষ্টিত হয়ে এসেছে। ইউরোপীয় দেশ স্পেনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে উমাইয়া খেলাফত, ভূমধ্যসাগর থেকে আরম্ভ করে আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত এবং উত্তর আফ্রিকা জুড়ে আব্বাসীয় খেলাফত, আর মিশরে ফাতেমীয় খেলাফত। অন্যদিকে খৃস্টান প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যাংশে বিভিন্ন রাজ্য-শক্তি সামন্ততন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ এবং বাইজানটাইন শক্তি পুরোপুরি বিধ্বস্ত। মুসলিম প্রাচ্য জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও সংস্কৃতিক-সামাজিকভাবে অনেক অগ্রসর ও আলোকপ্রাপ্ত; ধর্মীয় দিক থেকে প্রায় কলহমুক্ত। কিন্তু খৃস্টান প্রতীচ্য জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শুধুমাত্র অনগ্রসরই নয়, রীতিমত অন্ধকারাচ্ছন্ন; সাংস্কৃতিক-সামাজিকভাবে ও ধর্মীয় দিক থেকে বিধ্বস্ত এবং কলহযুক্ত। সামন্ত প্রথার আবর্তে পতিত কলুষিত সমাজ-ব্যবস্থায় সুবিধাভোগীদের পুত্রগণ দ্বন্দ্ব-কলহে সর্বদা নিয়োজিত এবং এমনি পরিস্থিতিতে প্রতীচ্যে একক প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যাজকতন্ত্রের শীর্ষে অধিষ্ঠিত রোমের মহামান্য পোপ।

এমনি প্রেক্ষাপটে এবার আমাদের আলোচনা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্য সমাচার সম্পর্কে।

সেকালের বাণিজ্য সমাচার

পৃথিবীর কোন শক্তি কখন ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা করেছিল তার ইতিবৃত্তের সন্ধান না করেও বলা যায়, সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই মানুষ নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন করেছিল। আর তার মাধ্যমে মানুষ যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে খুঁজে পেল প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ লাভের চাবিকাঠি, তখনই আরম্ভ হল একের উপর অন্যের প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টা। জাতিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস শুধু আজকের নয়, বরাবরেই অমোঘ এক সত্য। এই প্রয়াসের পথে সংঘর্ষ বেধেছে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে বিভিন্ন জাতি এবং উত্থান-পতনের পথ ধরে রচনা করেছে ইতিহাস। এই প্রয়াসে সাফল্য লাভ করেই এক জাতি অন্য জাতির উপর প্রাধান্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। কালে কালে সে প্রাধান্যের হয়েছে হাতবদল। প্রাচীন যুগে ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক বাণিজ্যে ঈজিয়ানদের প্রাধান্য কালের অবসানে দেখা দেয় ফিনিসিয়ানদের প্রাধান্যের কাল, তারপর গ্রীকদের এবং তারও পরে রোমানদের প্রাধান্য কাল। রোমানদের পর প্রাধান্য পেল বাইজানটাইনীয়রা এবং তার পরেই আরব-পারশিক মুসলিমরা।

ভূমধ্যসাগরের অন্যতম দ্বীপের নাম ক্রীট। ক্রীট দ্বীপে প্রাচীন সভ্যতার যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তার অস্তিত্বকাল প্রায় হাজার পাঁচ বছর আগের বলে

পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন ঈজিয়ান সভ্যতা। ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল ঈজিয়ানদের জীবিকার প্রধান উপায়।

ঈজিয়ানদের পরে ফিনিসিয়ানদের হাতে চলে আসে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের প্রাধান্য। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে অর্থাৎ প্রাচ্যে ছিল ফিনিসিয়ানদের বাসস্থান অর্থাৎ এশিয়ার সেই অংশে যাকে বলা হত লেভান্ট বা আধুনিক রাজ্য সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি। ফিনিসিয়ানদের বাসভূমির উত্তরে এশিয়া মাইনর, যার আধুনিক নাম তুরস্ক। এখানেও প্রায় একই সময়ে যে সভ্য জাতির বাস ছিল, তাদের নাম হিটাইট। তারাও ছিল বাণিজ্যপটু এক জাতি। ফিনিসিয়ানদের বাণিজ্যবৃত্তির কাহিনী জগদ্বিখ্যাত।

"ফিনিসিয়ানরা ভূমধ্যসাগরে মাছ ধরত আর তা ফেরি করতে আসত ব্যাবিলন পর্যন্ত। এরা নানা দেশের অনেক রকম জিনিসপত্র এনে গ্রীসে, ইটালিতে, মিসরে, এশিয়া মাইনরে, প্যালেষ্টাইনে, এসাইরিয়ায় ও ব্যাবিলনে বিক্রি করত। সোনা, রূপা, হাতীর দাঁত, কাঠ, মাছ, নানা প্রকার শস্য ও সবজি, পোড়ামাটির বাসন ও মূর্তি, এমন কি বাঁদর, ময়ূর প্রভৃতি সংগ্রহ করেও ব্যবসা করত। তারা নীলনদ থেকে লোহিত সাগরে আসবার জন্য একটা চলনসই রকমের খাল তৈরী করে নিয়েছিল। আর ওই খাল বেয়েই গ্রীসের, রোমের ও হিন্দুস্থানের বাণিজ্য জাহাজ বা বড় নৌকা, যাই না বলি কেন যাতায়াত করত"। (কালিকট থেকে পলাশী, শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯, পৃঃ ৭)।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা- যা সাধারণত মেসোপোটেমীয় সভ্যতা নামে পরিচিত, তার অগ্রগতির মূলে কার্যকর ছিল কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি। হাম্মুরাবির আইনে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যে নির্দেশ ছিল তাতে বণিকদের অসাধুতার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। এই আইনে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা ও লোভের জন্য সাবধান করে দেওয়া হয়।

ফিনিসিয়ানদের পর বাণিজ্যে প্রাধান্য আসে প্রথমে গ্রীক ও পরে রোমানদের হাতে। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া নামে যে বন্দর-নগরী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার সঙ্গে জলপথে ভারতবর্ষের যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, ইতিহাসে তা বিধৃত আছে। ভারতবর্ষের বণিকদলের যাতায়াত ছিল আলেকজান্দ্রিয়া ও পালমিরা প্রভৃতি বন্দরে। আবার গ্রীস- রোমের জাহাজ আসত গুজরাটের ব্রোচ বন্দরে। ব্রোচ থেকে উজ্জয়িনী পর্যন্ত ছিল বাণিজ্যের রাজপথ। উজ্জয়িনী তখন ভারতবর্ষের গুপ্ত রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী, মূল রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে বা আধুনিক পাটনায়।

প্রাচ্যের অন্যতম সম্পদ-সমৃদ্ধ বিশাল জনপদ ভারতবর্ষ অতীতে প্রতীচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থোপার্জন করত, সে সম্পর্কে খৃস্টীয় প্রথম শতকে ইটালিয়ান ঐতিহাসিক প্লিনির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "In no year does India drain our Europe off less than fifty five millions of 'sesterces' giving back her own wares in exchange, which are sold at once hundred times their primal cost" কোন বছরই ভারতবর্ষ আমাদের ইউরোপ থেকে কমের মধ্যে হলেও পঞ্চাশ মিলিয়ন 'সেসটারসেস' তার নিজ পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে বের করে নিয়ে যায়, যা সেসবের মূল খরচের শতগুণ বেশি দামে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়"।

"কোন পুরাকালে ভারতবর্ষ এইরূপ শিল্পদ্রব্য বিনিময়ে বিবিধ দূরদেশ হইতে অর্থলাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন প্রাচ্যের তুলনায় অধিকাংশ প্রতীচ্য জনপদ নিরক্ষর জাতির আবাসভূমি বলিয়াই পরিচিত ছিল"। (ফিরিঙ্গি বণিক, শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৬১, পৃঃ ১)

ভারতবর্ষে তখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল। এ সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমানা পাঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্ত থেকে রোমান রাজ্য ছয়-সাত'শ মাইলের বেশি ছিল না। গুপ্ত রাজাদের সঙ্গে রোমান রাজাদের সৌহার্দেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, গুপ্ত রাজন্যবর্গ ছিলেন ভারতবর্ষে বহিরাগত আর্যদেরই সম্পর্কিত উত্তর-পুরুষ। এমনকি, গুপ্তদের আগে ভারতবর্ষে অভিযানে এসেছে মধ্যএশিয়ার আর্য গোষ্ঠীভুক্ত শুঙ্গ-গ্রীক-শক-হুন-কুষাণেরা। কাজেই গুপ্তদের সঙ্গে গ্রীক-রোমানদের সম্পর্ক থাকার ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক।

রোমান প্রাধান্যের প্রতীচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এক বিপজ্জনক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। সেখানে ঘটে গেছে তখন গথ-হুন-ভ্যাণ্ডাল-মোঙ্গলদের আক্রমণ। বিধ্বস্ত হয়ে গেছে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার অনেক অবদান। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী রাস্তাঘাট হয়ে পড়েছে যেমন বিপদসঙ্কুল তেমনি দুর্গম। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠেছে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্যিক সংযোগ। রোমান সাম্রাজ্যেরই পূর্বাংশে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। কনস্টান্টিনোপল তখন বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং বাণিজ্যকেন্দ্র। ভূমধ্যসাগর-কেন্দ্রিক বাণিজ্যে তখন বাইজানটাইনীয়দের প্রাধান্য। এই প্রাধান্যকালের বিস্তৃতি খৃস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত, যা ছিল মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়।

পশ্চিম ইউরোপে চলছে তখন নতুন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিন্যাস। রোমান শক্তির পতনে জনসাধারণের মাঝে এসেছে এক বিরাট শূণ্যতা। রোমান রাজশক্তি আর নেই, রোমান প্রভাবিত ধর্মীয় ধারণাও বিলুপ্তপ্রায়। প্রায় সংস্কৃতিবিহীন সামন্ততন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তার পাশাপাশি খৃস্টীয় যাজকতন্ত্রও শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপকে ঘিরে ধরেছে এক গাঢ় অন্ধকার। যাজকরাও সামন্ত হওয়ার প্রতিযোগিতায় শামিল। অর্থনৈতিকভাবে অ-খৃস্টান ও খৃস্টানদের সামন্ততন্ত্র এবং ধর্মীয়ভাবে খৃস্টীয় যাজকতন্ত্র মিলে এক নৈরাজ্যজনক অবস্থা। পুরাপুরি কৃষিভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক পরিস্থিতি। প্রচলিত মুদ্রার প্রচণ্ড অভাবের জন্য রাজ্যে রাজ্যে চালু হয়ে গেছে বার্টার সিস্টেম, স্থানীয়ভাবে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্যের আদান-প্রদান।

সপ্তম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত মধ্যযুগের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে ভূমধ্যসাগর-কেন্দ্রিক বাণিজ্য-প্রাধান্য এসে গেল মুসলিমদের হাতে। এই সময়ের মধ্যে প্রতীচ্য প্রায় তিন দিক থেকেই মুসলিম নিয়ন্ত্রিত এলাকা দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে গেছে। মুসলিমদের এমনি এলাকা নিয়ন্ত্রণের প্রভাব অনুভূত হল শুধুমাত্র নব-বিজিত জনপদসমূহেই নয়, তার প্রভাব অনুভূত হল পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জনপদেও এবং তা অনুভূত হল যেমন রাষ্ট্রীয় জীবনে, তেমনিভাবে অর্থনৈতিক জীবনেও, তারই সুবাদে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপ তথা মুসলিমদের এই যে বিপর্যয়, তার কারণঃ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্যের জন্য যে তিনটি প্রধান পথ ছিল তার সব ক'টিই চলে গিয়েছিল মুসলিম শক্তির নিয়ন্ত্রণে।

প্রধান প্রধান পথে ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের পণ্যদ্রব্য নিয়ে তাদের জাহাজগুলো সুরাট ও কালিকট বন্দর থেকে পাড়ি জমাত পারশ্য উপসাগরের তীরস্থ বসরা বন্দরে। সেখানে মালামাল উঠত উটের পিঠে। কাসপিয়ান সাগরের কোলে আর্মেনিয়া ও শহর তাবরিজ, কৃষ্ণ সাগরের তীরে ট্রাবজন, সিরিয়ায় আলেপ্পো দামেস্ক প্রভৃতি স্থানে তা বিক্রি হয়ে যা বাঁচত, তা আসত ভূমধ্যসাগরের বন্দরে। সে-বন্দর থেকে জাহাজে করে সেই উদ্ধৃত্ত মালামাল নিয়ে যেত ইটালির ভেসিন ও জেনোয়ার ব্যবসায়ীরা- যাদের বলা হত লোম্বার্দ। এই লোম্বার্দরাই সেসব মাল ছড়িয়ে দিত সমগ্র ইউরোপে।

দ্বিতীয় প্রধান পথটি ছিল সুরাট-কালিকট বন্দর থেকে সোজা কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত বিস্তৃত। কৃষ্ণসাগরের অন্য তীরে অবস্থিত এই কনস্টান্টিনোপল বন্দরটি ছিল ইউরোপের প্রধান বন্দর। কৃষ্ণসাগরের অন্য তীর থেকেই আরম্ভ হয়েছে এশিয়া ভূখণ্ড। ইউরোপের নানা স্থান থেকে বণিকেরা এসে মালামাল কিনত মুসলিম বণিকদের কাছ থেকে।

তৃতীয় প্রধান পথে মিশরের মুসলিম বণিকেরা ভারতবর্ষের মালামাল নিয়ে উপস্থিত হত এডেন বন্দরে। তারপর লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে হাজির হত সুয়েজে। সেখান থেকে উটের পিঠে মাল বোঝাই করে চলে যেত কায়রো, কায়রো থেকে নৌ-পথে আলেকজান্দ্রিয়া। সেখানে ভিড় করত এসে ইউরোপের বণিকেরা। এখান থেকে মুসলিম বণিকদের মাল কিনে নিয়ে তারা দেশে ফিরত।

এর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রাচ্যের মালামালের একচেটিয়া ব্যবসায়ী তখন আরব-পারশিক তথা মুসলিম বণিকেরা। প্রতীচ্যের বণিকেরা প্রাচ্য থেকে আনীত মালামালের অংশ অনেক চড়া দামে কিনে নিয়ে তা ফেরি করে বেড়াত ইউরোপের আনাচে-কানাচে। উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যবসা করে ফিরত প্রধানত মুসলিম বণিকেরা। অর্থাৎ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে এই যে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য, তার মুনাফার সিংহভাগ ভোগ করত মুসলিম বণিকেরাই। ভূমধ্যসাগরের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব তখন আরবদের। তাদের অনুমতিক্রমেই শুধু অন্যান্য দেশ ও জাতির বাণিজ্য-পোত সেখানে ভিড়তে পারত।

একদিকে সমরকন্দ থেকে ভারতবর্ষের লাহোর, অন্যদিকে আটলান্টিক হয়ে স্পেন-বিশাল এ সাম্রাজ্যের অধিকারী মুসলিম শক্তির সামনে উন্মুক্ত তখন বাণিজ্যভিত্তিক অতুল ঐশ্বর্য ভাণ্ডার। এমনি অবস্থায় প্রতীচ্যের রাজ্যগুলো যে হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরবে, এ তো স্বাভাবিক। তবুও কথা থেকে যায়। আরবরা তো বরাবরই বণিকের জাতি। সেই প্রাচীনতম কাল থেকেই তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত। একাধিপত্য না থাকলেও সেই প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্যে আরবরা বরাবরই শামিল ছিল। খৃস্টীয় সপ্তম শতক থেকে সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে সেই বাণিজ্যের পূর্ণ আধিপত্য এসে গেল আরব-পারশিক তথা মুসলিম বণিকদের হাতে। ভূমধ্যসাগরীয় প্রাচ্য-প্রতীচ্য বাণিজ্যের আধিপত্য এর বহু আগে থেকেই বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর হাতে ছিল। নতুন ব্যবস্থায় আধিপত্যহীন জাতিগুলো ক্ষুব্ধ ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই মুসলিম আধিপত্যকালে প্রতীচ্যের ক্রোধ, বিশেষ করে খৃস্টীয় যাজকতন্ত্রের ক্রোধ, সীমা ছাড়িয়ে গেল। ক্রুসেডের মাধ্যমে সে-ক্রোধ যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তা

ভয়ঙ্কর দানবীয় রূপে। কেন?

প্রাচ্যের বাণিজ্যদ্রব্যের মধ্যে জীবন ধারনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এমন সব জিনিস থাকত যা না পেলে ইউরোপীয়দের চলতই না। এসবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় ছিল মসলা। "ইউরোপের সর্বত্র এই প্রবল মসলাপ্রীতির কারণ ছিল দু'টি। একটি খাদ্য সংরক্ষণ, অন্যটি ভৈষজ্য প্রয়োগ। সেকালে ইউরোপে সর্বসাধারণের প্রধান খাদ্য ছিল মাংস। সেখানে শাক সবজির চাষ, এমনকি আলুর চাষও শুরু হয় অনেক পরে। যেসব ফল একালে ইউরোপে সাধারণভাবেই জন্মে, তারও কোন চিহ্ন তখন ছিল না। এখনকার মত তখন মাংস সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ বিশেষ করে শীত ঋতুতে তাজা মাংস ছিল অত্যন্ত আয়াসলভ্য। কাজেই মাংস সংরক্ষণ ছিল মাংস সংগ্রহের মতই অপরিহার্য ব্যাপার। এ কাজ করা হত মসলা দিয়ে। মসলা শুধু মাংস সংরক্ষণই করত না, বাসি মাংসের দুর্গন্ধ দূর করে তাকে খাদ্যোপযোগী করেও তুলত। এ কার্যে প্রধান সহায় ছিল গোলমরিচ। তারপর ভেষজের কথা।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি.... (তখন) কোথাও আধুনিক ভেষজের সৃষ্টি হয়নি। .... গাছপালা থেকে তৈরি নানা মুষ্টিযোগ বা টোটকা ওসুধই ছিল রোগে মানুষের ভরসাস্থল। হিন্দুস্থানে তৈরি নানা প্রকার আয়ুর্বেদীয় ভেষজের সুনাম সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে পারশ্য ও আরবের দৌত্যে। তাছাড়া ইউরোপের নানা জাতের নাবিকের বিভিন্ন মসলা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেও"। (কালিকট থেকে পলাশী, শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯, পৃঃ ১৭-১৮)

এসব মসলার মধ্যে ছিল গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, আদা, দারুচিনি, জায়ফল, জয়ত্রী, তেতুল ইত্যাদি। মসলা ছাড়াও তখনকার ইউরোপীয়দের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল চন্দন কাঠ, ভাঙ ও আফিঙ। ভাঙ ও আফিঙ এর ভৈষজ্য শক্তি অসাধারণ। এসব মসলার বেশিরভাগই চালান যেত দ্বিতীয় প্রধান পথটি দিয়ে কনস্টান্টিনোপলের দিকে; সেখান থেকে ভেনিসে। দক্ষিণ-ভারতের মালাবার উপকূল ও লঙ্কাদ্বীপ (সিংহল বা আধুনিক শ্রীলঙ্কা) ছিল যথাক্রমে গোলমরিচ ও দারুচিনির প্রাপ্তিস্থান। দূর-প্রাচ্যের সুমাত্রা দ্বীপও ছিল গোলমরিচের জন্য বিখ্যাত। তদুপরি, বিখ্যাত ছিল মালাক্কা দ্বীপের লবঙ্গ, এ্যামবয়িনা ও বান্দা দ্বীপের জয়ত্রী ও জায়ফল। আরব-পারশিক বণিকেরা দূর-প্রাচ্যের এসব মসলা জাহাজে করে উপস্থিত হত এসে মালাবারের কালিকট বন্দরে। তার সঙ্গে যোগ হত হিন্দুস্থানের মসলাদি, মণিমুক্তা ও অন্যান্য পণ্য।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই বাণিজ্য পথে জংশন ছিল যেন ভারতবর্ষের উপকূলীয় বন্দর গুজরাটের সুরাট ও মালাবারের কালিকট। চীন থেকে আরম্ভ করে দূর-প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিংহল ভারতের বাণিজ্য পণ্যবাহী জাহাজগুলো ভিড়ত এসে সুরাট ও কালিকট বন্দরে; সেখান থেকে প্রধান তিনটি বাণিজ্য পথে রওনা করত প্রতীচ্যের দিকে। আরব-পারশিক মুসলিম বণিকদের হাতে এসব বাণিজ্যপথের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যখন এসে গেল, তখন স্বাভাবিকভাবেই অসুবিধায় পড়ল প্রতীচ্যের রাজ্যগুলো। সেসব রাজ্যের ব্যবসায়ীরা তখন হয়ে পড়ল দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের পাইকার জাতীয় ব্যবসায়ী।

এই অর্থনৈতিক বিবেচনার বাইরে খৃস্টান প্রতীচ্যের আরও একটি বিবেচনা এবং আমাদের মতে সেটাই প্রধান বিবেচনা, নিশ্চয়ই ছিল। সেটা হচ্ছে ধর্মীয় বিবেচনা। ধর্মীয় পরিচয়ে ততদিনে আরব-পারশিক বণিকেরা হয়ে গেছে ইসলাম অনুসারী, মুসলমান। একদিকে রাজ্যবিজয়ী, অন্যদিকে বাণিজ্যবিজয়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রোশে বিষিয়ে উঠল খৃস্টান প্রতীচ্যের মন ও মানস। অথচ অতীতে কি রাজ্যবিজয় বিষয়ে কি বাণিজ্যবিজয় বিষয়ে এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতির মন ও মানস তো এতটা বিষিয়ে ওঠেনি। এবারই খৃস্টান প্রতীচ্যের কাছে মুসলিম প্রাচ্য হয়ে দাঁড়াল এক বিপজ্জনক জানী দুশমন। এই 'জানী দুশমন' হওয়ার অন্য কারণটা ইসলাম অনুসারী হওয়ার মধ্যেই নিহিত নয় কি? অর্থাৎ 'ওরা ইসলাম অনুসারী মুসলমান' ওরা রাজ্যবিজয়ী, ওরা বাণিজ্যবিজয়ী, ওরা ভৌগোলিকভাবে প্রায় তিন দিক থেকে আমাদের অস্তিত্বকে ঘিরে ধরেছে। তাই ওরা আমাদের 'জানী দুশমন'। খৃস্টীয় যাজকতন্ত্র প্রভাবিত সামন্ততন্ত্রী প্রতীচ্যের মন-মানসের গভীরে এই-ই ছিল সত্যিকার ধারণা। ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যে মুসলিম প্রাধান্যকে প্রতিরোধ করতে না পেরে, নিজেদের অনগ্রসর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন-মানসিকতাকে ও রাষ্ট্রীয় অযোগ্যতাকে ঘৃণা-বিদ্বেষের দানবিক সব উপাদানে আবৃত করে, জানী দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৈরি হল প্রতীচ্য। এ কাজে অগ্রনী ভূমিকা পালন করল খৃস্টীয় যাজকতন্ত্র, সহযোগীর ভূমিকায় রইল সামন্ততন্ত্র। দানবীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হল অশিক্ষিত দুশ্চরিত্র পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত অকর্মণ্য সামন্ত-সন্তান আর আপামর যুবসমাজকে। প্রতিশোধ গ্রহণের এই আগত ধ্বংসযজ্ঞে সর্বাগ্রে উপস্থাপিত করা হল ধর্মকে। আবেগমথিত কণ্ঠে ঘোষিত হল ঃ উদ্ধার কর পবিত্র জেরুযালেম!!

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সেনাপতি আমর ইবনুল আ'স খৃস্টানদের নিয়ন্ত্রণ থেকে উদ্ধার করেছিলেন জেরুযালেমসহ সমগ্র প্যালেস্টাইন। জেরুযালেমের খৃস্টান অধিবাসীদেরই অনুরোধে খলিফা স্বয়ং সেখানে গিয়ে ঘোষণা করলেন মুসলিম অধিকৃত জেরুযালেমে খৃস্টান-ইহুদী-মুসলিম সকলেরই জন্য সমান ধর্মীয় স্বাধীনতা। ইসলামের মহান নবীজি (সাঃ)-এর মিরাজ গমনের স্থান, হযরত দাউদ (আঃ) এর পুত্র হযরত সোলায়মান (আঃ) , হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এর স্মৃতিবিজড়িত জেরুযালেম যে সকলের নিকটই সমভাবে পবিত্র।

জেরুযালেম প্রসংগ ঃ

হযরত দাউদ (আঃ) এর পুত্র হযরত সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদ বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুকে ধারণকারী জেরুযালেম তথা ফিলিস্তিন ভূমিসহ সমগ্র সিরিয়াই হচ্ছে আল-কুরআনে বর্ণিত সেই 'পবিত্র ভূমি'। এ ভূভাগটি বণী ইসরাঈলী অনেক অনেক পয়গম্বরের জন্মস্থান ও সমাধিভূমি। এই 'পবিত্র ভূমি' তাই শান্তিভূমি হওয়াই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে এ 'পবিত্র ভূমি' যুদ্ধবিগ্রহজনিত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে বহুবার। বহুবার বিভিন্ন মতবিশ্বাসীদের অস্ত্রচালনার ফলে মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এর মাটি। খৃস্টপূর্ব কালেও, খৃস্টাব্দ চিহ্নিত কালেও। বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর বাবেল-সম্রাট বুখতে নসর কর্তৃক

নিয়োজিত জেরুযালেমের শাসনকর্তা তার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে বুখতে নসর বায়তুল মুকাদ্দাসের শহর আক্রমণ করে তা অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে দেয়। খৃস্টপূর্ব ১৭০ বছর আগে আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা-সম্রাট জেরুযালেমের ওপর চড়াও হয়ে হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা করে, বাকী অনেকেই দাসরূপে সঙ্গে নিয়ে যায়।

আলফ্রেড ডুগান তাঁর রচিত (১৯৬৩) গ্রন্থ 'দি স্টোরি অব দ্য ক্রুসেড্স' এ 'দ্য হোলি প্লেসেস' নামক প্রথম পরিচ্ছেদে এমনি আরও বিপর্যয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। জেরুযালেমে খৃস্টানদের প্রথম গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয় 'পেন্টিকস্ট' নামক ইহুদী পর্ব পালনের সময়। তখন থেকে জেরুযালেমে খৃস্টানদের বসবাস আরম্ভ হয়। অবিশ্যি সেখানে শত্রুদের অভিযান কালে এসব খৃস্টান বাসিন্দা জেরুযালেম ছেড়ে পালিয়ে যেত মফস্বল অঞ্চলে। এমনি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় ৭১ এবং ১৩৫ খৃস্টাব্দে। ৭১ খৃস্টাব্দে একসর এবং ১৩৫ খৃস্টাব্দে অন্যবার ইহুদীরা তৎকালীন প্রকৃতি-পূজক রোমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এবং দু'বারই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ৭১ খৃস্টাব্দে জেরুযালেমের ইহুদী মন্দিরটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় আর ১৩৫ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট হাদ্রিয়ান জেরুযালেমকে ইহুদীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে রোমান শহরের আদলে পুনর্নিমিত করেন। রোমানদের কল্পিত দেব-দেবীর পূজা আরম্ভ হয় সেখানে। তবে খৃস্টানদের গির্জা রোমান সম্রাটের করুণায় টিকে থাকে সেখানে।

অতঃপর আসে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের শাসনকাল। ততদিনে, যিশুখৃস্টের তিরোধানের প্রায় ৩০০ বছর পরে, সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন খৃস্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে স্বীকার করে নেন। সম্রাট-জননী সেন্ট হেলেনা কালভারি নামক 'যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া'র স্থানে গমন করেন এবং সেখানকার একটি বিশেষ স্থান খনন করে 'ট্রু ক্রস' টির সন্ধান লাভ করেন। তারপর সেখানে এক অতি-বৃহৎ রোমান প্রাসাদ নির্মাণ করে তিনি সেখানকার সব স্মরণীয় পবিত্র স্থানগুলিকে সেই প্রাসাদ ছাদের অভ্যন্তরস্থ করেন। তাতে করে যিশুখৃস্টের সকল স্মৃতি-চিহ্নই সুরক্ষিত হয়। ইতোমধ্যে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন বাইজানটিয়াম নগরীতে এক নতুন রাজধানী স্থাপন করে তার নামকরণ করেন কনস্ট্যান্টিনোপল।

অতঃপর ৪০০ খৃস্টাব্দের দিকে রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সমস্যার সমাধান হিসাবে সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়- পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে। এড্রিয়াটিক সাগরের পশ্চিমাংশের সকল জনপদ নিয়ে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে রাভেন্না প্রকৃত প্রশাসনিক কেন্দ্র হলেও যার রাজধানী থেকে যায় রোমে এবং বলকান অঞ্চল ও এশিয়া মাইনরের জনপদসমূহ নিয়ে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য যার রাজধানী থাকে কনস্ট্যান্টিনোপলে। আভিজাত্য ও খৃস্টানত্বের দিক দিয়ে এই দু'য়ের মধ্যে একটি তারতম্য বোধ বিদ্যমান ছিল। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রোমানীয়রা পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীকগণকে নিজেদের অপেক্ষা কিছুটা নিম্নস্তরের মানুষ বলে মনে করত। তদুপরি, ভাষাগত কৌলীন্যের কথাটাও এমনি মনে করার পেছনে কার্যকর ছিল। দুই সাম্রাজ্যের লোকজনই ততদিনে খৃস্টান হয়ে যাওয়ায় উভয়টিতেই গির্জা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সম্মানিত প্রতিষ্ঠান। পূর্বাঞ্চলীয় গির্জায় প্রার্থনার ভাষা ছিল গ্রীক, আর পশ্চিমাঞ্চলে ল্যাটিন। এদিক থেকে ল্যাটিন ভাষা ছিল আভিজাত্যে উচ্চস্থানীয়।

পশ্চিমাঞ্চলে রোমের পোপ ছিলেন সে সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ধর্মীয় নেতা। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে এমনটি ছিল না। সেখানে ধর্মীয় ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকার ছিল সম্রাটের। গ্রীকরা পোপকে সিনিয়ার ধর্মীয় নেতা বলে মান্য করত, কিন্তু তার একার আদেশ নির্দেশই পূর্বাঞ্চলীয়দের কাছে অবশ্য পালনীয় ছিল না। সেখানে অনেকটা 'জুনিয়ার পোপ' জাতীয় ধর্মীয় নেতা ছিলেন জেরুযালেম, এন্টিওক, আলেকজান্দ্রিয়া ও কনস্ট্যান্টিনোপলের গির্জা চতুষ্টয়ের ধর্মীয় প্রধানেরা। যাঁদেরকে নিযুক্ত করতেন সম্রাট। জাতির জন্য কোন বিশেষ আদেশ-নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিলে তার সিদ্ধান্ত নিতেন সকল ধর্মীয় প্রধানদের কাউন্সিল। এবং এক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিধানের লক্ষ্যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সম্রাট। কাজেই, দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে মতভেদ যথেষ্টই ছিল বলতে হবে।

৬১০ খৃস্টাব্দে পারশ্যবাসীরা পূর্বাঞ্চলের গ্রীক সাম্রাজ্যে অভিযান চালায়। ৬১৪ খৃস্টাব্দে তারা ইহুদীদের যোগসাজসে অধিকার করে নেয় জেরুযালেম। তখন নিধনযজ্ঞ চালিয়ে অভিযান কারীরা ৬৫ হাজার খৃস্টানকে হত্যা করে, আর দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয় ৩৫ হাজারকে। যিশুর স্মৃতি চিহ্ন নিয়ে যে গির্জা ছিল, তা ভস্মীভূত করে দেয় এবং সেখান থেকে 'ট্রুক্রস' বা 'সেপালকার' টিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অবিশ্যি, পরবর্তীতে ৬৩০ খৃস্টব্দে সম্রাট হেরাক্লিয়াস পারশ্য কর্তৃপক্ষকে পরাস্ত করে যিশুর সেসব স্মৃতি চিহ্নকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু এই যুদ্ধ চলতে থাকে আরও কিছু সময় ধরে। ফলে উভয় পক্ষই শক্তিক্ষয়ের মাধ্যমে হয়ে পড়ে দুর্বলতর।

এমনি অবস্থায় জেরুযালেমের দৃশ্যপট আবির্ভূত হয় মুসলিম শক্তি। ৬৩৮ খৃস্টাব্দে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে জেরুযালেম এসে যায় মুসলমানদের অধিকারে। এই অধিকার সুরক্ষিত থাকে একাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত। আর তখনই আরম্ভ হয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ।

এর মধ্যে সময়কার জেরুযালেমে প্রায় ৪৬০ বছরের যে মুসলিম অধিকার, তার সবটুকু সময় কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদা আমলের ইসলামী শাসন ছিল না, তার অধিকাংশ সময়ই ছিল রাজতন্ত্রী মুসলিম শাসন। সেই রাজতন্ত্রী শাসনামলে মুসলিম, গ্রীক ও রোমান শক্তির মধ্যে যে খেলামেলা, তা তো প্রকৃত প্রস্তাবে তিন রাজশক্তির মধ্যেকার খেলামেলা। ইতোমধ্যে গথ, হুন, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি 'বর্বর' আক্রমণে পশ্চিমাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্য বিধ্বংস্ত হয়েছে, সেখানে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং কালক্রমে সেই সামন্ত ব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত হয়েছে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাজ্য। আর ক্রমবর্ধমান শক্তির অধিকারী হয়েছে খৃস্টীয় যাজকতন্ত্র। পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীক সাম্রাজ্যেও রাষ্ট্রশক্তির উত্থান-পতন হয়েছে। তেমনি উত্থান-পতনের খেলা জমে উঠেছে মুসলিম সাম্রাজ্যেও।

নড়বড়ে অবস্থায় ইউরোপে (প্রাক্তন পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য) সামন্ততন্ত্র তো নতুন বিন্যাসে কতিপয় রাজ্যের জন্ম দিল, কিন্তু সেসব রাজ্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে পারল না। এমনি অবস্থায় সেখানকার একক সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতৃত্ব হিসাবে আবির্ভূত হলেন রোমের পোপ। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, পোপের শুভেচ্ছা ছাড়া ইউরোপের কোন রাজ্যের অধিপতিই জনগণের পুরাপুরি আনুগত্য লাভ করা সম্ভবপর মনে করলেন না। তদুপরি, সমগ্র ইউরোপের কর্তৃত্ব লাভে তো পোপের শুভেচ্ছা

প্রধানতম শর্ত হয়ে দাঁড়াল। তাই দেখা যায়, ৮০০ খৃস্টাব্দে পশ্চিমাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্যে সেখানকার একক সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা রোমের মহামান্য পোপ মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন রাজা শার্লেমেনের মাথায় এবং তাকে রোমানীয়দের সম্রাট বলে ঘোষণা করছেন। নতুন বলে বলীয়ান হয়ে সম্রাট শার্লেমেন সরাসরি বাগদাদস্থ আব্বাসীয় খলিফা হারুন আল রশীদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি নিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করছেন, এবং জেরুযালেমে খৃস্টান তীর্থযাত্রীদের থাকা খাওয়ার সুবিধার জন্য ভবন নির্মাণের অনুমতি নিচ্ছেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফার কাছে সম্রাট শার্লেমেন্টের এমনি মর্যাদা দর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি ও লোকজন।

দশম শতকে পূর্বাঞ্চলীয়রা শক্তিতে আবার প্রবল হয়ে উঠল। সিলিসিয়া তারা কেড়ে নিল পশ্চিমাঞ্চলীয়দের হাত থেকে এবং ৯৬৯ খৃস্টাব্দে দখল করে নিল এন্টিওক। ওদিকে ততদিনে আবার অযোগ্যতার অভিশাপ নেমে এসেছে আব্বাসীয় খেলাফতের ওপর। বাগদাদের খলিফারা অযোগ্য, দুর্বল তাই তারা উজীর আমীরদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। ফলে, মুসলিম জাহানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত- একটি মিশরে ফাতেমীয় খেলাফত, অন্যটি স্পেনে উমাইয়া খেলাফত। বাগদাদভিত্তিক আব্বাসীয় খেলাফতের শক্তি মিনার কোনরকমে দাড়িয়ে আছে মাত্র। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত হিসাবে আবির্ভূত মিশরের ফাতেমীয় খেলাফত ও তার দুই খলিফা আল-মুইজ (৯৫২-৯৭৫ খৃঃ) এবং আল-আমীয়ের (৯৭৫-৯৯৬ খৃঃ) মৃত্যুর পর অযোগ্যতার অতলে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করে। পরবর্তী খলিফা আল-হাকিম (৯৯৬-১০২১ খৃঃ) ছিলেন প্রায় উন্মাদ এক ব্যক্তি। অল্প বয়স্ক এই প্রায় উন্মাদ খলিফাটির 'কৃতিত্বের' মধ্যে ছিল দিনে দরবার না বসিয়ে রাতে দরবার বসানো, দিনে রাজধানীর দোকানপাট বন্ধ রেখে রাতে খোলা রাখার নির্দেশদান, জেরুযালেমের 'হোলি সেপালকার'সহ কতিপয় গির্জার ধ্বংস সাধন ইত্যাদি। তদুপরি এই খলিফাটি ইসমাঈলী ধর্মতত্ত্বের সূত্র ধরে নিজেকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করে বসেন। বৎস, তার পরেই তিনি নিহত হন। এরপর ফাতেমীয় বংশের আর মাথা উঁচু করে দাড়াবার সুযোগ বা সামর্থ্য কোনটাই আসে না। ফাতেমীয় খলিফাদের নামে মাত্র শাসন বজায় থাকে ১১৭১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। তার পরেই মিশরীয় দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন প্রথমে নুরুদ্দিন জঙ্গী এবং পরে গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। কিন্তু সেটা পরের কথা, এবং পরে যথাস্থানে তা বিবৃত হবে।

ওদিকে ১০৫০ খৃস্টাব্দের দিকে এশিয়া মাইনরে দেখা দিল তূর্কীদের ক্রিয়াকান্ড। এই সব তূর্কীরা ছিল ইসলামে নব-দীক্ষিত, প্রকৃত ইসলামী আদর্শ থেকে অনেকটাই দূরে। এই সব তূর্কীরা শক্তিতে ছিল প্রবল, ইচ্ছা করলে আব্বাসীয় মসনদ দখলও করতে পারত তারা। কিন্তু তা না করে বাগদাদী খলিফার আনুগত্য মেনে নিয়েই তারা সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ কাজে মনোযোগী হন। তাদের নেতৃত্ব ভূষিত হল 'সুলতান' উপাধিতে। এশিয়া মাইনর ছিল তাদের কর্মক্ষেত্র। তাদের 'দৌরাত্ম্য'প্রতিরোধ করতে সম্রাট ডায়োজিনিস রোমেনাসের নেতৃত্বে কনস্ট্যান্টিনোপলের বিশাল বাহিনী এগিয়ে এল। কিন্তু ১০৭১ খৃস্টাব্দে মানজিকার্টের যুদ্ধে পূর্বাঞ্চলীয় সম্রাটের এ বিশাল বাহিনী পরাস্ত-পর্যুদস্ত হল। এশিয়া মাইনরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তূর্কী সুলতানের আধিপত্য। এই তূর্কীরা সেলজুক তূর্কী বলে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। ফাতেমীয় খেলাফতের অবসানে জেরুযালেমের অধিকারও চলে আসে এই সেলজুক তূর্কীদের হাতে।

কিন্তু ৬৩৮ খৃস্টাব্দে হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে জেরুযালেম মুসলিম অধিকারে আসার পর সেখানকার অমুসলিম অধিবাসীরা যেসব ধর্মীয় ও প্রশাসনিক উদারতা ভোগ করতে আরম্ভ করে, মুসলিম রাজতন্ত্রীয় শাসনামলের শেষ দিকে, বিশেষ করে তূর্কী শাসনামলে সে-উদারতায় ঘাটতি দেখা দিল। সুদীর্ঘ কাল ধরে জেরুযালেম মুসলিম অধিকারে থেকে যাওয়ার জ্বালা তো খৃস্টানদের মনে ছিলই, সে-অধিকারের শেষ দিককার শাসকবৃন্দের অনুদার ব্যবহার সেই জ্বালাকে আরও বাড়িয়ে দিল।

ইতোমধ্যে এশিয়া মাইনরে সেলজুক সুলতানদের শক্তিমত্ত উত্থান কনস্ট্যান্টিনোপলের শক্তিকে নিস্তেজ করে ফেলে। সেলজুক সুলতান আলপ-আরসালান কর্তৃক ১০৭১ খৃস্টাব্দে মানজিকার্দের যুদ্ধে গ্রীক সম্রাটকে নাস্তানাবুদ করার কথা আগেই বলা হয়েছে। পরবর্তী সেলজুক সুলতান মালিক শাহর শাসনামলে (১০৭৩-১০৯২ খৃঃ) মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্বে কাশ্মীর থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত, উত্তরে জর্জীয়া থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন কালে সেলকুজ সুলতানদের উত্থান ও নানাবিধ কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য একদিকে যেমন মুসলিম সাম্রাজ্যে সুন্নী ইসলামের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করে, অন্যদিকে এশিয়া মাইনরে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অবসানের সূচনা করে।

এমনি অবস্থায় বাইজানটাইন সম্রাট আলেকসিয়াস কমনেনাস গ্রীক রোমান বা পূর্বাঞ্চলীয়-পশ্চিমাঞ্চলীয় খৃস্টান নেতৃত্বের পরস্পর অনৈক্যের কথা ভুলে গিয়ে সাম্রাজ্য রক্ষার তাগিদে রোমের পোপকে এশিয়া মাইনর পুনরুদ্ধারে তার সাহায্য কামনা করে বিনীত আবেদন জানান। সেটা ১০৯৪ খৃস্টাব্দে। এই আবেদনকে পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীক গির্জাসমূহের ওপর রোমের সর্বোচ্চ যাজক নেতৃত্বের প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেন রোমের মহামান্য পোপ। এ প্রসংগে আরও যেসব বিবেচনা তার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল বলে আমরা মনে করি, সেসব বিবেচনা স্বাভাবিকভাবেই ছিল পাশ্চাত্যে বিরাজমান তখনকার বাণিজ্যিক পরিস্থিতি, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি এবং ধর্মীয় ও সর্বোচ্চ মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি।

স্মরণাতীত কাল থেকে প্রতীচ্যের বিভিন্ন রাজ্য-সাম্রাজ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রাচ্য থেকে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করত। এই প্রাচ্য-বাণিজ্যই ছিল প্রতীচ্যের লাইফ ব্লাড বা প্রাণ রক্তের যোগানদার। এ বাণিজ্য বন্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থই ছিল জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য সেই প্রাণ রক্ত নিঃশেষ হয়ে যাওয়া বা তার স্বাভাবিক চলাচল মারাত্মকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। অথচ মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী তথা মুসলিম শক্তির অভ্যুদয়ে এবং স্বল্পকালের মধ্যে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ফলে প্রতীচ্যের সেই অপরিহার্য প্রাণ রক্তের অঞ্চলই বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেল।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্য পথ ছিল তিনটি। মুসলিম শক্তির আবির্ভাবে এ তিনটি বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণই এসে গেল মুসলমানদের হাতে। আর তাতে অসুবিধায় পড়ল সমগ্র প্রতীচ্য। প্রতীচ্যের বাণিজ্য বলতে কিছুই আর রইল না, রইল শুধু মুসলমান বণিকদের কাছ থেকে মালামাল কিনে নিজেদের জনপদে পাইকারী ব্যবসা করা। এ কারণে মুসলিম শক্তির ওপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিল প্রতীচ্য।

'বর্বর'দের আক্রমণে বিধ্বস্ত রোমান সাম্রাজ্য প্রথম সামন্ততন্ত্র এবং পরে তারই নব-বিন্যাস সৃষ্ট বিভিন্ন রাজ্য গঠিত হলেও তা ছিল অসংগঠিত বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র মাত্র, উচ্ছৃঙ্খল পরস্পর বিচ্ছিন্ন তারুণ্যের বিভিন্ন সমাহার মাত্র।

ধর্মীয় দিক থেকেও প্রতীচ্য তখন অনেকটাই অনগ্রসর। প্রকৃতি পূজক জাতিসমূহ তখন সবেমাত্র খৃস্টধর্মের আওতায় এসেছে। আর প্রায় অশিক্ষিত খৃস্টান জন মণ্ডলী ইসলাম অনুসারীদের সুখ ও সমৃদ্ধির কল্প-কথা শুনে ঈর্ষায় জ্বলে মরছিল, আর ছোট বড় রাজধানীগুলোতে খৃস্টান নেতৃবৃন্দ তাদের সর্বব্যাপী অসামর্থকে আড়াল করার জন্য 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' হিসাবে বেছে নিয়েছিল ইসলাম অনুসারী রাজন্যবর্গকে। বহুকাল ধরে জেরুযালেম মুসলিম শক্তির হাতে এবং সে শক্তি একের পর এক গ্রাস করে নিচ্ছে খৃস্টান-শাসিত জনপদ।

এমনি পরিস্থিতিতে রোমের 'মহামান্য পোপের' কাছে সম্রাট আলেকসিয়াসের নতিস্বীকারমূলক সাহায্য প্রস্তাবের ফলে এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব এসে যায় পোপ দ্বিতীয় আরবানের হাতে। এবং তার ফলে উপযুক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন পোপ দ্বিতীয় আরবান। সমগ্র খৃস্ট জগতের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব হাতে পেয়ে মহামান্য পোপ ১০৯৫ খৃস্টাব্দের মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর-ইতালী ও দক্ষিণ ফ্রান্স সফর করে সেখানকার রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। অতঃপর ফ্রান্সের ক্লারমাউন্টে এক ঐতিহাসিক মহাসমাবেশ। সময়টা শীতসঙ্কুল নভেম্বর হলেও শতাধিক খৃস্টান সম্প্রদায়ের হাজার হাজার উৎসাহী শ্রোতার তাঁবুতে তাঁবুতে ভরে যায় ক্লারমাউন্টের উন্মুক্ত প্রান্তর। যথাদিনে যথাসময়ে সেখানে নির্মিত উচ্চ মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ভাষণ দান করেন খৃস্টজগতের একচ্ছত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মহামান্য পোপ দ্বিতীয় আরবানঃ "হে ফ্রাঙ্ক জাতির সন্তানেরা! এই মহান জাতি ঈশ্বর নির্বাচিত তাঁর এক প্রিয় জাতি। ... জেরুযালেমের চৌহদ্দি থেকে এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের আশপাশ থেকে প্রাপ্ত নিদারুণ দুঃখ-সংবাদ এই যে, সেখানে অভিশপ্ত এবং পুরোপুরি ঈশ্বর বিরোধী এক জাতি খৃস্টানদের জনপদসমূহে হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে আসছে, আর লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনশূণ্য করে দিচ্ছে সেসব জনপদকে। খৃস্টান বন্দীদের একাংশকে তারা নিয়ে যাচ্ছে নিজ দেশে, অন্যদেরকে হত্যা করছে নির্মম অত্যাচারের পর। তারা তাদের অশূচী নোংরামি দিয়ে কলুষিত করে দিচ্ছে গির্জাগুলোর পূজাবেদি। গ্রীক সাম্রাজ্য এখন তাদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে; এর মধ্যেই গ্রীকদেরকে তারা বঞ্চিত করেছে এমন এক ভূখণ্ড থেকে যার বিশালতা দুই মাসেও পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়।

কাদের ওপর ন্যস্ত আজ এই অত্যাচার-অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের ও খৃস্টানদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব? আপনাদের ওপর নয়? সেই আপনাদের ওপর যাদেরকে ঈশ্বর দিয়েছেন অস্ত্রেশস্ত্রে, সাহসে-শৌর্যে আর শক্তিতে শত্রুর মাথা নত করে দেয়ার মত অসাধারণ গৌরব? আপনাদের পূর্বপুরুষের কীর্তিকান্ত, সম্রাট শার্লেমেনের এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের গৌরব-গাথা আজ আপনাদেরকে উৎসাহিত করুক। আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা যীশুর পবিত্র কবরভূমি আজ ওই অশূচী জাতির অধিকারে এই অপ্রিয় সত্য আপনাদেরকে জাগ্রত করুক...... আপনাদের সহায় সম্পত্তি যেন আপনাদেরকে পেছনে না টানে, পেছনে না টানে যেন আপনাদের পরিবার চিন্তা। যে জনপদে আপনারা বসবাস করছেন তা চারদিক থেকে সমুদ্র আর পাহাড়

ঘেরায় আবদ্ধ। এত বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য তা খুবই সংকীর্ণ, সবাইকে খাদ্য প্রদানে যথেষ্ট আকার সম্পন্ন নয়। তাই আপনারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হন, এবং তারই পরিণামে অনেকে ধ্বংস প্রাপ্ত হন।

তাই আমার আবেদন- আপনাদের মধ্য থেকে হিংসা, বিদ্বেষ দূরীভূত হোক, অবসান হোক সকল বিবাদ বিসম্বাদের। পবিত্র কবর ভূমির পথে শামিল হোন সবাই, দুষ্ট ধূর্ত সেই জাতির হাত থেকে হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করে তা নিজেদের করে নিন। জেরুযালেম হচ্ছে আমাদের সকল আনন্দের এক স্বর্গভূমি। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সেই রাজকীয় নগরী আজ উদ্ধারের জন্য আপনাদের কাছে মিনতি জানাচ্ছে। সর্বপাপ মোচনের জন্য আপনারা সাগ্রহে তার পথে অগ্রসর হোন, আর স্বর্গরাজ্যে অক্ষয় বাসের গৌরব ও পুরস্কারের নিশ্চয়তা লাভ করুন।

ধর্মান্ধ দানবিক শক্তির কানে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হল খৃস্টান ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় আরবানের উদ্দীপ্ত ঘোষণাঃ জেরুযালেমের পুনরুদ্ধারকল্পে অগ্রসরমান ক্রুসেডারদের বর্মে যতক্ষণ থাকবে ক্রুসচিহ্ন, ততক্ষণ তাদের জন্য থাকবে ইহলোকে আর্থিক সকল সুযোগের এবং পরলোকে স্বর্গলাভের নিশ্চয়তা। উদ্ধার কর পবিত্র জেরুযালেম!! God Wills it! মহামান্য পোপের এই বাণী শ্রোতৃমণ্ডলীর গগনবিদারী লক্ষ কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল God Wills it ঈশ্বর এ-ই চান!!!....... ১০৯৫ খৃস্টাব্দ। এগিয়ে চলল ক্রুসেড-বাহিনী।

জার্মান প্রফেসার মেয়ারের কথা, "Pope Urban 11 opened the council of Clermont on 18 November 1095 the moment that has gone down in history as the starting point of the Crusades.... The moment which gave the council its special place in history came right at the end on 27 November. On this day the Pope was due to make an important speech". (The Crusades, Hans Eberhard Mayer, 1972, p.9)। ১০৯৫ সালের ১৮ই নভেম্বরকে ইতিহাসে ক্রুসেডের সূচনা সময় বলে ধরা হলেও যে মুহূর্তটি আহূত কাউন্সিলের ইতিহাসে বিশেষ স্থান বলে চিহ্নিত হয়ে আছে, তা হচ্ছে ২৭শের নভেম্বরের শেষ লগ্ন। ওই লগ্নেই পোপ দ্বিতীয় আরবান তার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সমবেত খৃস্টান শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন প্রাচ্য-মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন। অতঃপর আরম্ভ হল খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের সংগঠনের কাজ এবং সংগঠন শেষে ক্রুসেডের নামে, মানব-হননের জন্য অভিযাত্রার তারিখ নির্ণয়। "Urban fixed the start for 15 August 1096"! (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রুসেড ও জেহাদ

প্রাচ্য-মুসলিমদের রাজ্য বিস্তার ও বাণিজ্য প্রাধান্যের প্রেক্ষাপটে খৃস্টান প্রতীচ্য সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় আরবানের নির্দেশে যে সর্বাত্মক ক্রুসেড আরম্ভ করে তার ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে ১০৯৬ সাল থেকে ১২৯১ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর। অবিশ্যি, এর পরেও মুসলিম-খৃস্টানের মধ্যে ভয়ানক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোকে 'পরবর্তী ক্রুসেড' বলে সাধারণত আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ১০৯৬ থেকে ১২৯১ সালের ব্যাপ্তিতে ৯টি প্রধান ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে যার কাল-উল্লেখে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রফেসার আতিয়ার উল্লেখ অনুযায়ী (Crusade, Commerce and Culture, Aziz S. Atiya, Oxford University, 1962) উপরিউক্ত নয়টি ধর্মযুদ্ধের সময়কাল হচ্ছে- প্রথম ক্রুসেড ঃ ১০৯৫-১০৯৯ সাল; দ্বিতীয় ক্রুসেডঃ ১১৪৬-১১৪৮ সাল; তৃতীয় ক্রুসেড ঃ ১১৮৯-১১৯২ সাল; চতুর্থ ক্রুসেড ঃ ১১৯৯-১২০৪ সাল; পঞ্চম ক্রুসেড ঃ ১২১৭-১২২১ সাল; ষষ্ঠ ক্রুসেডঃ ১২২৮-১২২৯ সাল; সপ্তম ক্রুসেড ঃ ১২৪৯-১২৫৪ সাল, অষ্টম ক্রুসেড ঃ ১২৭০ সাল এবং নবম ক্রুসেডঃ ১২৯১ সাল।

দু'শ বছর ধরে চলমান এই ক্রুসেডগুলোকে ঐতিহাসিকগণ প্রধানত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায় ১০৯৬ সাল থেকে আরম্ভ করে ১১৪৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে প্রথম ক্রুসেডটি; দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রুসেড নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়টি ১১৪৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ১১৯৩ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত; এবং বাদবাকি ক্রুসেডগুলোকে নিয়ে তৃতীয় পর্যায়টির বিস্তৃতিকাল হচ্ছে ১১৯৩ সাল থেকে ১২৯১ সাল পর্যন্ত।

এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রুসেড আরম্ভ হওয়ার সময়টাতে প্রাচ্যের মুসলিম রাজশক্তি এবং প্রতীচ্যের খৃস্টান রাজশক্তি উভয়ের অবস্থাই ছিল নড়বড়ে। বাগদাদ-ভিত্তিক কেন্দ্রিক কেন্দ্রীয় খেলাফত বহু আগে থেকে তখন পর্যন্ত খুবই দুর্বল। তার বিপরীতে স্পেনে প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া খেলাফত ১০৩১ খৃস্টাব্দে শুধুমাত্র বিলুপ্তই হয়নি, স্পেন থেকে মুসলমানদের অস্তিত্বের অবসানও ঘটেছে এবং মিশরে প্রতিষ্ঠিত ফাতেমীয় খেলাফতও মোটেই সবল ছিল না। বাগদাদের আব্বাসী খেলাফতের মান-মর্যাদা তখন যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রেখেছে সেলজুক বংশের সুলতানেরা। ওদিকে প্রতীচ্যে খৃস্টানদের কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বলতে তেমন কোন প্রকৃত শক্তির অস্তিত্ব ছিল না। ছিল সামন্ত প্রথাভিত্তিক বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আত্মঘাতী কলহবিবাদ। বাইজানটাইন সম্রাট তখন আলেকসিয়াস কমনেনাস; কিন্তু তিনিও সেলজুকদের ভয়ে আতঙ্কিত। এমনি অবস্থায়ই সম্রাট কমনেনাস কর্তৃক সাম্রাজ্য রক্ষার্থে পোপের কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং তদনুযায়ী রোমের মহামান্য পোপ দ্বিতীয় আরবানের অগ্নিবর্ষী আবেগময়ী আহবানে আরম্ভ হয়ে গেল ক্রুসেড। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি নয়, কেন্দ্রীয় ধর্মীয় শক্তি হিসেবে খৃস্টান প্রতীচ্যে তখন পোপ সকলের কাছেই মহামান্য। ১০৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর পোপ বক্তৃতা দিতে গিয়ে, "In moving words the Pope called upon both rich and poor to help their Christian brothers in the East. In this way peace

might be restored to Christendom; there would be an end to fratricidal wars in Europe, to the opperession of windows and orphans and to the threats made against churches. and abbeys by a rapacious nobility. In denouncing what was, in effect a state of civil war, the Pope explained it in terms of the widespread poverty and malnutrition which resulted from inadequate cultivation of the soil. হৃদয়স্পর্শী শব্দমালায় পোপ পূর্বাঞ্চলীয় (ইউরোপের) খৃস্টান ভ্রাতৃবর্গকে সাহায্য করবার জন্য ধনী দরিদ্র উভয় শ্রেণীকে আহবান জানালেন। বললেন, এভাবেই খৃস্টান জগতে পুনঃস্থাপিত হবে শান্তি; অবসান হবে ইউরোপের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের, অবসান হবে বিধবা ও অনাথদের দুর্দশার এবং দূরীভূত হবে পরস্বাপহারী লোভাতুর অভিজাতদের দ্বারা চার্চ ও মঠসমূহের উপর আঘাতাক্রমণ। বস্তুত, গৃহযুদ্ধের একটা পরিস্থিতির অবসান কামনা করে পোপ বিদ্যমান অবস্থাটাকে অপরিমিত চাষক্রমজাত বহুবিস্তৃত দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দ্বারা ব্যাখ্যায়িত করলেন"। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০)।

এসব থেকেই প্রতীচ্যের অবস্থাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শক্তির ক্ষেত্রে প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের পার্থক্যটা শুধু এই-ই ছিল যে প্রাচ্যের মুসলিম উম্মায় পোপের মত কোন সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। এমনি অবস্থায়, ঐতিহাসিক গীবনের কথায়, 'খৃস্টান ইউরোপের অর্বাচীন, বর্বর ও অশিক্ষিত লোকেরাই ক্রুসেডে যোগদান করে'। নড়বড়ে মুসলিম রাজশক্তিকে পরাস্ত করার উপরেও মুসলিম নিধনই ছিল ক্রুসেডারদের প্রধানতম লক্ষ্য, যার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের দ্বারা এন্টিয়ক ও জেরুযালেম দখলের পর নির্মম গণহত্যায়।

ক্রুসেডের প্রথম পর্যায়ে ইটালি, ফ্রান্স, জার্মানীর ক্রুসেডারগণ, পিটার ও গডফ্রে, বলডুইন, বোহেমণ্ডের নেতৃত্বে এশিয়া মাইনর দখল করে নেয়। অতঃপর ১০৯৮ সালে দখল করে নেয় এডিসা ও এন্টিয়ক এবং ১০৯৯ সালে জেরুযালেম। এন্টিয়কে খৃস্টান যোদ্ধারা প্রায় দশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে এবং অসংখ্য মানুষের ওপর চালায় অকথ্য অত্যাচার ও দানবীয় নির্যাতন, যাদের অধিকাংশই ছিল অসহায় মুসলিম নারী ও শিশু।

আর জেরুযালেম দখল করার পর? প্রফেসর মেয়ারের কথায়, "The governor and his retinue were the only Muslims to escape alive. The intoxication of victory, religious fanaticism, and the memory of hardships botted up to three years exploded in a horrifying bloodbath in which the crusaders hacked down everyone, irrespective of race or religion, who was unfortunate enough to come with in reach of their swords. They waded, ankledeep in blood, through streets covered with bodies..... The Muslim world was profoundly shocked by this christian barbarity; it was a long time before the memory of this massacre began to fade. গভর্নর ও তাঁর অনুচরবর্গ ছিলেন একমাত্র জীবিত পলাতক মুসলমান। বিজয়ের প্রমত্ততা, ধর্মীয় অন্ধ গোঁড়ামী এবং তিন বছরের অবরুদ্ধ কষ্টের স্মৃতি ফেটে পড়ল ভয়ঙ্কর এক রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে যাতে ক্রুসেডাররা ফালি-ফালি করে কেটে ফেলল ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে যারাই দুর্ভাগ্যক্রমে এসে পড়ল তাদের তরবারির নাগালের মধ্যে। শবদেহে আবৃত রাস্তা দিয়ে পায়ের গোড়ালি সমান রক্তধারা পেরিয়ে অতিকষ্টে

তারা হেঁটে যেতে লাগল। ..... এই খৃস্টান বর্বরতায় গভীরভাবে স্তব্ধবাক হয়ে গেল মুসলিম দুনিয়া, এই হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি মিলিয়ে যেতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল"। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০)। মুসলিম নিধনের কী বর্বর দৃষ্টান্ত।

পুনরুদ্ধারকৃত জেরুযালেমের খৃস্টান শাসনকর্তা রাজা বলডুইন দখল করে নেন জাফা, আক্রা, সিডন ও বৈরুত, ১১০১ সালে। ১১০৯ সালে দখল করেন ত্রিপলি। খৃস্টানদের পুনরধিকৃত এলাকায় নব-বিন্যাসে গঠিত হয় চারটি ল্যাটিন রাষ্ট্রঃ এডিসা, এন্টিয়ক, ত্রিপলি ও জেরুযালেম। প্রথম পর্যায়ের বিজয়ী পক্ষ খৃস্টানেরা। তাদের এই বিজয় গৌরব অম্লান থাকে ১১৪৪ সাল পর্যন্ত।

কিন্তু ১১৪৪ সালেই ঘটনা প্রবাহ বইতে থাকে উল্টা পথে। এডিসা দখল করে নেন সেলজুক নেতা ইমামুদ্দীন জঙ্গী। আরম্ভ হয় ক্রুসেডের দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ের প্রথম থেকেই মুসলমানদের জেহাদ কালের আরম্ভ বলা যেতে পারে। কারণ, প্রথম পর্যায়ের প্রায় ৫০ বছর উন্মুক্ত দানবীয় চরিত্রের খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের কাছে পরাজিত, নির্যাতিত ও অপমানিত মুসলিম শক্তি তখন থেকে আবার জেগে উঠে দৃঢ় হাতে অস্ত্র চালিয়েছে নাসারাদের উপর। এই পর্যায়ের সূচনাকারী ফাতেমীয় খলিফার সাহায্যে এগিয়ে আসা ইমামুদ্দিন জঙ্গী। ইমামুদ্দিন জঙ্গীর আহবানে মুসলিম যোদ্ধারা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। রুখে দাঁড়ায় ইসলামের নামে। আর খৃস্টানদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় তারা আলেপ্পো, হারবান ও মসুল। বাগদাদের খলিফার নিকট থেকে আতাবেগ উপাধি লাভ করেন ইমামুদ্দিন জঙ্গী।

ধর্মযুদ্ধের স্রোত উল্টো বইতে আরম্ভ করেছে দেখে এক ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ইউরোপে। এর মধ্যে ১১৪৬ সালে ইমামুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যু হলে আলেপ্পোর মসনদে উপবিষ্ট হন তদীয় পুত্র নুরুদ্দীন জঙ্গী। ওই সময়টায় এডিসা আবার চলে যায় খৃস্টান অধিকারে। দ্বিতীয় ক্রুসেডের ঘোষণাকারী সেন্ট বার্নার্ডের আবেদনে জার্মানী ও ফ্রান্সের রাজণ্যবর্গ এবং অন্যান্য সামন্ত ও নাইটরা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে। কিন্তু নুরুদ্দীন জঙ্গীর নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়ে যায় খৃস্টান বাহিনী। এডিসা খৃস্টানদের হাত থেকে আবার কেড়ে নেন নুরুদ্দীন জঙ্গী। কেড়ে নেন এ যাবত হারানো অন্যান্য অঞ্চলও। বাকি থাকে শুধু জেরুযালেম।

১১৭৪ সালে নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর মুসলমানদের সপক্ষে ক্রুসেডের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন চিরস্মরণীয় যে বীর মুজাহিদ, তাঁর নাম গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। জঙ্গী বংশের মাধ্যমেই তার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অবস্থান গ্রহণ এবং মিশরের ফাতেমীয় খেলাফতের অবসানে তার সেখানকার স্বাধীন সুলতানরূপে কর্তৃত্ব গ্রহণ। তখন থেকেই মিশরে আবার খুতবা পঠিত হতে থাকে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার নামে। ১১৭৫ সালে বাগদাদের খলিফা সুলতান সালাহউদ্দিনকে ফরমান দান করেন আল মাগরিব, মিশর, লিবিয়া, ফিলিস্তিন, পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্যএশিয়ার অধিপতিরূপে। ফলে, প্রাচ্যের মুসলিম শক্তির প্রধানতম পুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, ইতিহাসে যিনি গাজী সালাহউদ্দিন নামে চির পরিচিত।

ক্রুসেডারদের ধর্মযুদ্ধের দানবীয় স্পৃহাকে ধ্বংস করে দেওয়াই ছিল সুলতান

সালাহউদ্দিনের শ্রেষ্ঠ অবদান। ১১৮৭ সালে হিত্তিনের যুদ্ধে তিনি খৃস্টান বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। সেই যুদ্ধেই বন্দী হয় জেরুযালেমের রাজা গী দ্য লুসিনান এবং মক্কা মদীনাকে ধ্বংস করার অভিলাষী খৃস্টান নেতা রেজিনাল্ড। লুণ্ঠন-বৃত্তির অপরাধে এবং সন্ধিচুক্তি অবমাননার দায়ে এই মহাপাতকী রেজিনাল্ডকে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু সসম্মানে মুক্তি দেয়া হয় রাজা গী দ্য লুসিনানকে। এর পরপরই জেরুযালেম পুনরুদ্ধার করে নেন সুলতান গাজী সালাহউদ্দিন ।

ক্রুসেডের ইতিহাসে গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মুসলিম শক্তির দিক থেকে সর্বোত্তম প্রশংসার দাবিদার এজন্য যে, ক্রুসেডের প্রথম পর্যায়ে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত মুসলিম শক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে সত্যিকার জেহাদে অবতীর্ণ হয় যার সুযোগ্য নেতৃত্বে, তিনি এই গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। তাই তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ জীবন-কাহিনী প্রাথমিক একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

তাইগ্রীস নদীর তীরবর্তী তাকরিত নামক স্থানে তাঁর জন্ম। পিতার নাম নাজমুদ্দীন আইয়ুবী। পিতা ও পিতৃব্য উভয়েই সিরিয়ায় রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। প্রথম জীবনে সালাহউদ্দিন ইউসুফ জ্ঞানার্থী হিসেবেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তারপর ঘটনাচক্রে রাজকীয় কার্যাবলীতে জড়িত হয়ে পড়েন এবং স্বীয় কৃতিত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন নিজ বংশকে। সেই বংশ পরিচিত হয় আইয়ুবী বংশ বলে।

১১৬৭ খৃস্টাব্দে মিশরের অযোগ্য ফাতেমী খলিফা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সিরিয়ার শাসনকর্তা নুরুদ্দীন জঙ্গীর সাহায্য চাইলে সেই সুবাদে সালাউদ্দিন ইউসুফ তার পিতৃব্যের সঙ্গে মিশরের বাহিনীতে এসে যোগ দেন। মিশর থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়নের পর খলিফা সালাহউদ্দিনকে সেনাধ্যক্ষ এবং তাঁর পিতৃব্যকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ক্রুসেডে বিপর্যস্ত মুসলমান তথা ইসলামের অবস্থানকে সুরক্ষিত করার মানসেই জ্ঞানার্থী সালাহউদ্দিন ইউসুফ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে মিশরে এসেছিলেন এবং মিশরে সেনাধ্যক্ষের নিযুক্তি পেয়ে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে পথ পরিক্রমায় অগ্রসর হন।

১১৭৪ খৃস্টাব্দে নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর সিরিয়ার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সেখানকার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন সালাহউদ্দিন ইউসুফ আইয়ুবী। অতঃপর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যথার্থ শক্তির অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যে তিনি ফাতেমী খলিফার পরিবর্তে আব্বাসীয় খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে সিরিয়ার সুলতান বলে ঘোষণা করেন। আব্বাসীয় খলিফাও তাঁকে আল মাগরিব, মিশর, সিরিয়া, লিবিয়া, প্যালেস্টাইন, পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার অধিপতি বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তারপর মুসিল ও মেসোপোটেমিয়াও তার অধিকারে এসে যায়। ক্রুসেডারদের অধিকারে থেকে যায় জেরুযালেমসহ এই বিশাল এলাকার আরও আরও স্থান। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এসব ক্রুসেডারদের মুকাবিলায় অগ্রসর হন। ১১৮৭ খৃস্টাব্দে হিত্তিনের প্রান্তরে বিধ্বস্ত করে দেন ক্রুসেডার ফ্রাঙ্ক বাহিনীকে। বন্দী হন প্যালেস্টাইন রাজ গী দ্য লুসিনান ও পাদরী নেতা রেজিনাল্ড। কিন্তু বিজয়ী সালাহউদ্দীন মুক্তি দেন রাজা গী দ্য লুসিনানকে, কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন পবিত্র মক্কা মদিনা ধ্বংসের ঘোষণাকারী চরম অত্যাচারী রেজিনাল্ডকে। তারপর অগ্রসর হন জেরুযালেম পুনরুদ্ধারে এবং সপ্তাহব্যাপী সফল অবরোধের পর খৃস্টানদের হাত থেকে উদ্ধার করেন প্রায় নয় দশক ধরে হারানো জেরুযালেমের ওপর মুসলিম অধিকার।

গাজী রূপে অভিহিত হন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

জেরুযালেমের পতনে খৃস্টান প্রতীচ্যে আরম্ভ হয় তৃতীয় ক্রুসেডের প্রস্তুতি। ইংল্যাণ্ডের রাজা সিংহ-হৃদয় রিচার্ড, জার্মানীর রাজা ফ্রেডারিক এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাষ্টাসের নেতৃত্বে এগিয়ে আসে এক বিশাল খৃস্টান বাহিনী। অগাষ্টাস ধর্মযোদ্ধাদের টায়ারে একত্রিত করে আক্রার দিকে অগ্রসর হন, আর রিচার্ড জেরুযালেম অবরোধ করেন। কিন্তু খৃস্টানদের পক্ষে জেরুযালেম দখল করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় ১১৯২ সালে রিচার্ড একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে স্বদেশে ফিরে যান।

এখানে উল্লেখ্য যে, খৃস্টান বাহিনী প্রতিটি বিজয়ের পর যে গণহত্যা সম্পন্ন করে আসছিল, মুসলিম বাহিনীর বিজয়ে কোথাও তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়নি। ১১৯২ সালে রিচার্ড সালাহউদ্দিনের মধ্যেকার চুক্তি অনুসারে অ-মুসলিম খৃষ্টান ইহুদী তীর্থযাত্রীরা মুসলিম অধিকৃত জেরুযালেমে তাদের ধর্মীয় স্থানগুলো পরিদর্শনের অবাধ স্বাধীনতা লাভ করে। সুলতান সালাহউদ্দিন গাজীর মৃত্যু হয় ১১৯৩ সালে। এভাবে সমাপ্ত হয় ক্রুসেডের দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে বিজয়ী পক্ষ ছিল মুসলমানেরা।

১১৯৩ সাল থেকে আরম্ভ করে ১২৯১ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ক্রুসেডের যে তৃতীয় পর্যায়, তাতে জয়-পরাজয় দু'পক্ষেরই ভাগ্যে জোটে, কিন্তু এ পর্যায়ে ক্রুসেডের তীব্রতা যায় কমে। তাছাড়া খৃস্টান ও মুসলমান এই দুই পক্ষ ছাড়াও প্রায় শতবর্ষের এই তৃতীয় পর্যায়ে অন্যান্য ঘটনাক্রমও এতে সংযোজিত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রিচার্ড সালাহউদ্দিনের শান্তিচুক্তি অনুসারে খৃস্টানেরা জেরুযালেমের মূল রাজধানী হারিয়ে আক্রায় স্থাপন করে তাদের রাজধানী। এই তৃতীয় পর্যায়ের যে ক্রুসেড ও জেহাদ তার রূপরেখা হচ্ছে-গাজী সালাহউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১১৯৫ খৃস্টাব্দে রোমের পোপ তৃতীয় সেলেস্টাইন চতুর্থ ক্রুসেড আরম্ভ করেন। ক্রুসেডাররা সিসিলি দখল করে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হলে গাজী সালাহউদ্দিনের পুত্র আদিল তাদের গতিরোধ করেন। ১১৯৮ খৃস্টাব্দে তারা সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ৩ বছর পর পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে পঞ্চম ক্রুসেড ঘোষণা করেন তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ড ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য রাজপরিবারের সদস্যগণ। কিন্তু সিরিয়া থেকে যায় মুসলমানদের অধিকারেই। ১২১৬ খৃস্টাব্দে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট সূচনা করেন যে ষষ্ঠ ক্রুসেড, তাতে দুই লক্ষাধিক খৃস্টান ধর্মযোদ্ধা সিরিয়ার পথে অগ্রসর হয়। সেই সূত্রে খৃস্টান ধর্মযোদ্ধারা মিশর ও ডালমেটিয়া গমন করে প্রায় ৭০,০০০ মানব সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এরপরেও তারা পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়ে ১২২১ খৃষ্টাব্দে মুসলিম মুজাহিদদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সপ্তম ক্রুসেড শুরু হয় ১২৩৮ খৃস্টাব্দে। রোমের মহামান্য পোপ সপ্তম গ্রেগরীর প্ররোচনায়। এখানে মুসলিম নেতৃত্ব সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে।

এদিকে গাজী সালাহউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার বিশাল সাম্রাজ্য তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং যথারীতি আরম্ভ হয় গৃহযুদ্ধ। তারই সুযোগে গাজী সালাহউদ্দিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মালিক আদিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সিরিয়া, মিশর ও ইরাকে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তার মৃত্যুর পর মসনদে আরোহণ করেন তদীয় পুত্র আল কামিল। এই আল কামিলই সপ্তম ক্রুসেডকালে জেরুযালেম ছেড়ে দেয়

খৃস্টানদের হাতে। খৃস্টানরা ১২৪৪ সাল পর্যন্ত রক্ষা করে চলে জেরুযালেমের অধিকার। কিন্তু আল কামিলের পৌত্র আস সালিহ খাওয়ারিযমের তুর্কীদের সাহায্যে ১২৪৪ সালে অষ্টম ক্রুসেডে খৃস্টানদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেন জেরুযালেম। তারপরও চলতে থাকে ক্রুসেড ও জেহাদ। অবশেষে নবম ও শেষ ক্রুসেডে ১২৯১ সালের মধ্যে মুসলিম বাহিনী আক্রাসহ সকল খৃস্টান অধিকৃত সকল রাজ্যই দখল করে নেয়। এভাবে আপাত সমাপ্ত হয় খৃস্টানদের পরিচালিত ক্রুসেড।

খৃস্টান প্রতীচ্য যখন ক্রুসেড আরম্ভ করে, তখন তার অবস্থা এমন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল যে তার থেকে কোনরকমে বাঁচার জন্য ক্রুসেড জাতীয় কোন কার্যক্রমের আশ্রয় নেওয়া ছিল অপরিহার্য। জার্মান প্রফেসর মেয়ারের কথায় " Indeed on the eve of the Crusades Europe was caught up in fierce internecine struggles. প্রকৃতপক্ষে ক্রুসেডের পূর্বক্ষণে পারস্পরিক প্রচণ্ড ধ্বংসকারী সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ। (The Crusades, H. E. Mayer, 1972. p.2) ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত তখন সামন্ত প্রথা। খৃস্টীয় যাজকতন্ত্রও সেই সামন্ততন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। শিক্ষাবিহীন কলুষিত সামন্ত প্রথার প্রচলনে ইউরোপে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান তখন চরম অরাজকতা। সামন্তদের বিপথগামী স্বেচ্ছাচারী সন্তানেরা পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে নিয়োজিত। তদুপরি, প্রতীচ্যেরই পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ছিল আভিজাত্যজনিত পার্থক্যবোধ এবং অন্তর্বিরোধ। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অজ্ঞানতাজাত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের অতলে নিমজ্জিত ক্রুসেডকালীন প্রতীচ্যের অন্তর্বিরোধের কথা প্রসঙ্গে প্রফেসর মেয়ারের মন্তব্যঃ "The cultural differences between the Greek speaking East and the Latin West too great for the unity of Christendom to survive for long. খৃস্টবাদের একতা বেশিদিন ধরে টিকিয়ে রাখার জন্য গ্রীকভাষী পূর্বাঞ্চল ও ল্যাটিন পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক পার্থক্য ছিল অনেক বেশি"। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩)

মুসলিম শক্তি প্রতীচ্যের প্রান্তভাগে রাষ্ট্রীয় এবং বাণিজ্যিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় ইউরোপ তথা প্রতীচ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সেখানে এমন কোন প্রবল রাজশক্তিও আর বিদ্যমান ছিল না যা প্রতীচ্যকে, বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউরোপকে, কোন এক পরিকল্পিত লক্ষ্যের পানে পরিচালিত করতে পারত। ধর্মীয়ভাবে খৃস্টীয় যাজক শক্তিই তখন সাধারণভাবে গৃহীত একমাত্র শক্তি। তাই প্রতীচ্যের 'মহামান্য' পোপই সকল অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে খৃস্টান জগতকে বাঁচাবার তাকিদে ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের ডাক দিলেন। তাতে যোগ দিল, ঐতিহাসিকদের মতে, ইউরোপের পাপাচারী বর্বর অশিক্ষিত ও স্বর্গলাভেচ্ছু লোকেরা। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন ঃ "ক্রুসেড ছিল মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে খৃস্টান প্রতীচ্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। নিজেদের সকল দুর্দশা, সর্বপ্রকার অধঃপতনের জন্য দায়ী করা হল মুসলিম শক্তিকে। ক্রুসেড চলল বহুদিন ধরে; বহুদিন ধরে চলল কাউন্টার ক্রুসেড বা জেহাদ। পোপের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। নানা চড়াই-উৎরাইর মধ্যদিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হল প্রাচ্যের মুসলিম শক্তিই।

এসব ক্রুসেড কাউন্টার-ক্রুসেডের ফলাফল হল বিভিন্নমুখী এবং ফলাফল বিচারে

দেখা যায় যে পরিণামে অযোগ্যতা-পীড়িত শেষ বিজয়ীদের চাইতে বিজিতদের লাভই হয়েছে বেশি। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপের নির্দেশে সংঘটিত ধর্মযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত যাজক শ্রেণীর কলঙ্কময় ইতিহাসে পরিণত হয়। মানুষের জ্ঞানোন্মোষের আলোতেই যাজক শ্রেণীর পরিচয় অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করে। ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারীরা মুসলিম প্রাচ্যের উন্নততর সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং উদ্বুদ্ধ হয় উন্নততর জীবন ধারা লাভের আশায়। ক্রুসেডের ফলেই প্রাচ্য সম্পর্কে প্রতীচ্য লাভ করে চাক্ষুস সম্যক উচ্চতর জ্ঞান এবং কালক্রমে প্রাচ্যে তাদের ধর্ম প্রচারের ও বাণিজ্যের প্রসারতার পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

ক্রুসেডের ফলে ইউরোপবাসী মুসলমানদের নিকট থেকে লাভ করে মেরিনার্স কম্পাসের ব্যবহার, সুগন্ধি দ্রব্য-মসলাদি, উন্নতমানের কৃষিপদ্ধতি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। স্বদেশে ফিরে গিয়ে তারা প্রাচ্য দেশীয় সম্পদের চাহিদা সৃষ্টিতে অবদান রাখে। হিট্টি বলেন ঃ "প্রাচ্যে অপেক্ষা প্রতীচ্যের জন্য ক্রুসেড ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ"। খৃস্টানদের ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্যে-প্রতীচ্যের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার অনেক উপকরণের অনুপ্রবেশ"। ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেন ঃ "ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্ম লাভ করেছে"।

সুদীর্ঘ ক্রুসেডকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীচ্যবাসী নিজেদের অভাবগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হল। সঙ্গে সঙ্গে সেসব অভাব দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করল তারা। এই অনুভবই তাদেরকে জাগিয়ে তুলল অশিক্ষা-অজ্ঞানতা-অন্ধ বিশ্বাসের অতল থেকে। যা তাদের নেই, তা-ই অর্জন করার দুর্জয় বাসনা জেগে উঠল তাদের মনে। ক্রুসেডে ব্যর্থকাম প্রতীচ্য এবার প্রাচ্য বাণিজ্যের নতুন পথ আবিস্কারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে কি করে প্রাচ্যের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের, উপকূলীয় অঞ্চলে পৌছানো যায়, তা-ই হয়ে উঠল তাদের রাত-দিনের চিন্তা। " The adventurous spirit of the cross-bearers Ultimately brought forth the age of exploration and discovery. ক্রুসেডারদের দুঃসাহসী স্বভাবই শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধানী ও আবিস্কার যুগের জন্ম দেয়"। (Crusade, Commerce and Culture, Aziz S. Atiya ; Oxford University Press, 1962 P.127)।

ক্রুসেডের তৃতীয় পর্যায়ে মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে প্রতীচ্যের খৃস্টান শক্তি দুর্দান্ত মোঙ্গল বাহিনীকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মোঙ্গল অধিপতি খৃস্টানদের এসব চালাকিতে ধরা দিতে চাননি। যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তাই বলতে হয়, শেষ পর্যন্ত অন্য শক্তির সাহায্যে মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করার আশা আর থাকল না খৃস্টানদের। থাকল শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জিভূত আক্রোশ। তাদের খুনে-বাসনার জোয়ারে এল ভাটার টান। কিন্তু ততদিনে যে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সঞ্চারিত হয়েছে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদের নবতর গতি। প্রফেসর আতিয়ার কথা, "On close investigation the Counter-Crusade is revealed as a perfect counterfoil and an equal peer to the Crusade , with only one major difference that the later left its permanent impression on the Course of history, whereas the former culminated in irrevocable

bankruptcy. সযত্ন নিরীক্ষায় কাউন্টার-ক্রুসেড (জেহাদ) ক্রুসেডের সমুচিত ও সমকক্ষ জবাব হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে, দুয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য একটাই এবং তা হচ্ছে এই যে, পরবর্তীতে (অর্থাৎ কাউন্টার-ক্রুসেড) ইতিহাসের গতিপথে রেখে গেছে তার স্থায়ী প্রভাব, অথচ প্রথমটির (অর্থাৎ ক্রুসেডের) পরিণতি ঘটেছে অপরিবর্তণীয় দেউলিয়াত্বে"। (Crusade. Commerce and Culture, Aziz S Atiya, Oxford University Press, 1962, P.130)

ক্রুসেডের শেষ ঘটনা ছিল ১২৯১ সালে খৃস্টান অধিকৃত আক্রার পতন। ১১৮৭ সালে মুসলিমরা পুনরুদ্ধার করেছিল জেরুযালেম, আর তার প্রায় একশ' বছর পর মুসলিম মুজাহিদরা আবার দখল করে নিল খৃস্টানদের জেরুযালেম-স্বপ্নের শেষ মনযিল আক্রা। "When an Italian, Martoni, visited Cyprus in 1934 he noticed that when the noble ladies went out of doors they wore long black garments which revealed only their eyes. When he asked for an explanation of this custom, he was told that it was a token of mourning for the loss of the city of Acre in 1291.. মার্টনি নামে এক ইটালিবাসী ১৩৯৪ সালে যখন সাইপ্রাস পরিদর্শনে যান, তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে অভিজাত বংশীয় মহিলারা ঘরের বাইরে যাবার কালে কালো লম্বা পোশাকে এমনভাবে আবৃত থাকেন যাতে তাদের চোখ দু'টি মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এই রীতির ব্যাখ্যা চাওয়াতে তাকে বলা হয় যে, ১২৯১ সালে আক্রানগরী হারানোর শোক-প্রতীক হিসাবেই এর প্রচলন"। (The Crusades. Hans eberhard Mayer, Oxford University Press 1972, p-274)। জেরুযালেম ও আক্রা হারিয়ে ব্যর্থ খৃস্টান-স্বপ্ন নৈরাশ্যের অন্ধকারে তলিয়ে গেল। অভিজাত পরিবারের খৃস্টান রমণীদের দেহ ও মুখাবয়ব কালো লম্বা পোশাকে আবৃত রেখে এই বেদনা ও নৈরাশ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দিত সমগ্র খৃস্টান সমাজকে। খৃস্টান সমাজ কোন দিন ভুলতে পারে নি জেরুযালেমকে।

১২৯১ সালে আক্রা পুনরুদ্ধার করেছিলেন মিশরের মামলুক সুলতান আল-আশরাফ খলীল। খৃস্টানদের দখলীকৃত জনপদসমূহ পুনরুদ্ধার করে যুদ্ধংদেহী মামলুক বীরবৃন্দ হানা দেন পার্শ্ববর্তী এশীয় ও লেভান্টীয় খৃস্টান অধিকৃত রাজ্যসমূহে এবং তা দখলও করে নেন। ১৩৬৫ সালের পর থেকে মিশরীয় মামলুক সুলতানগণ গড়ে তুলতে আরম্ভ করেন এক শক্তিশালী নৌ-বাহিনী। খৃস্টানগণ তখন দীর্ঘ সময় ধরে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনি পরিস্থিতিতে কিছুকাল পর ঝিমিয়ে পড়া মিশরীয় শক্তির স্থান দখল করে কাউন্টার-ক্রুসেড বা জেহাদের পথে দৃঢ়পায় এগিয়ে আসা নবোত্থিত অটোম্যান তুর্কী শক্তি। বাইজানটাইন শক্তির শেষ দুর্গ ধসে পড়ে তুর্কীদের প্রবল হুঙ্কারে। ১৪৫৩ সালের ২৯শে মে তুর্কীরা দখল করে নেয় হাজার বছরের বাইজানটাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। দুর্নিবার এক নৌশক্তিরূপে গড়ে উঠেছে তখন তুর্কীদের দুরন্ত বাহিনী। ইউরোপের এক অংশবিশেষ তাদের শক্তি হয়ে উঠেছে ইউরোপীয় খৃস্টানদের জন্য এক ত্রাসের কারণ। সুলতান সুলায়মান তখন প্রতীচ্যের সামুদ্রিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মাথা গলাতে আরম্ভ করেছেন। শুধু প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও অন্যতম শক্তি তখন তুরস্ক।

দখল-বেদখলের পর আক্রাসহ জেরুযালেম বা বায়তুল মুকাদ্দাস ১২৯১ সালের মধ্যে মুসলিম নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। পোপ ঘোষিত ক্রুসেডের ইতি হয় তখনই। কিন্তু

তারপরেও নবতর রূপে চলতে থাকে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের যে যুদ্ধ, তাকে ক্রুসেডই তো বলা যায়। কেউ কেউ সেগুলোকে 'পরবর্তী ক্রুসেড' বলে অভিহিত করে থাকেন। এ সংজ্ঞাটা সঠিক বলে মেনে নিলে বলতে হয়- চৌদ্দ শতকটি এই 'পরবর্তী ক্রুসেডের' ডামাডোলে ছিল বেশ হতচকিত। তখন মুসলিম শক্তির ধারক হয়েছে তুরস্ক। পনের শতকও ক্রুসেডবিহীন ছিল না। তবে এই পনের শতকে ক্রুসেড তার প্রকৃত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং এক 'পরিত্যক্ত' বিষয়ে পরিণত হয়।

১৩৯৬ সালে সংঘটিত নাইকোপোলিসের যুদ্ধই 'পরবর্তী ক্রুসেডের' শেষ যুদ্ধ। উদীয়মান তুর্কী শক্তির বিরুদ্ধে, বলতে কি তুর্কী শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করতেই ইউরোপীয় খৃস্টান শক্তি এগিয়ে এসেছিল। নাইকোপোলিসের যুদ্ধে উভয়পক্ষে এক লাখ করে সৈন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিল। ইউরোপের সকল রাজ্যই অংশগ্রহণ করেছিল এই যুদ্ধে। অন্যদিকে তুরস্ক সুলতান প্রথম বায়েজিদের নেতৃত্বে ছিল লাখো সৈন্যের এক তুর্কী বাহিনী। খৃস্টানদের যুদ্ধ-কাউন্সিলের পরামর্শ সভায় হাঙ্গেরীয় রাজা Sigismund এর উপদেশ ছিল যুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণের জন্য। কিন্তু সভায় সে উপদেশ কোন পাত্তা পায় নি। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র তুর্কী সাম্রাজ্য দখল করে পারশ্য সাম্রাজ্যসহ 'পবিত্র ভূমি' করায়ত্ত করে নেওয়া। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এই ক্রুসেডে এসেছিল। সুতরাং প্রতিরক্ষামূলক কৌশল তারা গ্রহণ করতে যাবেন কেন?

যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রথমদিকে প্রতীচ্য বীরবীক্রমে শত্রু নিপাত করে এগোতে লাগল। আর পালাতে আরম্ভ করল তুরস্ক বাহিনীর সৈন্যরা এবং পালাতে লাগল পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে। তাদের পেছনে ধাবমান রক্তপিপাসু ক্রুসেডারগণ। কিন্তু পাহাড়ী অঞ্চলে তুরস্ক বাহিনীকে ধাওয়া করতে গিয়ে তাদের দম শেষ হয়ে আসতে লাগল। তবু বিজয়ের শেষক্ষণে তারা এগিয়েই যেতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ তারা থমকে দাঁড়াল।

পাহাড়ী অঞ্চলে তাদের সামনে মুক্ত অস্ত্র হাতে অবস্থান গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে সুলতান বাহিনীর একাংশ, চল্লিশ হাজার যোদ্ধার এক দুর্জয় বাহিনী। এতক্ষণের যুদ্ধে তারা অংশগ্রহণ করেনি। সম্পূর্ণ সতেজ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এক মুজাহিদ বাহিনী। মুহূর্তে দিক পরিবর্তন হল খৃস্টান বাহিনীর। কিন্তু যাবে আর কোথায়? মুহূর্তে পরিবর্তিত হল রণাঙ্গনের দৃশ্যপট। ধাবমানকারীরা হল পশ্চাদ্ধাবিত। ক্রুসেডারদের দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল নাইকোপোলিসের রণাঙ্গন। পুরাপুরি বিধ্বস্ত হল প্রতীচ্যের খৃস্টান বাহিনী। "The news of the catastrophe overwhelmed Europe with deep sorrow and dismay; and the grim fate of the chivalry of the West at Nicopolis marked the end of one chapter and the beginning of another in the relation between the East and the West. The prospect for the crusade became dimmer every day, and the Turks had to be accepted as a member of the European Common wealth of Nations despite his race and religion. এই বিপর্যয়ের খবর ইউরোপকে গভীর দুঃখ ও আতঙ্কে আচ্ছন্ন করে দিল; এবং নাইকোপোলিসে প্রতীচ্য শৌর্যের এই কঠোর করুণ ভাগ্যবরণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্পর্কে সূচনা করল একটি যুগের অবসান এবং অন্য এক যুগের আরম্ভ। ক্রুসেডের আশা ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল প্রতিদিন এবং জাতি-ধর্মের ভিন্নতা সত্ত্বেও তুর্কীদেরকে গ্রহণ করে নিতে হল ইউরোপীয়

জাতিপুঞ্জের এক সদস্য হিসাবে। (Crusade, Commerce and Culture, Aziz S. Atiya, Oxford University Press, 1962. p. 110)

তুর্কী সাম্রাজ্য অতঃপর বিস্তৃত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে। আদ্রিয়ানাপোলের পর বাইজানটিয়ামে স্থাপিত হয়েছে তুর্কী মুসলিমদের রাজধানী এবং ১৪৫৩ সালের পর কনস্টান্টাইনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তুরস্ক সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ ও তার বংশধরেরা। মোরিয়া ও আর্কিপেলেগোসহ আশেপাশের ল্যাটিন পকেটগুলো অন্তর্ভুক্ত হল তুর্কী সাম্রাজ্যে। তারপর তার বিজয় অভিযান পরিচালিত হল পূর্ব মধ্য ইউরোপের পথে। ভিয়েনার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত এসে গেল তাদের অধিকারের সীমানা। "At last, when Egupt and the Holy land were subjugated by the Ottomans in the early years of the sixteenth century, their fate was henceforth bound up with that of a rising pan-Islamic realm whose ruler was simultaneously both Sultan and Caliph. অবশেষে, ষোল শতকের প্রথম বছরগুলোতে তুর্কীদের দ্বারা মিশর ও পবিত্র ভূমি যখন অধিকৃত হয়ে গেল তখন থেকেই তাদের (তুর্কীদের) ভাগ্য স্থিরীকৃত হয়ে গেল উদীয়মান প্যান-ইসলামিক রাজ্যের সঙ্গে যার শাসক হয়ে উঠলেন একাধারে সুলতান ও খলিফা (প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬১)। এশীয় শক্তিরূপে তুরস্ক তো পরিচিত ছিলই এবার তা পরিচিত হল ইউরোপীয় শক্তি হিসাবেও। দৃশ্যত 'পরবর্তী ক্রুসেডের' সমাপ্তি এখানেই। তুর্কীদের সাম্রাজ্য কথা বিশদভাবে জানতে হলে দেখুন পরিশিষ্ট-খ।

১৪৫৩ সালের ২৯ শে মে তুর্কীরা দখল করে নেয় হাজার বছরের বাইজানটাইন রাজধানী। এবার ক্রুসেডের তৃতীয় পর্যায়কালে অন্যান্য জাতির এই খৃস্টান-মুসলিম সংঘাতে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আলোকপাত করা যেতে পারে। ১২৫০ সালে আইয়ুবী বংশের শেষ সুলতান তুরান শাহকে পরাজিত ও নিহত করে মামলুকগণ ক্ষমতা দখল করে। ওদিকে পারশ্যের সেলজুকদের ধ্বংসের উপর বারো শতকের শেষদিকে গড়ে ওঠে খাওয়ারিযম সাম্রাজ্য। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামী প্রাচ্যের এই মুসলিম শক্তিটি মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের বাহিনীর কাছে পর্যুদস্ত হয়ে পশ্চিম দিকে আর্মেনিয়া-আজারবাইজানে এসে কোনরকম টিকে থাকে।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে মোঙ্গল শক্তির প্রকৃতি ও পরিচয় সম্পর্কে একটা সাধারণ বিবরণী পরবর্তী ঘটনাবলীর অনুধাবনে সাহায্য করবে। মোঙ্গলরা ছিল কয়েক গোত্রে বিভক্ত এক যাযাবর জাতি। তুর্কীদের মতই বৈকাল হ্রদ ও আলতাই পর্বতমালার মধ্যবর্তী অনুর্বর স্তেপ অঞ্চলই ছিল তাদের উৎপত্তিস্থল। সে অঞ্চল থেকে ক্রমে তারা ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ দিকে। তারপর খিতাই সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তর-চীনে সরে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে লিয়াও রাজ্য। আনুমানিক ১২২৫ সালে লিয়াও রাজ্যের অবসানে খিতাইরা আরও পশ্চিমে সরে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে কারখিতাই রাজ্য। এরাও ছিল মোঙ্গল। অতঃপর কিছুদিন মোঙ্গলদের মধ্যে চলতে থাকে হানাহানি। এর আগে ১২০০ সালের পরপরই আরম্ভ হল মোঙ্গলদের উল্কাগতি উত্থান। এক দশকের মধ্যে তাদেরই এক গোত্র-নেতা নিজেকে মোঙ্গলদের প্রভু বলে ঘোষণা করে। নাম তার তেমুজিন। ১২০৬ সালে ডাকা হল এক মোঙ্গল সমাবেশ। অনেক মোঙ্গল গোত্রই তাতে উপস্থিত। সেই সমাবেশে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলরা তেমুজিনকে বরণ করে নিল তাদের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে। ঘোষণা করা হলঃ মোঙ্গল প্রভুত্বের অধীনে একীভূত করা হবে সমগ্র 'পৃথিবীকে'। আসমানে উদিত যেমন একক সূর্য, যমীনে

তেমনি একক প্রভু চেঙ্গিস খান।

তেজুমিনের উপাধি তখন চেঙ্গিস খান। কয়েক বছরের মধ্যে গড়ে উঠল মোঙ্গলদের এক সাম্রাজ্য। 'ইয়াসা' নামক বিধান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হল মোঙ্গলদের পালনীয় রীতিনীতি, প্রথা-প্রশাসনের নিয়ম-কানুন। সুসংগঠিত হল এক বিরাট দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী। দানবিক মত্ততায় চলল তার দুরন্তগতি অভিযান। রাজ্যে রাজ্যে পাঠানো হল চেঙ্গিসের আনুগত্য গ্রহণের বার্তা। তা পালিত না হলে নিশ্চিত ধ্বংস।

১২১১-১২ সালে মোঙ্গল বাহিনীর পদানত হল উত্তর-চীন, ১২১৫ সালে পিকিং। অতঃপর ১২২০ সালে ট্রান্স্-অক্সোনিয়া খোরাসানের খাওয়ারিযম সাম্রাজ্যাংশ। দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিস খানের দুর্ধর্ষ বাহিনী যে কোন রাজ্যের কাছে হয়ে দাঁড়াল এক ভয়ঙ্কর শত্রু। মোঙ্গলদের হাতে কোরিয়ার পতন ঘটল ১২৩১ থেকে ১২৩৪ সালের মধ্যে। ১২৪০ সালে পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়ে ইউক্রেন ও পোল্যাণ্ড গ্রাস করে তারা। ১২৪১ সালে লিগনিজ-এ এক জার্মান বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দিল। ১২৫১ থেকে ১২৫৯ সালের মধ্যে বিজিত হল দক্ষিণ চীন; এবং পরবর্তী দশকে সমগ্র চীন, ক্যাম্বোডিয়া ও টনকিন, এবং পশ্চিম দিকে ইরান ও মেসোপোটেমিয়া তারা দখল করে নিল। অন্যান্য রাজ্যের মত খৃস্টান ইউরোপও এই মোঙ্গলদের ভয়ে ছিল কম্পমান। তবুও মুসলিম শক্তি ধ্বংসে ব্যর্থকাম খৃস্টান ইউরোপ চাইল ভুলিয়ে ভালিয়ে এই মোঙ্গল শক্তিকেই তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ব্যবহার করতে। তাদের ধারণা অনুযায়ী মোটা মাথার এই মোঙ্গলদের প্ররোচিত করে মুসলিম শক্তি ধ্বংসের কাজে লাগাতে পারলে শত্রু দিয়ে শত্রু ধ্বংস করা হয়ে গেলে মন্দ কি। কিন্তু মোঙ্গলরা কি এ কাজে প্ররোচিত হবে? নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে ধর্মীয় দিক দিয়ে একটা সম্ভাবনা দেখা দিল। মোঙ্গলরা খৃস্টানদের একটি 'পতিত' শাখা নেস্টোরিয়ানদের মতবাদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত ছিল। সেই সামান্য খৃস্টান ভাবধারার রন্ধ্রপথ ধরে এগোলে মোঙ্গল রাজকে (চেঙ্গিস বংশধরকে) খৃস্টানদের প্রতি সহানুভূতিশীল করা যেতেও পারে হয়তো, চাই কি খৃস্টধর্মেও দীক্ষিত করে ফেলা যেতে পারে। তাহলে তখন মুসলিম শক্তি ধ্বংসের কাজে তাদের লাগিয়ে দেওয়াটা হবে অনেক সহজ। তদনুসারে ১২৪৫-৪৭ সালের মধ্যে পোপের প্রেরিত যাজক গিয়ে হাজির হল মহাচীনে মোঙ্গল খানদের দরবারে।

কিন্তু মোঙ্গলদের চিনতে বাকি ছিল খৃস্টান ধর্মগুরুর। সব কথা শুনে এবং বক্তব্যের গূঢ় উদ্দেশ্য অনুধাবন করে মোঙ্গলদের 'গ্রেট খান' প্রথমেই দাবী করে বসলেন মোঙ্গল সম্রাটের কাছে খৃস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপের আনুগত্য ও অধীনতা। দাবী শুনে স্তব্ধবাক ক্রুসেডারদের যাজক দূত। ব্যর্থ হল মোঙ্গল দরবারে প্রেরিত ক্রুসেডারদের মিশন। শুধুমাত্র প্রথম মিশন নয়, ব্যর্থ হয়েছিল ১২৪৯-৫২ সালের দ্বিতীয় এবং ১২৫৩-৫৫ সালের তৃতীয় মিশনও। সব মিশনের কাছে একই দাবী- খৃস্টান জগতের আনুগত্য ও অধীনতা চাই।

তবে হ্যাঁ, মুসলিম শক্তি ধ্বংস করতে এসেছিল মোঙ্গলরা। এক লক্ষ বিশ হাজারের এক দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খান ১২৫৫ সালে পদার্পণ করে বাগদাদে এবং ১২৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চরম নৃশংসতার মধ্য দিয়ে অধিকার করে নেয় বাগদাদ। শুধু বাগদাদ নয়, ১২৫৯ সালে দামেস্ক ও ১২৬০ সালে আলেপ্পো নগরী হালাকু খানের পদানত নয়।

কিন্তু মোঙ্গলদের ওই বিজয়াভিযানেই সম্ভব হয়ে যায় এক আশ্চর্য অসম্ভব। সেই অসম্ভবটা সম্ভব হয়ে গেল মিশরে। সেনাপতি কিতবুকার নেতৃত্বে মোঙ্গল বাহিনী আক্রমণ করে মিশর। কিন্তু ১২৬০ সালের সেপ্টেম্বর গ্যালিলির আইন জালুদে তাদের মোকাবিলা করেন মিশরের মামলুক কুতুব এবং তাঁর সেনাপতি বাইবার্স। ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধের পর হেরে যায় মোঙ্গলরা। জার্মান প্রফেসর মেয়ারের কথায়, " It was one of the decisive moments in history; the legend of the invincibility of the Mongols was destroyed, their expansion to the West towards North Africa was halted for good, the continued existence of Islam was ensured and the Mamluk sezerainty over Syria and Palestine established " তা ছিল ইতিহাসের অন্যতম এক নিষ্পত্তিমূলক সন্ধিক্ষণ; মোঙ্গলদের অপরাজয়েতার উপাখ্যান ভেঙ্গে গেল বরাবরের জন্য, থেমে গেল উত্তর-আফ্রিকার পানে তাদের পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ প্রয়াস, নিশ্চিত হল ইসলামের চলমান অস্তিত্ব এবং সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হল মামলুক সার্বভৌমত্ব"। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬০-৬১)

হালাকু খান ওদিকে ইরানে প্রতিষ্ঠিত করল ইল-খানদের রাজত্ব। ধর্মীয় ব্যাপারে হালাকু খান ও তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা ক্রমে ঝুঁকে পড়ল বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি। কিন্তু ১২৯৪ সালে কুবলাই খানের মৃত্যুর পর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হল বৌদ্ধ ধর্ম এবং ১২৯৫ সালে অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষ করে ইরানের, ইল-খানেরা ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে গেল। ইল-খানদের ইসলাম কবুলের ফলে সবচেয়ে বেশি আঘাত পেল খৃস্টানেরা। ১২৪৫ সাল থেকে খৃস্টানদের মোঙ্গল কাঁটা দিয়ে মুসলিম কাঁটা তুলে ফেলার বাসনা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। প্রফেস্যার মেয়ারের কথায়, "The eastern part of the empire became throughly Buddhist while in 1295 the Il-Khans were converted to Islam--the final blow to all the hopes which, since 1245, the Christians had placed in the Mongols." সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ হয়ে গেল পুরাপুরি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, আর ওই সময়েই ১২৯৫ সালে ইল-খানরাও ধর্মান্তরিত হয়ে গেল ইসলামে। এভাবেই ১২৪৫ সাল থেকে মোঙ্গলদের উপর খৃস্টানদের সকল আশায় এল সর্বশেষ আঘাত"। (প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬১)।

আর বিজয়ী মুসলিম শক্তির অবস্থা? প্রথম পর্যায়ের ক্রুসেডে বিপর্যস্ত হওয়ার পর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিজয়ী হয়েছিল কি কোন 'কেন্দ্রীয় অবিচ্ছিন্ন মুসলিম শক্তি' অথবা সেলজুক, মামলুক, তুর্কী প্রভৃতি বিশেষ ভৌগোলিক জাতীয়তার পরিচয়বাহী পরস্পর বিচ্ছিন্ন মুসলিম শক্তি? তাদেরকে তো চিহ্নিত করা যায় সেলজুক মুসলিম শক্তি, মামলুক মুসলিম শক্তি, তুর্কী মুসলিম শক্তি হিসাবে। পক্ষান্তরে, জার্মান, ইটালি, ফ্রান্স, প্রভৃতি রাজ্য-শক্তিগুলো বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্রুসেডে প্রায় একত্রিত হয়েই অংশগ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং নেতৃত্ব দানের ব্যাপারে তাদের মধ্যে অনৈক্য ছিল না, এমন নয়। কিন্তু সর্বোচ্চ এক ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রেরণাতেই ক্রুসেডাররা যুদ্ধ করেছিল।

কিন্তু এমনি এক সর্বোচ্চ নেতৃত্বের অভাব ছিল মুসলমানদের ক্ষেত্রে। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী বংশীয় রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও ধর্মীয় নেতৃত্ব মসজিদের চার দেয়ালে আবদ্ধ থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রভাবহীন হয়ে পড়ে।

বংশীয় রাজত্বের স্বার্থ ইসলামী আদর্শকে পাশ কাটিয়ে চলতে আরম্ভ করে। 'খলিফা' ও 'খেলাফত' শব্দ দু'টি বাস্তব প্রয়োজনের কারণেই পরিণত হয় পোশাকী পরিভাষায়। রাজতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি অনুসারেই একসময় 'ইসলামী সাম্রাজ্যের' অধিকারী বাগদাদ-ভিত্তিক আব্বাসীয় সার্বভৌমত্বে আঘাত হেনে মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফাতেমীয় খেলাফত' এবং স্পেনে 'উমাইয়া খেলাফত'। ক্রুসেড আরম্ভ হল যখন, তখন ওই তিনটি বিচ্ছিন্ন 'খেলাফতই' অস্তায়মানতার বেদনায় খুবই কাতর। কোথায় কোন রাজ্যে বলির পশুর মত প্রাণ দিল মুসলমান জনগণ, শবদেহে আবৃত কোন নগরীর রাস্তায় জমল গোড়ালি সমান লাল রক্ত, তার খবরে গভীর স্তব্ধবাক হলেও এসবের প্রতিকারকল্পে এগিয়ে যাবার সাধ্য কোন 'খলিফার' নেই তখন। তাছাড়াও ছিল শিয়া-সুন্নী জাতীয় আরও আরও বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা। ধর্মোন্মত্ত খৃস্টান ক্রুসেডাররা চালাচ্ছে নির্মম গণহত্যা, কি আর করা যাবে.... চালাক। এমনি অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে জার্মান প্রফেসার মেয়ার বলেন, " The Islamic East, and even the Caliph himself, was only faintly interested in these quarrels on the further edge of world of Islam. Essentially it was only the Muslims directly affected by the crusades who responded to the Christian challenge" ইসলামী প্রাচ্য, এমন কি খলিফা নিজেও, ইসলামী দুনিয়ার দূর প্রান্তে সংঘটিত এসব ঝগড়া-ফ্যাসাদের ব্যাপারে সামান্যই কৌতুহলী ছিলেন। অপরিহার্য বলে প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত মুসলমানরাই শুধু খৃস্টান চ্যালেঞ্জে সাড়া দিয়েছিল"। (The Crusades, H. E. Mayer, etc. pp. 279-80)। এমনি বিচ্ছিন্নতার মাঝে ডুবে থেকেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুসলিম যোদ্ধাগোষ্ঠী খৃস্টান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে হয়েছে ক্রুসেড-বিজয়ী। কিন্তু বিজয় পরবর্তীকালে তুর্কীদের মত নবজাগ্রত প্রাণোদীপ্ত রাজশক্তিও এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করল না যাতে ইসলামী প্রাচ্যের বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দুর্বল শক্তিকে একক মুসলিম শক্তিতে পরিণত করা যায়, অথবা নতুন দিনে জ্ঞানে-গুণে বিভূষিত হয়ে অগ্রযাত্রাকে অর্থবহ করে তোলা যায়। তাই বিজয়কালেও ইসলামী দুনিয়া হয়ে থাকল যথা পূর্বং তথা পরং। আর বিজিত খৃস্টানেরা তখন অশিক্ষা-অজ্ঞানতা-অন্ধবিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে নবোদ্যমে এগিয়ে চলল সম্মুখ পানে।

প্রসঙ্গ কথা

১৪৯২ সালের জানুয়ারীতে রাজা-রাণী ফার্দিনান্দ-ইসাবেলার বাহিনী স্পেনের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিল মুসলিম অধিকারের শেষ চিহ্নটুকু। যে স্পেনের মুসলিম সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এতদিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপ, যে মুসলিম-স্পেনের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলো থেকে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো, সেই স্পেন থেকে শুধুমাত্র মুসলিম রাজত্বই নয়, সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দানবীয় মত্ততায় সমূলে নিপাত করে দিয়েছিল খৃস্ট ধর্মানুসারীরা।

মুসলিম নিধনকারী রাজা-রাণী ফার্দিনান্দ-ইসাবেলার চোখে সেদিন নব বিজয়ের স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা জেনোয়াবাসী নাবিক ক্রিস্টোফার কলাম্বাসকে দিলেন এক চার্টার ও প্রচুর অর্থ, যার বলে বলীয়ান কলাম্বাস পশ্চিমের সমুদ্রপথে জাহাজ ভাসিয়ে আবিষ্কার করবেন ভারতবর্ষ হয়ে চীনে পৌঁছার জলপথ। কলাম্বাসের সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং তখনকার খৃস্টানরা ইসলাম অনুসারীদের ও অন্যান্য পৌত্তলিকদের কি চোখে দেখত তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওই সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে স্পেনের

'উপকারী' দাতা রাজা-রাণীকে সম্বোধন করে লেখা কলাম্বাসের অভিভাষণ থেকে। "The explorer addressess his royal benefactors in these words : Your Highness, as good Christian and Catholic princes, Devout and propagators of the Christian faith, as well as enemies of the sect of Mahoment and of all idolatries and heresies, conceived the plan of sending me, Christopher Columbus, to this country of the Indies, there to see the princes, the peoples, the territory, their disposition and all things else, and the way in which one might proceed to convert these regions to our holy faith" . আবিষ্কারক তার রাজকীয় দাতাদ্বয়কে এভাবে অভিভাষণ জানানঃ ইয়োর হাইনেস, খৃস্ট বিশ্বাসের সাগ্রহী প্রচারক, সৎ খৃস্টান ও ক্যাথলিক রাজ-ব্যক্তিত্ব হিসাবে এবং তেমনিভাবে মেহোমেট অনুগামীদের ও অন্যান্য সকল পৌত্তলিক-ধর্মবিরোধীদের শত্রু হিসাবে প্রাচ্যের এই দেশটিতে (ভারতবর্ষে) পাঠিয়ে সেখানকার রাজন্যবর্গ, মানুষ, লোকালয়, সেসবের বিন্যাস ও যাবতীয় ব্যাপারে এবং এসব অঞ্চলকে আমাদের পবিত্র বিশ্বাসের আওতায় ধর্মান্তরিত করার উপায় সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য আমাকে, ক্রিষ্টোফার কলাম্বাসকে, পাঠানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন"।

(B. de las Cases : Historia de las India, Madrid 1875-76)

জলপথ আবিষ্কারের বাইরে এই সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য যে খুবই 'মহৎ' ছিল তাতে আর ভ্রান্তি কোথায়! সে উদ্দেশ্য ছিল খুবই স্পষ্ট- প্রাচ্যের ভারতবর্ষে পৌছে তার রাজন্যবর্গকে দেখা, লোকজনের প্রকৃতি ও অন্যান্য রীতিনীতি অনুধাবন করে তাদেরকে পবিত্র খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা। তদুপরি, ইসলাম অনুসারীদের প্রতি ওই সদ্য সভ্যতাপ্রাপ্তদের মনোভাব? তা-ও ওই অভিভাষণে যথেষ্টই স্পষ্ট।

সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করলেন নাবিক কলাম্বাস। কিন্তু ভাগ্যের কি লীলা- ভারতবর্ষ ও দূরপ্রাচ্যে পৌছার জন্য জাহাজ ভাসিয়ে শেষমেষ পৌঁছে গেলেন এক নতুন মহাদেশে। অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ এক বিশাল মহাদেশ আমেরিকায়! অভূতপূর্ব অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার। আর তাতেই খুলে গেল সমগ্র অভাবগ্রস্ত প্রতীচ্য এবং সেই সঙ্গে খৃস্টধর্মানুসারীদের জন্য পরম এক সৌভাগ্যের দ্বার। হাতে পেয়ে গেল তারা স্বপ্নলোকের চাবি। প্রফেস্যর আতিয়ার কথায়, "Indeed it would not be imprudent to argue that the discovery of America was an indirect byproduct of the Crusading movement, a byproduct which was symptomatic of the new orientation in world history. বাস্তবিক, এই যুক্তি প্রদান হঠকারিতা হবে না যে, আমেরিকা আবিষ্কার ছিল ক্রুসেড-আন্দোলনেরই এক পরোক্ষ অবদান, বিশ্ব ইতিহাসের এক নব বিকাশের লক্ষণমূলক অবদান"। (Crusade, Commerce and Culture, Aziz S. Atiya, etc, p. 128) । কলাম্বাসের সমুদ্রযাত্রার অল্প কিছুদিন পরেই পর্তুগালের বাণিজ্যপোত নিয়ে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো ডা গামা এসে পৌঁছল ভারতবর্ষের উপকূলীয় ক্ষুদ্র রাজ্য মালাবারের বিখ্যাত বাণিজ্যবন্দর কালিকটে। সেটা ১৪৯৮ সালে।

"ফিরিঙ্গি-বণিকের বাণিজ্য তরণী কালিকট বন্দরে উপনীত হইবার সময়ে তদ্দেশে নানা জাতি ও নানা ধর্মের নরনারীর বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত ছিল। ..... যে সকল মুসলমান অতি পুরাকাল হইতে মালাবারে বাস করিতেন, তাহারা আরব দেশ হইতে

সমাগত। তাহাদের সাধারণ নাম মোপলা। তাহারা ধর্মান্ধ ছিলেন না। যাহারা মিশর ও পারস্য দেশ হইতে আগম করিয়াছিলেন, তাহারা খৃস্টবিদ্বেষী হইলেও, হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। মালাবারে হিন্দু-মুসলমান তুল্যভাবে বাণিজ্য ব্যাপারে প্রভুত্ব লাভ করিতেন। .... পুরাকাল হইতে কত বিদেশের বণিক আসিয়া বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছে, কেহ কখনও স্বপ্নেও কালিকটের রাজার সহিত কলহ উপস্থিত করে নাই। রাজা এ সকল কারণে রাজ্যরক্ষার্থে বহু সংখ্যক সৈন্য পালন করিতেন না। ..... সুতরাং পর্তুগালের পক্ষে এরূপ অরক্ষিত ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র নরপতিকে বাহুবলে পরাজিত করিবার সম্ভাবনা ছিল। .... গামা ধর্ম্মকলহের সহিত বাণিজ্য কলহ মিশ্রিত করিয়া কালিকটের বন্দরে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিপ্লব উপস্থিত করিয়া কালিকট রাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন"। (ফিরিঙ্গি-বণিক, শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৬১ সন, পৃঃ ৭৮)।

তার পরবর্তী ইতিহাস পর্তুগীজদের দানবীয় চরিত্র প্রকাশের ইতিহাস, বাণিজ্যের নামে পর্তুগীজ জলদস্যুদের লুন্ঠন ও অকথ্য অত্যাচারের ইতিহাস, এতদ্দেশীয় মুসলিম রাজশক্তিকে বার বার বিপন্ন করার ইতিহাস এবং ভারতবর্ষে নির্ণীয়মান মুসলিম স্থলসাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সাগর সাম্রাজ্য স্থাপন প্রয়াসের ইতিহাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষের উপকূলে নবরূপী ক্রুসেডার

প্রতীচ্য জীবনে নবজাগরণের সূচনালগ্নে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রপথের এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রা, কলাম্বাস-ভাস্কো ডা গামাই ছিলেন না তার প্রথম পথিকৃৎ। এ পথের প্রথম পথিকৃৎ ছিলেন পর্তুগাল-রাজকুমারী হেনরী। তার কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখানে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন আছে ওই সময়কার প্রতীচ্য-জীবনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি সম্পর্কে একটা ধারণা লাভের। এ সবের অবহিতির জন্য আমরা এখানে উদ্বৃত করছি স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রোয়র দেওয়া বিবরণীর একাংশ।

"গ্রীসের জ্ঞান-গৌরব ও রোমের রাজশক্তি এক সময়ে ইউরোপকে সমুন্নত করিবার আয়োজন করিলেও, সে আয়োজন সর্ব্বাংশে সফল হয় নাই। প্রধান প্রধান মহানগর ভিন্ন সমগ্র দেশ সে পুরাতন সভ্যতার ফললাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ...... অজ্ঞানতার অন্ধকারে পুর্ব্বশিক্ষা বিলুপ্ত হইয়া গেল। এসিয়ার খৃস্টধর্ম ইউরোপে প্রচারিত হইবামাত্র, তাহার স্বভাবসুন্দর সন্ন্যাসীর সৌম্যমূর্ত্তি পরিবর্তিত হইয়া গেল। ইউরোপ ধর্মান্ধ হইয়া উঠিল। ধর্মাচার্যগণ স্ব স্ব পদমর্যাদা বর্দ্ধিত করিবার আশায়, অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য নানারূপ ধর্মান্ধতার আবরণ সৃষ্টি করিয়া লোকলোচন আচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইসলামের সহিত খৃস্টান সমাজের ধর্মাযুদ্ধ বিঘোষিত হইলে, খৃস্টানের ধর্মান্ধতা অধিকতর কঠোর হইয়া উঠিল।

দুর্দ্দশার দিনের দুর্মতি আসিয়া মানবসমাজের জ্ঞানচক্ষু আবৃত করিয়া দেয়। ইউরোপের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া উঠিল। ..... দিগদর্শন শলাকা আবিষ্কৃত হইলেও, ধর্মান্ধ খৃস্টান নাবিকগণ তাহাকে 'সয়তানের যন্ত্র' মনে করিয়া তাহার ব্যবহার করিতে সম্মত হইত না। কেহ কেহ সে যন্ত্র ব্যবহার করিয়া পোতচালনা করিতে সাহস করিলে, কোনও খৃস্টান নাবিক সেরূপ অর্ণবপোতে পদার্পণ করিয়া তাহার পরকালের সদগতিকে সংকটাপন্ন করিতে সাহসী হইত না"। (ফিরিঙ্গি বণিক, শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৬১ সন, পৃ-৩২-৩৩)। শুধুমাত্র 'শয়তানের যন্ত্র' সম্পর্কেই নয়, কুসংস্কারজাত অজ্ঞতা তাদের আরও আরও ব্যাপারে বিদ্যমান ছিল। ইউরোপীয়দের মনে তখন এই বিশ্বাস বদ্ধমুল যে, পৃথিবী স্থির আছে এবং চন্দ্র সুর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। তখন ইউরোপীদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, বিষুবরেখার অবস্থান স্থলে বেশি উত্তাপে সব পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।

যার অদম্য উৎসাহে, অবিচলিত অধ্যবসায় ও অপরাজিত আত্মত্যাগে সূচিত হয় ভ্রান্ত সংস্কারাদির অবসান, তিনি হলেন পূর্বোক্ত পর্তুগাল-রাজকুমার হেনরী। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুসলিম শক্তি ধ্বংসের মাধ্যমে নিজ জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং খৃস্টধর্মকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া। তিনি উপলব্দি করলেন, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্য পথে মুসলিম আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে খৃস্টান প্রতীচ্যের জন্য নতুন জলপথের আবিষ্কার একান্ত প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই তিনি সেন্ট ভিনসেন্ট নামক স্থানে স্থাপন করলেন এক 'পণ্যাশ্রম' আর তার সঙ্গে নৌ-বিদ্যালয়। অল্পকালের মধ্যেই এই 'পণ্যাশ্রম' ও নৌ-বিদ্যালয় প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই শিক্ষাকেন্দ্রই ক্রমে

হয়ে উঠল প্রতীচ্যের খৃস্টান নাবিকদের একমাত্র প্রশিক্ষণকেন্দ্র। কুসংস্কারমুক্ত দুঃসাহসী নাবিক হয়ে উঠল খৃস্টান নাবিকেরা। রাজকুমার হেনরী হলেন তাদের প্রথম পথিকৃৎ। হেনরীর এই নৌ-বিদ্যালয়ই উন্মুক্ত করে দিয়েছিল খৃস্টান নাবিকদের নব নব আবিষ্কারের পথ। এই নাবিকেরাই আবিষ্কার করে আফ্রিকা প্রান্তের উত্তমাশা অন্তরীপ। সেটা ১৪৮৬ সালের শেষ দিকের ঘটনা। অতঃপর ১৪৯২ সালে কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার এবং ১৪৯৭ সালে ভাস্কো ডা গামার নেতৃত্বে পর্তুগীজদের ভারত অভিমুখে সমুদ্রযাত্রা।

ভাস্কো ডা গামাসহ অভিযাত্রীরা মোটেই সভ্য লোক ছিল না। " At the time of embarkation at Lisbon, selection was impossible. Everyone was enrolled who wished to go---- vagrants, jailbirds, debtors, criminals of every description, wrethes, those incapable, by immoratity and loss of character, of obtaining employment at home---whom Portugal was glad of banish to save the honour of their families. লিসবনে জাহাজারোহণের সময় লোক-নির্বাচন ছিল অসম্ভব। যেতে আগ্রহী, ভবঘুরে জেল-পলাতক, ঋণগ্রস্ত, সবরকমের অপরাধী, দুরাত্মা- যারা নীতিবিগর্হিত ও চরিত্রহীনতার জন্য দেশে চাকরি পাওয়ার জন্য ছিল অযোগ্য, যাদের পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে পর্তুগীল সরকার নির্বাসনে পাঠাতে ছিল উদগ্রীব- তাদের প্রত্যেককে তালিকাভুক্ত করা হল"। (Portuguese Discoveries, Rev. Alex. i. D. D. Orsey, B. D., pp.7-8)। এই ছিল নাবিক-জলদস্যু ভাস্কো ডা গামার সহ-অভিযাত্রীদের পরিচয়।

ভাস্কো ডা গামার মত এহেন খৃস্টান নাবিক আবিষ্কারকদের মুসলিম বৈরিতা সম্পর্কে শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন,"রাজ্যজয়, বাণিজ্য বিস্তার ও ধর্মপ্রচার একত্রে সুসপন্ন করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্রের সন্ধান লাভ করিয়া, ফিরিঙ্গি বণিক তস্করের ন্যায় ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে প্রথম পদক্ষেপ করিলেন....... বণিক ভিন্ন অন্য কেহ কালিকটে উপনীত হইত না। সুতরাং কালিকট রাজ ফিরিঙ্গি বণিককে বণিক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান তাহাতে নিরুদ্বেগ আস্থা স্থাপন করিতে সাহসী হইলেন না। তাহারা ফিরিঙ্গি বণিকদের প্রকৃত স্বভাব অবগত ছিলেন। তাহারা যেমন ভূমধ্যসাগরে ধর্মকলহের সহিত বাণিজ্য কলহ সংযুক্ত করিয়া, মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সে কথা ভারতবাসী মুসলমানদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না।....... ফিরিঙ্গি বণিকও মনে মনে বুঝিলেন মুসলমানকে পরাভূত করিতে না পারিলে ভারত বাণিজ্যে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না। যেখানে হিংসা-দ্বেষ অপরিচিত ছিল, সেখানে হিংসা-দ্বেষঅঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। যেখানে বাণিজ্যে বাহুবলের সম্পর্ক অপরিজ্ঞাত ছিল সেখানে বাহুবলই প্রবল হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। তাহার জন্য রাজা-প্রজা কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। কেবল ফিরিঙ্গি বণিক তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্য তরণী পণ্যভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল"। (ফিরিঙ্গি বণিক, শ্রী অক্ষর কুমার মৈত্রেয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৬১, পৃঃ ৭৭ এবং ৮২-৮৩)। এখানে উল্লেখ্য যে, কালিকট বন্দরে বহুকাল আগে থেকেই বিভিন্ন জাতির বণিকগণ মিলেমিশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। কিন্তু এবার ভাস্কো ডা গামার গোপন অভিলাষ অনেকের কাছেই অব্যক্ত ছিল। এমনি অবস্থায় কালিকট ও মালাবারের অন্যত্র অবস্থিত সেন্ট

টমাস সম্প্রদায়ভুক্ত খৃস্টানরা গোপনে ভাস্কো ডা গামাকে মালাবারের সকল প্রয়োজনীয় তথ্যই সরবরাহ করে। ভাস্কো ডা গামা তাদের কাছ থেকে আরও জানতে পারলেন যে, মালাবারের বিভিন্ন বন্দরের রাজাদের মধ্যে আত্মকলহ বাড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। এসব তথ্য লাভ করে ভাস্কো কালিকট বন্দর ছেড়ে গেলেন। কিন্তু দেশে না গিয়ে অগ্রসর হলেন মালাবারের অন্য বন্দর কোচিনের পথে। তার আগে তিনি এ-ও জেনে গিয়েছিলেন যে, কালিকট-রাজ বিভিন্ন জাতির বণিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহে মুসলিম বণিকদের কোন ক্ষতি করতেই রাজী হবেন না। অথচ কোচিন-রাজের ভাস্কো এমনি প্রতিশ্রুতিই পেয়ে গেলেন। এ প্রতিশ্রুতি লাভ করেই দেশে ফিরে গেলেন ভাস্কো ডা গামা এবং যথারীতি সম্মানিত হলেন স্বদেশে ও সমগ্র ইউরোপে।

তার পরবর্তী ইতিহাস পর্তুগীজদের দানবীয় চরিত্র প্রকাশের ইতিহাস; বাণিজ্যের নামে পর্তুগীজ জলদস্যুদের লুণ্ঠন ও অকথ্য অত্যাচারের ইতিহাস। ১৫০২ সালে ভাস্কো সসৈন্যে ফিরে এলেন কালিকটে। উপকূলে পৌছেই ভাস্কো কালিকট নগরীর প্রাচীরের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করলেন, বন্দরের মুসলমান বণিকদের বাণিজ্য তরীগুলোকে ভস্মীভূত করে ফেললেন। "মালাবারের অন্যান্য বন্দরে উপনীত হইয়া কুঠি সংস্থাপন করিয়া, একটি কুঠিতে গোপনে গোলাবারুদ ও কামান ভুগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন এবং তীর রক্ষার্থে রণতরণী সংস্থাপিত করিয়া, কালিকটের রণতরীসমূহ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাস্কো ডা গামা যেন দুর্দান্ত জলদৈত্যের মত সর্বত্র ধাবিত হইতে লাগিলেন। কালিকটের রণতরণী পরাভূত হইল। কালিকট-রাজ্যের নৌ-সেনা গামার নিকট বন্দীবেশে আনীত হইল। গামা ৮০০ বন্দীর নাসা কর্ন ও হস্তদয় ছেদন করিয়া তাহা উপঢৌকন স্বরূপ কালিকট রাজাকে প্রেরণ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ দূত উপনীত হইবামাত্র গামা তাহার কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া তাহার স্থলে কুকুরের কর্ণ সংযুক্ত করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ দূতকে কালিকট রাজের নিকট প্রেরণ করিলেন।

জনৈক মুসলমান বণিক এই সকল পাশব অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় গামার প্রধান পোতাধ্যক্ষ তাহার পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে করিতে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া তাহার মুখে শুকরের মাংস বাধিয়া দিলেন। এই রূপে দিগ্বিজয় সুসম্পন্ন করিয়া ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫-৯৬)।

বাণিজ্যের নামে ভারতবর্ষীয় উপকূলে এবং অন্যত্র পর্তুগীজদের পাশবিক অত্যাচার কাহিনীর আরও বিবরণ দিয়ে শ্রী মৈত্রেয় লিখেছেন, "মিশরের সুলতানের নিরীহ প্রজাবর্গ মক্কাতীর্থ দর্শন করিয়া, একখানি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলের নিকট আসিয়া, গামার অর্ণবপোতের সহিত এই সকল তীর্থযাত্রীর অর্ণবপোতের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তীর্থযাত্রী বলিয়া কেহ নিস্কৃতি লাভ করিল না। যাহার নিকট যাহা ছিল, হাজিগণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কেবল প্রাণ ভিক্ষা করিল। কিন্তু তাহারা সকলেই যে মুসলমান। গামা মুসলমান তীর্থযাত্রীর কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া তাহাদের অর্ণবপোত লক্ষ্য করিয়া গোলাবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ..... মুসলমান তীর্থযাত্রীবর্গের অর্ণবপোতে যে সকল রমণী ছিলেন, তাহারা শিশু সন্তানগণকে উর্ধ্বে উত্তোলিত করিয়া, গামার দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া, বালক-বালিকার প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; গামা অবিচলিত চিত্তে নারী হত্যায়, শিশু হত্যায় নিবিষ্ট রহিলেন।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯)

ভারত বাণিজ্যের জন্য জলপথ আবিষ্কার করলেন পর্তুগীজ নাবিক দস্যু ভাস্কো ডা গামা। অল্পদিনের মধ্যেই ভারতীয় উপকূলে স্থাপিত হল দুর্গ। অল্পদিনের মধ্যেই ভারতীয় উপকূলে স্থাপিত হল বাণিজ্য কুঠি। অল্পদিনের মধ্যেই সেনাদল সংগ্রহ করে বাহুবলে ভারত-বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করে মালাবারের ভাগ্য-বিধাতা হয়ে উঠল পর্তুগীজ বণিকেরা। মুসলমানরা হারাল ভারত-বাণিজ্যের আধিপত্য। "কালিকট-রাজের আত্মরক্ষা চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। বাণিজ্যবলই কালিকট রাজের একমাত্র বল; সে বল প্রবল পীড়নে চূর্ণ হইয়া গেল। মুসলমান বণিকের পলায়নে কালিকট রাজের পক্ষে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য অস্বীকার করিবার উপায় রহিল না। ... পর্তুগাল রাজ ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গি বণিকের বাহুবল প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হইলেন। এসিয়া সময় থাকিতে জাগিল না, যখন জাগিয়া উঠিল, তখন চাহিয়া দেখিল, এসিয়ার সমুদ্র পথে ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্য তরণী রণতরীতে পরিণত হইয়াছে; তাহার প্রবল পীড়নে এসিয়ার জল স্থল কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬-১০৭)।

তখন পনের শতক শেষ হয়ে ষোল শতক আরম্ভ হয়েছে। মিশরে শেষ মামলুক সুলতান পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। ১৫০৪ সালে তার নৌবাহিনী পর্তুগীজ বাহিনীর কাছে পর্যদুস্ত হয়, কিন্তু ১৫০৮ সালে সুলতানের বাহিনী পর্তুগীজ বাহিনীকে পরাস্ত করে। সেই যুদ্ধে নিহত হয় পর্তুগীজ বাহিনীর অধিনায়ক লরেঞ্জো আলমিদা। পরের বছরই লরেঞ্জোর পিতা ফ্রান্সেসকো আলমিদা পুত্র হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন মিশর-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। এর আগেই ১৫০৫ সালে ফ্রান্সেসকো আলমিদা পর্তুগালের রাজ-প্রতিনিধি হয়ে আসেন ভারতীয় উপকূলস্থ পর্তুগীজ অধিকৃত এলাকায়। এরমধ্যে আরও একজন 'পর্তুগীজ বীর' ভারতীয় বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হন। তার নাম আলবুকার্ক। আলমিদা ও আলবুকার্ক উভয়েই ছিলেন সমভাবে মুসলিমবিদ্বেষী। পার্থক্য ছিল দু'য়ের পরিকল্পনায়। ভারতবর্ষে তখন মুসলিম রাজত্ব সুসংহত হওয়ার পথে। দিল্লীর মসনদে সমাসীন তখন সুলতান সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ সাল); আর এদিকে স্বাধীন বাংলার মসনদে উপবিষ্ট হোসেনশাহী বংশের সুলতান নাসির-উদ-দীন নুসরত শাহ্ (১৫১১-১৫৩১/৩২ সাল)। ওদিকে মধ্যপ্রাচ্যে মিশরের স্থলে তুরস্ক শক্তি উদীয়মান। ক্রুসেডের ব্যর্থতার পর প্রতীচ্যের ক্রুসেড আকাঙ্ক্ষা নতুন রূপ নিয়ে মুসলিম শক্তির অধঃপতনের নতুন স্বপ্নে বিভোর। কার্যক্ষেত্রে দুরাকাঙ্ক্ষী পর্তুগাল মুসলিমদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। এবং ইউরোপ পর্তুগালের বিজয়ে উৎসাহিত ও পরাজয়ে বিমর্ষ হয়ে আসছে। এমনি পরিস্থিতিতে আলমিদার পরিকল্পনা ছিল ভারতবর্ষে স্থলভাগে মুসলিম শক্তির মোকাবিলায় কোন সংঘর্ষে না গিয়ে সমুদ্র জলভাগভিত্তিক প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু পর্তুগাল রাজ ও তার সঙ্গে আলবুকার্কের পরিকল্পনা ছিল জলেস্থলে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। এই ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত মার খায় আলমিদার পরিকল্পনা। সংহার মূর্তিতে ভারতবর্ষের উপকূলে এসে কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন আলবুকার্ক। এই বীর প্রসঙ্গে শ্রী মৈত্রেয়র রচনা থেকে উদ্ধৃতিঃ "এই ফিরিঙ্গি বীরের মুসলমান বিদ্বেষ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি ইতিহাসে তাহার যে সকল প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অল্প নহে। কিন্তু তাহার চরিতাখ্যায়ক যে সকল গুপ্ত সংকল্পের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আরও ভয়ঙ্কর। মিশরের মুসলমান সুলতানকে শিক্ষাদান করিবার জন্য, আলবুকার্ক খাল কাটিয়া নীলনদকে লোহিত সাগরে টানিয়া আনিবার সংকল্প

করিয়াছিলেন। ইহাতে সমগ্র মিশর দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইত। সমগ্র মুসলমান সমাজকে শিক্ষাদান করিবার জন্য মুসলমান ধর্মপ্রবর্ত্তক মুহম্মদের পবিত্র অস্থি সর্ব্বসমক্ষে ভস্মসাৎ করিবার সংকল্প হইয়াছিল।

আলবুকার্কের এই মুসলমান বিদ্বেষ সেকালের সকল ফিরিঙ্গির সাধারণ বিদ্বেষ রূপে প্রচলিত থাকায়, চরিতাখ্যায়কগণ ইহার উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই। তাহারা বরং ইহাকে দৃঢ় চরিত্র বীরপুরুষোচিত চিত্তবল বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আলবুকার্কের হিন্দু বিদ্বেষেরও অভাব ছিল না। হিন্দু মুসলমান একত্র মিলিয়া কালিকট রাজের সহায়তা করিত; কালিকটের বন্দর তাহাদের প্রধান সম্মিলন ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। জলযুদ্ধে হিন্দু মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তি পরাভূত হইয়াছিল। কিন্তু স্থলাবর্ষে হিন্দু মুসলমানদের সমবেত শক্তি অক্ষুন্ন প্রতাপে বর্ত্তমান ছিল। আলবুকার্ক সেই শক্তি চূর্ণ করিবার আশায় রাজ্যলাভার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

১৫১০ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে কালিকট আক্রান্ত হইল। ফিরিঙ্গি বণিক নগরদাহ করিয়া রাজপথ অধিকার করিলেন। তখন হিন্দু মুসলমানগণ রাজপ্রসাদে সমবেত হইয়া প্রবল প্রতাপে ফিরিঙ্গিগণকে আক্রমণ করিলেন। পাচশত ফিরিঙ্গি প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। যাহারা কোনরূপে রক্ষা পাইলেন, তাহারা সে বীর প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া অর্ণবপোতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। তাহারা কোলাম বন্দরের অধিপতির আশ্রয় লাভ করিয়া তথায় একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করিলেন; এবং তন্মধ্যে বসতি স্থাপন করিয়া আপাততঃ আত্মরক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রথম পরাজয়ের অবসাদে আলবুকার্ক আপাততঃ কালিকট পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে রাজধানী সংস্থাপিত করিবার জন্য স্থানান্বেষণে নিযুক্ত হইলেন।

স্থান মিলিল। একজন ভারতীয় জলদস্যু স্থান দেখাইয়া দিল। তাহা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। সেই দ্বীপে দুর্গ নির্মাণ করিয়া আদিল শাহ নামক নরপতি রাজত্ব করিতেন। আলবুকার্ক ১৫১০ খৃস্টাব্দে সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ আক্রমণ করিলেন। হিন্দু মুসলমান ও পারসিক নাগরিকগণ সে আক্রমণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মসমর্পণ করায়, আলবুকার্ক সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আদিল শাহ্ মে মাসে পুনরায় নগর অধিকার করায়, যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ছয় মাসের যুদ্ধে নগর ও দুর্গ প্রাচীর চূর্ণ হইয়া গেল; তখন অনন্যোপায় হইয়া ফিরিঙ্গি বণিক সমুচিত মূল্য প্রদান করিয়া নগর অধিকার করিলেন। সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত তাহা পর্ত্তুগীজ রাজধানী গোয়া নগরী নামে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। এ ফিরিঙ্গি বণিকের ভারতের বাণিজ্যের রাজধানী শীঘ্রই সুদৃঢ় দুর্গে বেষ্টিত হইয়া ধনরত্নে সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। এই রাজধানীতে রাজকার্য্যালয় সংস্থাপিত করিয়া, রাজ-প্রতিনিধি আলবুকার্ক রাজ্যশাসনে ও বাণিজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন।" (প্রাগুক্ত, ১১৯-১২১)।

রাজধানী গোয়াতে বসে আরও কিছু করলেন আলবুকার্ক; সেটা মালাবার উপকূলে এক ষড়যন্ত্রের খেলা। পর্তুগীজদের উপকূল রাজনীতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিলেন কালিকট-রাজ। সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কাজে লেগে গেলেন আলবুকার্ক। এর আগেই কোচিন রাজের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন ভাস্কো ডা গামা; পর্তুগীজদের সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ কোচিন রাজের পাওয়ার কথা ছিল বিরাট

এক রাজ্য। এবারে আলবুকার্ক কালিকট রাজের ভাইকে ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে ফেললেন। সে ষড়যন্ত্র ছিল ভাইটি যদি কালিকট রাজকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে পারেন, তাহলে কালিকটের সিংহাসন তো বটেই, ভারতবর্ষের এক বিশাল রাজ্যের অধিকারী হবেন তিনি। তদনুযায়ী কালিকট রাজকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হল। কালিকটের নতুন রাজা হলেন ভ্রাতৃহন্তা ষড়যন্ত্র ভাই। এবার সেই বিশাল রাজ্য পাওয়ার আশা। ১৫১৩ এবং ১৫১৫ সালে সেই আশায় পর্তুগাল রাজের সামন্ত হিসাবে আলবুকার্কের সঙ্গে সেই ভ্রাতৃহন্তার যে চুক্তি হয়, তার শর্তগুলোর মধ্যে ছিলঃ (১) পর্তুগালের দুশমনরা কেউ কখনো আশ্রয় পাবে না; (২) খৃস্টানরা বিনাশুল্কে এতদঞ্চলে বাণিজ্য করতে পারবে; (৩) পর্তুগীজদের সাহায্যকারী হওয়ার জন্য ভারতীয় খৃস্টানরাও বিনাশুল্কেই বাণিজ্য করতে পারবে; এবং (৪) কালিকট রাজ অন্য বণিকদের নিকট থেকে যে শুল্ক আদায় করবেন, তার অর্ধেক পাবেন পর্তুগাল রাজ।

ওদিকে পূর্বেকার ষড়যন্ত্রী কোচিন রাজ যখন এই চুক্তির কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন। এমন চুক্তি তো তিনিও করেছিলেন। তার কি হল? আলবুকার্ক ও পর্তুগাল রাজের কাছে চিঠিপত্র লিখেও কোন ফল হল না; পরিত্যক্ত এক ষড়যন্ত্রী হয়েই থাকলেন কোচিন রাজ। প্রাচ্য বাণিজ্যের অধিকার ও প্রাধান্য এভাবে পুরাপুরি এসে গেল নবরূপী ক্রুসেডার পর্তুগীজদের হাতে। গোয়া, ভেসিন, দমন, দিউ এই চারটি বন্দরে ফিরিঙ্গি বণিকের ঘাটি হল সুদৃঢ়। পর্তুগীজ রাজধানী গোয়া স্বর্ণপুরী বলে স্বীকৃতি পেল ইউরোপে। কিন্তু এর মধ্যেই ১৫১৫ সালে আলবুকার্ক মৃত্যুমুখে পতিত হলেন; এবং মধ্য প্রাচ্যেও উদীয়মান তুরস্ক শক্তি ফিরিঙ্গি বণিকদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হল। এদিকে দানবীয় স্বভাব ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী পর্তুগীজরা অল্পকালের মধ্যেই দেখতে পেল, প্রাচ্য বাণিজ্যে তাদেরও নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটেছে। আর সে প্রতিদ্বন্দ্বী তাদেরই স্বধর্মী ইউরোপীয়, যাদের মধ্যে রয়েছে ফরাসী ও ইংরেজ বণিকেরা।

সুবে বাঙ্গালা ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

ইউরোপীয় বণিকদের ভারতবর্ষে আগমনের ধারাবাহিকতার তথ্য তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই উপমহাদেশ সংলগ্ন সাগরভিত্তিক বাণিজ্য প্রাধান্য লাভের ক্ষেত্রে পর্তুগীজ দৌরাত্মের ভাটার কালে একই উদ্দেশ্যে আগত বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানীর মধ্যে লণ্ডন ইস্ট হাণ্ডয়া কোম্পানীই সুপরিপল্পিতভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। বিভিন্ন কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে একের পর এক গড়ে তুলছে ফ্যাক্টরী-দুর্গ।

দূরভিসন্ধিকে পুরাপুরি গোপন রেখে বাহ্যিকভাবে ইংরেজরা শালীনভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, লণ্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কারণেই পর্তুগীজদের উপকূলীয় বাণিজ্য থেকে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে। কিন্তু কোথাও বালির নীচে দিয়ে যেমনি প্রবাহিত হয় ফল্গুধারা, পর্তুগীজ ইংরেজ বণিকদের হৃদয়ে তেমনি প্রবাহিত ছিল মুসলিম বিদ্বেষের বিষাক্ত ধারা। পর্তুগীজ ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যেকার পার্থক্য শুধু, কর্কশ-স্বভাব পর্তুগীজদের বিপরীতে ইংরেজ বিণকেরা ছিল ভান করা বিনয় ও শালীনতা মণ্ডিত। ফলে, তাদের প্রতিপক্ষীয়রা তাদেরকে তাদেরকে চিনতে অনেক সময় ভুল করত। ভারতবর্ষে বাণিজ্যরত ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের বণিকদের তুলনায় বস্তুত

ইংরেজ বণিকেরা ছিল অনেক বেশি ধূর্ত ও শেয়ানা। তাদের বেলায় বরং মুসলিম বিদ্বেষী খৃস্টান স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এক শেয়াল স্বভাব যা প্রতিপক্ষকে প্রতারিত করতে পারত সহজেই।

লণ্ডন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পীকেও দৃঢ় অবস্থান লাভ করতে বেশ কিছু চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের রাজ সিংহাসন নিয়ে হানাহানি কালে কোম্পানীর অবস্থা ছিল অনেক নড়বড়ে। "The restoration of Charles II brought better times, and his marriage in 1662 to Catherine of Braganza brought the island of Boambay. The English were now entering a new phase and is can be found the origins of the British empire in India. It is a period of India history little known or written about" রাজপথে দ্বিতীয় চার্লসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সময় বয়ে আনল এবং ১৬৬২ সালে ব্রাগাঞ্জার ক্যাথারিনের সঙ্গে তার বিবাহের ফলে বোম্বাই দ্বীপটি এসে গেল রাজ অধিকারে। ইংরেজরা তখন উন্নততর এক নতুন ধাপে প্রবেশ করছিল, আর এই ধাপেই খুঁজে পাওয়া যাবে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠান মূল। এই সময়টা ভারতীয় ইতিহাসের এমন এক সময় যার সম্পর্কে জানা গেছে বা লেখা হয়েছে খুবই কম।"(A history of India, Michael Edwardes, 1967, p. 181). আবার এই সময়টাতেই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুঘল শক্তি, এবং ক্রমে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি হিসাবে। কিন্তু দিন কারও সমান যায় না। মুঘলদেরও সুবর্ন দিন যথারীতি যথাসময়ে অস্তাচলগামী হয়েছে। শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্যে আরম্ভ হয়েছে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। মুঘল শক্তির বিপরীতে মারাঠা শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। বোম্বাই দ্বীপে অবস্থিত সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করেছে তারা দুবার, ১৬৬৪ সালে প্রথম বার এবং ১৬৭০ সালে দ্বিতীয় বার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় এজেন্টদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে যে তাদের বাণিজ্য পোতে ইংল্যাণ্ডের পতাকা উড়লেই চলবে না শুধু, সে পতাকাকে তাদের রক্ষাও করতে হবে। অর্থাৎ বাণিজ্যের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে হবে শক্তির।

১৬৬৮ সালে রাজা দ্বিতীয় চার্লস প্রচুর পরিমাণ ঋণ নিয়ে বোম্বাই দ্বিপটি হস্তান্তর করে দেন কোম্পানীকে। এই মালিকানা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয় কোম্পানীর সদর দপ্তর। আর ১৬৭৪ সালে এই সদর দপ্তর থেকেই মিষ্টার ওকসিনডেনকে এক গোপন দৌত্য কার্যে পাঠানো হয় দুর্গম রাহিরি দুর্গে, শিবাজীর রাজ্যাভিষক বার্ষিকীতে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে সেখানে স্বাক্ষরিত হয় মারাঠা নেতা শিবাজীর সঙ্গে লণ্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক গোপন সমঝোতা চুক্তি যার শর্তানুসারে ভারতর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটানোর সংগ্রামে মারাঠা শক্তি পাবে কোম্পানীর সাহায্য, আর এর বিনিময়ে কোম্পানী এসে এখানে পাবে অবাধ বাণিজ্যর অধিকার। (দেখুন পরিশিষ্ট- ক)।

এমনি অবস্থায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হয়ে এলেন স্যার যোসিয়া চাইলড, শ্যেন স্বভাবের এক মান্যবান ব্যক্তি। কোম্পানীর বাণিজ্যের ব্যাপারে যা চলছে, তাতে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইংরেজ কোম্পানী অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীর কাছে মার খাবে, মুঘলদের কাছে দুর্বল আনুগত্য দেখিয়ে বাণিজ্যের ক্ষতি করবে, এটা তার একেবারেই পছন্দ ছিল না। মুঘলদের বিরুদ্ধে মারাঠা নায়ক শিবাজীর ছলাকলা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগত ছিলেন স্যার যোসিয়া চাইলড।

তিনি উপলব্দি করেছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত মুঘলদের উপযুক্ত প্রতদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটেছে ভারতবর্ষের মাটিতেই। তদুপরি তার এ বিশ্বাসও দৃঢ়তর হয়েছিল যে ওলন্দাজ ফরাসীদের শক্তি ও ব্যবহারের যোগ্য ও যথার্থ মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট শক্তিমত্তারই প্রয়োজন।

এর মধ্যেই সুরাট বন্দরে ঘটে গেল এমন এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার যার ফলে এখানে পৌছে যেতে পারল ইংল্যাণ্ডের পাঠানো এক নৌবহর। বোম্বাই এ রিচার্ড কিগউইন নামে ইংরেজ কোম্পানীর এক নৌ কমাণ্ড্যান্ট উপরস্থ কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করে বোম্বাই দুর্গের নিয়ন্ত্রণভার নিজের হাতে গ্রহণ করে বোম্বাই বন্দরকে সরাসরি ইংল্যাণ্ডের রাজ্যভুক্ত স্থান বলে ঘোষণা করে দিল। বোম্বাই দুর্গের প্রতিরক্ষা ও শাসন ব্যবস্থা এত দক্ষতার সঙ্গে কিগউইন প্রতিষ্ঠিত করল যে মুঘল বা মারাঠা কেউই তাতে উচ্চবাচ্য করার সুযোগই পেল না। অবশেষে এই অনভিপ্রেত গোলমাল থামাবার জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে পাঠানো হল এক নৌবহর এবং তার কাছে কালবিলম্ব না করেই আত্মসমর্পণ করল কমাণ্ড্যান্ট কিগউইন। কি সুন্দর অভিনয়। মুঘল মারাঠার চোখে ধাধা লাগিয়ে কোম্পানী সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠল। অতঃপর সুরাট বন্দর থেকে কোম্পানীর সদর দপ্তর আবার সরিয়ে আনা হল বোম্বাইতে। তাতে হয়তো স্যার যোসিয়া চাইলডের প্রত্যাশাই পূর্ণ হল।

১৬৮০ সালে শিবাজীর মৃত্যু হয়, আর ওই সালেই লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে লাভ করে বোম্বাইভিত্তিক বাণিজ্য সনদ। এবং ছয় বছর যেতে না যেতেই ইংরেজ কোম্পানী সরাসরি মুঘল শক্তির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। বোম্বাই থেকে হুগলী বন্দরে পাঠানো হয় দশটি সশস্ত্র যুদ্ধ জাহাজ এবং ছয় শ' নৌসেনা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের বাহিনী এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা পরাজিত হয় ঠিকই এবং বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যিক অবস্থান ধ্বংসও হয়ে যায় সত্য, কিন্তু মুঘলদের নৌশক্তির দুর্বলতাও ধরা পড়ে যায় ইংরেজদের কাছে। ইংরেজরা জানত বিচক্ষণ সুচতুর এই সম্রাট আওরঙ্গজেব স্থলভাগে দাক্ষিণাত্যে মুঘল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তারই সঙ্গে মারাঠা শিখ রাজপুত সমস্যার সমাধানের জন্য খুবই ব্যতিব্যস্ত আছেন। সুতরাং পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ এবং মুসলিম মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসের কাজে হাত দেওয়ার উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকল ইংরেজরা। হুগলীতে বিপর্যস্ত হওয়ার পর ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষ হয়ে জব টার্নক হাজির হলেন এসে মুঘল দরবারে। উদ্দেশ্য, ইংরেজ মুঘল বিবাদের একটা মিটমাট করে ফেলা। মিটমাট একটা হয়েও গেল। ১৬৮৬ সালে বাংলার উপকূলে এই যে নৌযুদ্ধ তাতে জয়লাভ করেও সম্রাট আওরঙ্গজেবের মুঘল নৌ শক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আবার দুই পক্ষের মধ্যে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। কিন্তু মুঘল পক্ষ তাতে কোন প্রভুত্ব ফলাতে অগ্রসর হয় নি। যেন এক দুর্বল অবস্থান থেকে সবল নৌশক্তির অধিকারী ইংরেজের সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৬৯০ সালে। অতঃপর ১৬৯৬ সালে ইংরেজ কলকাতায় এক দুর্গ নির্মাণের অনুমতিও আদায় করে নেয়, যার ফলে ১৬৯৯ সালে কলকাতায় নির্মিত হয় সেই দুর্গ, এবং ইংল্যাণ্ডের রাজার সম্মানার্থে তার নামকরণ করা হয় ফোর্ট উইলিয়াম।

এর মধ্যে ১৬৯৮ সালে নব প্রতিষ্ঠিত দ্য নিউ ইংলিশ কোম্পানী সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে পাঠাল এক নতুন দুত; উদ্দেশ্য নতুন কোম্পানীর জন্য মুঘল সাম্রাজ্যে বাণিজ্যের অধিকার লাভ। কিন্তু নতুন কোম্পানী সে অধিকার পেল না। তখন

ইংল্যাণ্ডের সরকার চাপ প্রয়োগ করে পুরনো ও নতুন দুটি বাণিজ্য কোম্পানীকে একীভূত করে দিল। সেটা ১৭০৭-০৮ সালে; নামকরণ করা হল "United Company of Merchants of England Trading of the East Indies" এই একীভূত কোম্পাটিই বহাল থাকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলায় কোম্পানী রাজত্বকালে লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা করার সময় পর্যন্ত।

এর আগে ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে মুঘল মসনদে আরোহণ করেন সম্রাট পুত্র বাহাদুর শাহ। মুঘল শক্তি তখন ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলছে। তার মধ্যে দেখা দিয়েছে অন্তর্বিরোধ। সাম্রাজ্য প্রধানেরা নিজ নিজ আখের গুছাতে ব্যস্ত; কেন্দ্রীয় শক্তি নেহায়েতেই দুর্বল। পাঁচ বছরের মত রাজত্ব করে সম্রাট বাহাদুর শাহও মারা যান ১৭১২ সালে। পরবর্তী সম্রাট জাহান্দার শাহ (১৭১২-১৭১৩, জানুয়ারী) এবং পরের জন সম্রাট ফররুখশিয়র (১৭১৩-১৭১৮)। অতঃপর ঘন ঘন সম্রাট পরিবর্তন এর মধ্যে ১৭১৫ সালে ফররুখশিয়রের রাজত্বকালে ওই একীভূত ইংরেজ কোম্পানী আবার মুঘল দরবারে দূত পাঠায়। কোম্পানীর এবাবের দাবী ছিল মুঘল সাম্রাজ্যে বাণিজ্যের ফরমান আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের চার পাশে কয়েকটি গ্রামের লীয নেওয়া। সম্রাট তখন এক কঠিন ব্যধিতে আক্রান্ত। সেই ব্যাধি থেকে তাকে সুস্থ করে তোলেন ইংরেজদের দৌত্য মিশনের এক ডাক্তার সদস্য মিষ্টার হ্যামিলটন। ফলে গ্রামগুলোর লীয পাওয়া সম্ভব না হলেও ১৭১৭ সালে কলকাতাকে আরও জনসমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার অনুমতি পেল ইংরেজরা। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলার শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন তখন নবাব মুর্শিদ কুলী খা। তিনি ইংরেজদের এসব সুবিধা প্রদানে প্রানপণ বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা উপঢৌকন ও ঘুষ দিয়ে দিল্লীর দরবারীদের মাধ্যমে ইংরেজরা তাদের কাম্য কিছু সুবিধা আদায় করে নেয়।

ইংরেজদের সুবিধা আদায়ের আরও ইতিহাস আছে। সম্রাট আওরঙজেবের একান্ত বিশ্বস্ত মুর্শিদ কুলি খা সুবে বাংলার নিয়মিত সুবেদাররূপে নিযুক্তি পান ১৭১৭ সালে। সম্রাট আওরঙজেবের শাসনামলে সুবে বাংলায় বাণিজ্যরত ইউরোপীয় কোম্পানীর মধ্যে ছিল ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ কোম্পানী। তার মধ্যে ওলন্দাজ ও ফরাসীরা সম্রাট প্রদত্ত ফরমান অনুযায়ী প্রদেয় শুল্ক রীতিমত পরিশোধ করেই ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ১৬৮৬ সালের হুগলী যুদ্ধের পর ১৬৯০ সালে মুঘল সম্রাট ইংরেজদের সঙ্গে পুনরায় যে চুক্তি করেন তাতে ওলন্দাজ ফরাসীদের তুলনায় ইংরেজরা বেশি শুল্ক সুবিধা আদায় করে নেয়। "Aurangzeb's farman of 1690 allowen them to trade freely in Bengal and Orissa in lien of an yearly payment of 3000 rupees and granted them the privilege of issuing "dastaks" (Clearance certificates) showing that the goods carried in a vessel belonged to the Company. They had also obtained Zamindari rights over the three villages of Culcutta, Sutanati and Govindapur and had fortified their settlements there"। আওরঙজেবের ১৬৯০ সালের ফরমানে বছরে ৩০০০ টাকা প্রদানের বিনিময়ে তাদেরকে বাংলা ও উড়িষ্যায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার এবং কোন বাণিজ্য পোতে বাহিত মালামাল কোম্পানীর বলে 'দস্তক' (ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট') দেবার বিশেষ সুবিধা প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হল। তারা আরও পেয়ে গেল

কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটির উপর জমিদারী স্বত্ব এবং তদনুযায়ী তারা সেখানে তাদের বসবাস শক্তিশালী করে নিল। "History of the Muslims of Bengal, Dr. M. Mohar Ali. Vol. 1 A. 1985, p. 559"

১৬৯০ সালের চুক্তিবলে ইংরেজদের দস্তক দানের এই যে অধিকার, তাতে লুকিয়ে ছিল শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার বিরাট সুযোগ। তাতে করে কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাতে পারত কোম্পানীর নামের আড়ালে। কোম্পানীর নাম করলেই তো বার্ষিক ৩০০০ টাকা কর দানের নামে সব শুল্কের ঝামেলা মিটে যায়। এতসব সুবিধাদানের পরেও ইংরেজ কোম্পানীর কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হয়ে মুঘল কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু কোন ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়নি, চরিত্রহীন মুঘল আমীর ওমারাদের হস্তক্ষেপে। একমাত্র দৃঢ়চেতা শাসক মুর্শিদ কুলী খা একা আর কতটুকু করতে পারেন। ফলে কলকাতায় ইংরেজদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং হুগলী নদীর মোহনায় তাদের নিয়ন্ত্রণ হয় আরও দৃঢ়।

নতুন ফরমানে ইংরেজ কর্তৃক গ্রাম লীয, টাকশাল ব্যবহার ও অন্যান্য সুযোগাদির ব্যাপারে সম্রাটের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল মুর্শিদ কুলী খাকে। তাই ইংরেজরা এসব কাজ করিয়ে নিতে সফল হয়নি।

কিন্তু ইংরেজ বণিকদের অন্যান্য কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার কোন প্রচেষ্টাও আর নেন নি মুর্শিদ খান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তার অনভিপ্রেত কিন্তু সম্রাট ফররুখশিয়র প্রদত্ত ১৭১৭ সালের ফরমানই সুবে বাঙ্গালায় ইংরেজ আধিপত্যের নিশ্চিত সোপান হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই সোপান বেয়ে গন্তব্য স্থলে পৌঁছবার জন্য যে অগ্রযাত্রা তার প্রস্তুতিকালে সোপানওয়ালা ঘরের দরজা অবিশ্যি উন্মুক্ত হয়েছিল ১৬৮৬ সালের হুগলী যুদ্ধ পরবর্তী ১৬৯০ সালের নতুন শান্তি চুক্তির বলেই। ভাস্কো আলমিদা আলবুকার্কদের দুর্বিনীত স্বপ্ন বাস্তবতার স্পর্শ পেয়েছিল যোসিয়া চাইল্ডদের নরম-গরম কূটনীতির মাধ্যমে।

ইংরেজ কোম্পানীর মাধ্যমে প্রতীচ্য স্বপ্নের প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিল সুবে বাঙ্গালাহ। ১৭১৭ সালের পর মাত্র ৪০ বছর পরই তারা পৌছতে সমর্থ হয়েছিল সেই লক্ষ্যে ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে। অতঃপর মীর জাফর, মীর কাশেম, আবার মীর জাফর এবং ১৭৬৫ সালে দুর্বলতম মুঘল শক্তিকে ব্যবহার করে ইংরেজ কর্তৃক সুবে বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ। তার পরের ইতিহাস তো সর্বজ্ঞাত।

ভারতবর্ষের উপকূলে প্রতিষ্ঠিত এই নবরূপী ক্রুসেডাররা, বিশেষ করে ধূর্তশ্রেষ্ঠ ইংরেজ বণিকেরা, এই বিশাল ভূখণ্ডে তাদের প্রকৃত প্রতিপক্ষ মুসলিম রাজশক্তিকে এবং সেই সূত্রে এখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কিভাবে ক্রমে ক্রমে এক অজগরী কায়দায় গ্রাস করে নিল তার প্রকৃত চিত্র লেখার মর্ম অনুধাবনের জন্য ভারতবর্ষে ইসলাম ও মুসলিম শাসনের স্বরূপটা জানার প্রয়োজন রয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের স্বরূপ

যে সময়কার কথা দিয়ে এ আলোচনার আরম্ভ, সে সময়ে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার স্বর্ণদিনে অস্তসূর্যের লালিমা দেখা দিয়েছে। সিন্ধু উপত্যকা চিহ্নিত এক প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব ও গৌরব বহিরাগত নর্ডিক আর্যদের। তারা ইরান হয়ে ভারতবর্ষে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। কালপ্রবাহে অতঃপর সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হল আর্য আধিপত্য এবং আর্যদের বর্ণ প্রথার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন। সে সময়কার ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেন- (অনুবাদ) "পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ ক্ষমতার বলে অত্যাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গতানুগতিক কৌলিন্য প্রথার দরুন জাতিভেদের নিয়মকানুনগুলো কঠোর হতে কঠোরতর হয়েছিল। জাতিভেদ প্রথা ক্রমান্বয়ে মানুষে মানুষে ব্যবধান আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্য শিক্ষায়তনের দ্বার চিররুদ্ধ করে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ন্যায় পৌরানিক ধর্মে ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার"। (History of Bengali Language and Literature)।

এমনি অবস্থার প্রেক্ষাপটে আরম্ভ হয় ভারতর্ষীয়দের সঙ্গে ইসলাম ও মুসলিম শাসনের প্রথম পরিচয়। কালিকট, সুরাট ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় বাণিজ্য বন্দরে আরব পারশিক সওদাগরী পণ্যের সঙ্গে আসতে আরম্ভ করে ইসলামের সওগাত। খৃস্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে আরবীয় মুসলমানরা সিন্ধু-মুলতান দখল করে। তারও প্রায় তিনশ' বছর পর উত্তর দিক থেকে মুসলিম অভিযানকারীরা এসে অধিকার করে পেশোয়ার ও লাহোর। সিন্ধু মুলতানে স্বল্পকালীন আরব আধিপত্য অবসানের পর একাদশ ও দ্বাদশ শতকে গযনীর সুলতান মাহমুদ ও শিহাব-উদ-দীন মুহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণ এবং অবশেষে মুহম্মদ ঘুরী কর্তৃক এই উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি। আরম্ভ হয় ভারতবর্ষে দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম শাসন-প্রথমে তুর্কী ও তুর্কী আফগান এবং পরে মুঘল শাসন। প্রকৃত প্রস্তাবে সুদীর্ঘকালের এই শাসন বিপ্লবাত্মক ইসলামী শাসন ছিল না; যথার্থভাবে বলতে গেলে তা ছিল মুসলিম শাসন। বিপ্লবাত্মক ইসলামী শাসন বলতে আমরা বুঝাতে চাইছি ইসলামের নবীজি (সাঃ) প্রদর্শিত ও অনুসৃত শাসন ব্যবস্থা যা প্রয়োগ করেছিলেন খোলাফায়ে রাশেদা এবং পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ। মুসলিম জগতের বাদবাকি প্রায় সকল শাসকই অনুসরণ করে গেছেন রাজতন্ত্রীয় মুসলিম শাসন। ভারতবর্ষেও তার অন্যথা হয়নি।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের প্রসঙ্গে স্বনামধন্য চিন্তাবিদ মানববেন্দ্রনাথ রায় বলেনঃ "ভারতবর্ষে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বেই তার গতিশীল ভূমিকার অভিনয়টুকু ইসলাম শেষ করে ফেলে। সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে বিপ্লবী আরবেরা তার পতাকা রোপন করেনি, করেছে ইসলামে দীক্ষিত মধ্য এসিয়ার বর্বরেরা আর বিলাস বিহবলতায় নীতিচ্যূত পারস্যবাসীরা। মোহাম্মদের স্মৃতিতে রচিত বিরাটতম কীর্তিস্তম্ভ আরব সাম্রাজ্যকে এরাই করেছে বিপর্যস্ত। তবু ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ বিপ্লব যখন পর্যুদস্ত হয়ে গেলো আর তাতেই হলো ভারতের সমাজে বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি, তখন জনসাধারণ

তা থেকে স্বস্তি ও মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচার জন্য ইসলামের বার্তাকেই জানালো সাদর সম্ভাষণ। ভারতের পারস্যবাসী কি মোগল বিজেতাদের কেউই আরব বীরদের যুগান্ত প্রবাহিত মহানুভবতা, সহিষ্ণুতা কি উদারতা থেকে নিজেদের একেবারে দূরে সরিয়ে ফেলে নি। দূর দেশের পরস্বাপকারী আক্রমণকারীর অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দল একশত বৎসর ধরে এই বিরাট দেশের শাসনকর্তা হয়ে রইলো আর লক্ষ লক্ষ লোক তাদের বিরুদ্ধে প্রকৃতির এই বিশ্বাসই গ্রহণ করলো, এতেই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় সমাজের বাস্তব প্রয়োজন তারা অনেকাংশে মেটাতে পেরেছে। এমন কি, প্রতিক্রিয়ার ভারে যখন তার বিপ্লবজনিত আদি উত্তাপের অনেকটাই হ্রাস পেয়ে গেছে তখনও ইসলাম হিন্দু সমাজে তার অনেক বিপ্লবাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে। আক্রমণকারীদের শক্তির উৎকর্ষের দ্বারা ভারতবর্ষে মুসলিম শক্তি ততটা সংহতি লাভ করেনি যতটা করেছে ইসলাম ধর্মের প্রচারণায় আর ইসলামের আইন কানুনের প্রগতিশীল রূপধারার সহায়তায়"। (মানবেন্দ্রনাথ রায় রচিত The Historical Role of Islam এর অনুবাদ 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, মুহম্মদ আবদুল হাই, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯, পৃঃ ১০৩-১০৪)।

আমরা যদি ইসলামের নবীজি (সাঃ) প্রদর্শিত ও ৬৩২ খৃস্টাব্দ থেকে ৬৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অনুসৃত খোলাফায়ে রাশেদা বা সত্যাশ্রয়ী খলিফা চতুষ্টয়ের শাসনকে ইসলামী শাসন এবং পরবর্তীতে বিচ্যুত 'রাজতন্ত্রী খলিফাদের' শাসনকে মুসলিম শাসন বলে অভিহিত করি, তা হলে শ্রী রায় এর উপরিউক্ত মন্তব্যের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করে নিতে হয়। বস্তুত, ইসলামী খেলাফত ছিল তখনকার রীতির প্রেক্ষিতে একটি নির্বাচিত ভিত্তিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত নেতৃত্ব এবং দেশ ও জাতিকে পরিচালনায় সে নেতৃত্বের কর্তৃত্বও তখনকার রীতির প্রেক্ষিতে ছিল গণতান্ত্রিক; যেমন গণতান্ত্রিক ছিল রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম দিককার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। পক্ষান্তরে, বংশানুক্রমিভাবে বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ইসলামী খেলাফতের শাসন ছিল না, ছিল বাদশাহী বা রাজতন্ত্রীয় শাসন।

কিভাবে কোন ঘটনাক্রম অতিক্রম করে ইসলামী খেলাফত মুসলিম রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হল, ইতিহাসে তার বিশদ বিবরণ রয়েছে। এই পরিবর্তনের পরেও কিন্তু রাজতন্ত্রীরা 'ইসলাম অনুসারী' হিসাবে মুসলিম শাসক বলেই অভিহিত ও স্বীকৃত হয়ে আসছেন। তাই মুসলিম রাজতন্ত্রীদের শাসনকে মুসলিম শাসন বলেই চিহ্নিত করা সমীচীন। ইসলামী শাসনের পতাকায়ও অঙ্কিত থাকত সেই ইসলামের পরিচয়। সিন্ধু গঙ্গার তীরে সেই পতাকা যখন প্রোথিত হয়, তখন আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেস্কের মসনদে উপবিষ্ট ছিলেন, 'খলিফা' উপাধিধারী উমাইয়া বংশের বাদশা প্রথম ওয়ালিদ। সুদক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধিকারী অথচ রক্তলোলুপ অত্যাচারী স্বৈরশাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তখন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা। এই হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশেই সিন্ধুতীরে প্রেরিত হয়েছিল এক মুসলিম বাহিনী যার নেতৃত্বে ছিলেন মোহাম্মদ বিন কাশেম। শ্রী রায় ব্যবহৃত 'বর্বর' শব্দটা এসব রাজপুরুষ সম্পর্কে যথার্থ না হলেও তারা যে সেই বিপ্লবাত্মক ইসলামের পতাকাবাহী ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এ কথাও সত্য যে এসব রাজতন্ত্রীরাই ইসলামের গতিশীল বিপ্লবাত্মক ভূমিকাকে কালিমালিপ্ত করেছেন। তবুও শ্রী রায় এর মতে এই প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম শাসকদের শিক্ষাদর্শে সেই বিপ্লবাত্মক ইসলামের যতটুকু আলোকরশ্মি বিদ্যমান ছিল, তার ঔজ্জ্বল্যেই আলোকিত হয়ে উঠল ভারতীয় সমাজের

পতিত অবস্থার অন্ধকার। এই মন্তব্যে ইসলামের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী শক্তির পাশাপাশি ভারতীয় সমাজের তখনকার দুর্দশার আভাসও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। শ্রী রায় এর পরবর্তী কথায় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ইসলামের এই পথচ্যুতির দিনেও ভারতবর্ষে মুসলিম শক্তির সংহতি স্থাপনে মুসলিম শাসককূলের শক্তির উৎকর্ষ যতটা না কার্যকরী ছিল, তার চাইতে বেশি কার্যকরী ছিল এই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারকদের একনিষ্ঠ কর্মধারা।

এখানেই আসে ইসলামী শাসনের অবসানের পর মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে দ্বিধাবিভক্তির কথা। খোলাফায়ে রাশেদার শাসনকালে খলিফার উপর যে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তা ছিল সর্বাত্মকভাবে একক। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে আরম্ভ করে সমাজের সকল দিকের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করতে হত খলিফাকে। যেভাবে ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগে পরিব্যাপ্ত, খলিফার নেতৃত্বেও তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি বিভাগকে বেষ্টন করে ছিল। খোলাফায়ে রাশেদার সকল খলিফাই এমনি নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু রাজতন্ত্রের কালে রাজা বাদশারা ছিলেন না এমনি ব্যাপক ও সর্বাত্মক নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী। আর এই পরিস্থিতিতেই উদ্ভব ঘটে দ্বিধাবিভক্ত নেতৃত্বের ঃ একদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অন্যদিকে ধর্মীয় নেতৃত্বের। রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকল রাজা বাদশাদের কর্তৃত্বে, আর ধর্মীয় নেতৃত্ব চলে গেল সমাজে গন্যমান্য আলেম উলামাদের হাতে। এই দুই নেতৃত্ব সম্পর্কে কিছু বলার আগে অন্য একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাপারে কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। নবীজি হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর সাহাবী ছিলেন যাঁরা, যাঁরা তাঁর সঙ্গে থেকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন, সুখ দুঃখের ভাগী হয়েছেন, তাঁদের ঈমানী আবেগ ও দৃঢ়তার সঙ্গে পরবর্তী বিভিন্ন সময়ের ইসলাম অনুসারীদের ঈমানী আবেগ ও দৃঢ়তার তুলনামূলক কিছু কথা। সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন এবং আরও পরবর্তী কালের আলেম-উলামা সবাই কি একই পরিমাণে নবীজি (সাঃ) প্রদর্শিত ইসলামের রূপ ও ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন? না, তা তো করার কথাও নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার তুলনায় পরোক্ষ জ্ঞান কিছুটা দুর্বলতর হওয়ারই কথা। স্মৃতি ও শ্রুতির প্রভাবে তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক। নবীজি মুহম্মদ (সাঃ)-এর সাহচর্য, তাঁর প্রদর্শিত পথে চলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান নির্দেশনা ও অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের জন্য তাঁর উপদেশাবলী যারা প্রত্যক্ষভাবে লাভ করেছেন, ইসলাম সম্পর্কে করণীয় কর্তব্য নির্ধারণের যোগ্যতা সেই সাহাবাগণেরই তো বেশি থাকার কথা। যোগ্যতার মাপকাঠিতে পরবর্তী স্তরে অবস্থান গ্রহণের অধিকারী হচ্ছেন পরোক্ষ শিক্ষা লাভকারী তাবেঈনগণ, আরও নিম্নতর স্তরে আরও পরোক্ষ শিক্ষা লাভকারী তাবে তাবেঈনগণ। এমনিভাবে পরোক্ষতার দূরত্ব বাড়তে বাড়তে আসে আলেম উলামাদের অবস্থান গ্রহণের কথা। এই বাস্তবতার সঙ্গে এ-ও উল্লেখ্য যে, যোগ্যতার মাপকাঠির একই স্তরে অবস্থান গ্রহণকারীদের মধ্যেও ঈমানী আবেগ ও অভিজ্ঞতায়ও নিজ নিজ চারিত্রিক বৈশেষ্ট্যের জন্য ঘটতে পারে তারতম্য।

এই বক্তব্যের আলোকে বিবেচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে, কেন খোলাফায়ে রাশেদার অবসানে বাদশাদের অনভিপ্রেত কর্তৃত্ব ইসলাম অনুসারীরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া, প্রকৃত প্রস্তাবে বাদশা হলেও তাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় আবৃত ছিল 'খলিফা' উপাধির আবরণে; আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহকে তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেন নি। তাদের শাসনে মুসলিম সমাজের বিষয়াদি

শরিয়াত অনুযায়ীই পরিচালিত হত। এভাবেই বাদশারূপী 'খলিফা'রা সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকারী বলে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিলেন।

আর ওদিকে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে বর্তাল তাবেঈন, তাবে- তাবেঈন ও আলেম উলামাদের উপর। যদিও তাঁদের নেতৃত্ব সুসংগঠিত ছিল না, তবুও মুসলিম সমাজ তাঁদের ধর্মীয় নেতৃত্ব মেনে নিল। এই দুই নেতৃত্বের মধ্যে সহযোগিতা ছিল খুবই সামান্য। ধর্মীয় নেতৃত্বকে তার দায়িত্ব পালনে রাজা-বাদশারা খুব কমই সাহায্য করেছেন। যতটুকু করেছেন, তা নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই। রাজা বাদশারা দেশের পর দেশ জয় করেছেন, আর ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সেসব দেশের মানুষকে ইসলামের প্রভাব বলয়ে এনে তাদের মধ্যে সংহতির বন্ধন দৃঢ়তির করেছেন। এবং একাজে বিজিত রাজ্যকে নিজ অধিকারে রাখার লক্ষ্যে রাজা বাদশারা ধর্মীয় নেতৃত্বকে সহায়তা দান করেছেন।

কিন্তু কালক্রমে স্বভাবতই ধর্মীয় নেতৃত্বেও এল সঙ্কট, এল মতপার্থক্য। আর এই মতপার্থক্য কখনো ইসলামের বিধি বিধান সংক্রান্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ফলশ্রুতিতে, কখনো শাসককুলের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে তাদের সুকৌশল হস্তক্ষেপে। সৃষ্টি হল বিভিন্ন ফেরকা, ফেরকার মধ্যে উপ ফেরকা।

মুসলিম জাহানের এমনি অবস্থায় ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হল মুসলিম শাসন। মুসলিম সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী বাগদাদে তখন আব্বাসীয় বংশের 'বাদশাহী' চলছে। ভারতবর্ষে এই মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যারা তাদের পরিচয় দিতে হলে কিছু প্রসঙ্গ কথার অবতারণা করতে হবে। আগেই বলা হয়েছে, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কালে মুসলিম জাহানের কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন বাগদাদভিত্তিক আব্বাসীয় খলিফাগণ। ততদিনে মুসলিম জাহান এক বিশাল আকার ধারণ করেছে।

কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন যারা, তাদের সীমাহীন অযোগ্যতার জন্য সে সাম্রাজ্য দ্রুত ধাবমান হয় ধ্বংসের পথে। ৭৫০ সালে আবুল আব্বাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ১২৫৮ সালে, হালাকু খানের নেতৃত্বে মোঙ্গল বাহিনীর নির্মম আক্রমণের মাধ্যমে। এই প্রায় পাচশ' বছরের আবাসীয় খেলাফতের প্রথম শতবর্ষই ছিল প্রকৃত পক্ষে এক গৌরবোজ্জ্বল কাল। তারপর থেকেই আব্বাসীয় খলিফাগণ প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হারিয়ে আমীর উজীরদের হাতে ক্রীড়নকরূপে মসনদে সমাসীন থাকেন। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের একক শক্তিও হয়ে পড়ে খুবই হীনবল। এই সময়কালের মধ্যে অর্থাৎ আব্বাসীয় সাম্রাজ্য যখন হীনবল, তখন সাম্রাজ্যের দূরবর্তী এলাকায় কতিপয় স্বাধীন রাজ্য, এমন কি স্বাধীন 'খেলাফতের' উদ্ভব ঘটে। স্পেনে আরম্ভ হয় প্রথমে উমাইয়া শাসন ও পরে উমাইয়া খেলাফত, মিশরে ফাতেমীয় খেলাফত। কতিপয় স্বাধীন ফাতেমীয় রাজ্যের মধ্যে আফগানিস্তানে গযনী রাজ্য ছিল অন্যতম। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলপ্তগীন ছিলেন একজন তুর্কী ক্রীতদাস। আলপ্তগীনের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবু ইসহাক ইবরাহীম গযনীর মসনদে আরোহণ করেন (৯৬৩-৯৬৬ খৃঃ)। অপুত্রক অবস্থায় তার মৃত্যু হলে আলপ্তগীনের দুইজন ক্রীতদাস বিলকাতিগীন (৯৬৬-৯৭৫ খৃঃ) এবং পিরিতিগীন (৯৭৫-৯৭৭ খৃঃ) একে একে গযনীতে রাজত্ব করেন। অতঃপর গযনীর মসনদে আরোহণ করেন আলপ্তগীনের অন্য এক ক্রীতদাস ও জামাতা

সবুক্তগীন (৯৭৭-৯৯৭ খৃঃ)। তিনি কাসদার (মোটামুটিভাবে বেলুচিস্তান) রাজ্যটি দখল করে নেন এবং পাঞ্জাবের রাজা জয়পালকে যুদ্ধে পরাস্ত করে সে রাজ্যের লামগা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিরাট এলাকা নিজ রাজ্যভুক্ত করে নেন।

তার মৃত্যুর পর গযনীর মসনদে আরোহণ করেন তদীয় পুত্র আবুল কাশেম মাহমুদ (৯৯৮-১০৩০ খৃঃ) যিনি ইতিহাসে সুলতান মাহমুদ নামে পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৭ বার ভারত-অভিযানকারী বিজয়ী বীর এই সুলতান মাহমুদের উৎসাহেই পারশ্যের মহাকবি ফেরদৌসী রচনা করেছিলেন বিশ্ব সাহিত্যের অবিস্মরণীয় মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা'। সুলতান মাহমুদের দরবারে অন্য রত্ন ছিলেন বিশ্বখ্যাত সুপণ্ডিত আল বিরুনী। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর ১০৪০ সাল থেকে ১১৩৬ সাল পর্যন্ত আরও ১৪ জন কমজোর সুলতান গযনীর মসনদে সমাসীন ছিলেন। তাদের সময়েও ভারতবর্ষের অধিকৃত এলাকা গযনী রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আফগানিস্তানের আর একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যের কথা বলা আবশ্যক। রাজ্যের নাম গুর বা ঘুর। গযনী সালতানাতের পতনের পর ঘুর রাজ্যের সামন্ত মালিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইতিপূর্বে ১১৬০ সালে তুর্কীরা গযনীর সুলতান খসরু শাহকে গযনী থেকে বিতাড়িত করে পাঞ্জাবে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। ঘুর রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ১১৬৩ সালে, গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদের মাধ্যমে। তিনি ১১৭৩ সালে গযনী থেকে তুর্কীদের বিতাড়িত করেন এবং গযনী ও কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুইযুদ্দীন মুহম্মদকে। ইতিহাসে তিনিই মুহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। দীর্ঘকাল ভাইয়ের অধীনে শাসনকর্তা ও সেনাপতিরূপে নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এক বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন মুইযুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী। ১২০৩ সালে ভাইয়ের মৃত্যুর পর তিনিই হন ঘুর সাম্রাজ্যের সুলতান।

এই সুলতান মুহম্মদ ঘুরীরই এক ক্রীতদাস কুতবুদ্দিন আইবক ছিলেন ভাতবর্ষের মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত এক যোগ্য শাসনকর্তা এবং ১২০৬ সালে মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তার দ্বারাই ভারতবর্ষে আরম্ভ হয় স্বাধীন সুলতানী শাসন (১২০৬-১২১০ খৃঃ)। এই সুলতানী শাসনের ব্যাপ্তিকাল ১২০৬ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত, যার মধ্যে বিভিন্ন বংশীয়দের হাতে ন্যস্ত ছিল সাম্রাজ্যের শাসনভারঃ প্রথমে তুর্কী শাসন, তারপর খিলজী বংশীয়দের, তুগলক বংশীয়দের, বলবন বংশীয়দের এবং সৈয়দ ও লোদী বংশীয়দের শাসন। এই লোদীদের হাত থেকেই ১৫২৬ সালে সাম্রাজ্যের অধিকার চলে যায় মুঘল বংশীয় সম্রাট বাবরের হাতে।

অঞ্চল ভিত্তিক জাতিত্ব পরিচয়ে ভারতবর্ষের সুলতানেরা ছিলেন তুর্ক এবং তুর্ক আফগান ও আফগান। সম্রাট বাবরও ছিলেন আফগান। তদুপরি, বংশীয় বিশদ পরিচয়ে পিতৃকুলে বাবর ছিলেন সেই স্বনামখ্যাত তুর্কী বীর তৈমুরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং মাতৃকুলে তার পূর্বপুরুষ ছিলেন আর এক বিশ্বখ্যাত মোঙ্গল বীর চেঙ্গিস খান। মোঙ্গলদের সঙ্গে রক্তসম্পর্কিত বলেই বাবর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম মুঘল রাজবংশ।

এখানে উল্লেখ্য যে, ওইকালে মুসলিম রাজপুরুষ বা সেনাপতি সেনাধ্যক্ষদের আশ্রয়ে লালিত পালিত 'ক্রীতদাস' কিন্তু আমাদের প্রচলিত ধারণার ক্রীতদাস ছিল না। তখনকার দিনে যুদ্ধবন্দী অনেক তরুণ বা যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে আশ্রয়হারা অনেক

বালক তরুণকে বিজয়ী রাজপুরুষেরা বা সেনাপতি সেনাধ্যক্ষরা ইসলামী ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী নিজাশ্রয়ে এনে প্রতিপালিত করতেন। নিজেদের পরিজনদের মতই ওসব আশ্রিতকে তারা যুদ্ধবিগ্রহ রাজকার্য পরিচালনায়ও দক্ষ করে গড়ে তুলতেন। ওইসব আশ্রিত তরুণেরা প্রতিপালকদের 'ক্রীতদাস' বলেই ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। অবিশ্যি এ কথাও ধরে নেওয়া যায় যে, প্রতিপালকদের নিজ সন্তান পরিজনদের চাইতে 'ক্রীতদাসদের' প্রকৃত অবস্থান কিছুটা দূরেই থাকত এবং কখনও কখনও ওইসব 'ক্রীতদাসের' কেউ কেউ নিজ স্বভাবানুযায়ী বেঈমানী করতেও পিছপা হত না। উপরে বর্ণিত ক্রীতদাস সুলতানদের বংশগত সম্মান নিরূপণের বেলায় এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে। তার সঙ্গে এ-ও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠালগ্নে ও তার কাছাকাছি সময়ে যে অঞ্চল থেকে ওইসব ক্রীতদাস রাজপুরুষেরা এসেছিলেন সে অঞ্চলের সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার কথা। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কালটা ছিল মোটামুটি একাদশ ও দ্বাদশ শতকের কাল এবং তখনই মধ্যপ্রাচ্য মধ্যএশিয়ায় সংঘটিত হয়ে চলেছে খৃস্টান ইউরোপের প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রুসেড। আর তারই বদলা হিসাবে মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য-মধ্যএশিয়ার মুসলিম শক্তির জেহাদ। এই রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড-জেহাদের প্রচণ্ড তাণ্ডবে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত তখন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য-মধ্যএশিয়া। ইউরোপে শেষ দিকে এই তাণ্ডবের প্রচণ্ডতাকে আবার বাড়িয়ে দিয়েছিল মোঙ্গল আক্রমণ।

মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে চরম বিভ্রান্তিকর এই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের কারণ ছিল নানাবিধ- ধর্মীয়, রাজনৈতিক বাণিজ্যিক মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি। নানাবিধ কারণপ্রসূত এই ক্রুসেড ছিল প্রাচ্যের মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে প্রতীচ্যের খৃস্টীয় শক্তির অক্ষমতাভিত্তিক আজন্ম পোষিত ঘৃণা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহের এক চরম বহিঃপ্রকাশ।

পুনরাবৃত্তি করেই বলছি, ক্রুসেড ঘোষিত হয়েছিল ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে। তার বহু আগে দিগ্বিজয়ী মুসলিম শক্তি খৃস্টীয় ইউরোপকে স্পর্শ করেছে, অধিকার করে নিয়েছে স্পেন, পারশ্য ও বাইজানটাইন, সিরিয়া, জেরুযালেমসহ জাযিরা ও উত্তর আফ্রিকা। ৭১৭-১৮ সালে সিরীয় মুসলিমরা জয় করে নিয়েছে রোডস দ্বীপপুঞ্জ এবং অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাইপ্রাসও। ৭৯৮ সালে বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেছে স্পেনের উমাইয়াগণ, কার্সিকা ও সার্ডিনিয়া বিজিত হয়েছে ৮০৯ সালে এবং সিসিলি দ্বীপপুঞ্জ ৮২৭ থেকে ৯০২ সালের মধ্যে। এই সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের মাটি থেকেই মুসলিমরা ইটালিতে আক্রমণ চালিয়ে তার শাসকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। বিশাল এ সাম্রাজ্যের অধিকারী মুসলিম শক্তির সামনে উন্মুক্ত তখন বাণিজ্যভিত্তিক অতুল ঐশ্বর্যের দ্বার। এমনি অবস্থায় প্রতীচ্যের রাজ্যগুলো যে হিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরবে, এ তো স্বাভাবিক।

তদুপরি, ইউরোপে তখন প্রচলিত ছিল অরাজকতামূলক অবস্থা সৃষ্টিকারী সামন্ত প্রথা, যার ফলে আঞ্চলিক সামন্তদের মধ্যে চলে আসছিল দুর্বিষহ দ্বন্দ্ব-কলহ। প্রত্যেক সামন্তের ছিল নিজ নিজ ক্ষুদ্র যোদ্ধাদল যা সেই দ্বন্দ্ব কলহকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করত। ইউরোপের খৃস্টানদের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব কলহের আগুনকে নেভাতে পারে এমন কোন কেন্দ্রীয় শক্তিও ছিল না। সর্বোপরি, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে জেরুযালেমসহ সমগ্র প্যালেস্টাইন মুসলিম অধিকারে চলে আসে। জেরুযালেম হারানোর জ্বালা বিদ্যমান ছিল সকল ইউরোপীয়দের মনেই এবং

এই জ্বালাটা ধর্মীয় বলে সকল ইহুদী খৃস্টানকে তার পুনরুদ্ধারের আবেগে জাগ্রত করা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

তাই নানাবিধ কারণের মধ্যে এই জেরুযালেম পুনরুদ্ধারের সংকল্পকে প্রধান করে খৃস্ট জগতের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা পোপ দ্বিতীয় আরবানের আবেগময়ী উদাত্ত আহবানে এবং বাইজানটাইন সম্রাট আলেকসিয়াস কমনেনাসের আবেদনক্রমে ১০৯৫ সালে প্রথম ঘোষিত হল মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে খৃস্টশক্তির ক্রুসেড। ক্রুসেডকালে মুসলিম শক্তি ছিল পতনের দুঃখজনক অবস্থায়, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এবং বলা চলে মুসলিম শক্তির এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিল বলেই তাকে সমূলে ধ্বংস করার প্রবল বাসনা নিয়েই খৃস্টানদের উদ্ধত বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুসলিম রাজ্যগুলোর উপর। তাই প্রথম পর্যায়ে বিজয়ী হয়ে চলে খৃস্টান শক্তি। প্রথমেই তারা দখল করে নেয় এশিয়া মাইনর, ১০৯৮ সালে দখল করে এডিসা ও এন্টিয়ক এবং ১০৯৯ সালে জেরুযালেম। এন্টিয়কে খৃস্টান যোদ্ধারা প্রায় দশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে এবং অসংখ্য মুসলমানের উপর চালায় অকথ্য নির্যাতন ও দানবীয় অত্যাচার। ১১০১ সালে পুনরুদ্ধারকৃত জেরুযালেমের খৃস্টান রাজা বলডুইন দখল করে নেন জাফা, আক্রা, সিডন ও বৈরুত। খৃস্টানদের পুনরধিকৃত এলাকায় নব বিন্যাসে স্থাপিত হয় চারটি ল্যাটিন রাষ্ট্রঃ এডিসা, এন্টিয়ক, ত্রিপলি ও বৈরুত। খৃস্টানদের এই বিজয় গৌরব অম্লান থাকে ১১৪৪ সাল পর্যন্ত।

অতঃপর আরম্ভ হয় মুসলিম শক্তির পুনর্জাগরণ। তারা লিপ্ত হয় মরণপণ এক জেহাদে। ১১৪৪ সালেই এডিসা পুনর্দখল করে নেয় মুসলিম শক্তি। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনাকারী ছিলেন সুলতান ইমামুদ্দিন জঙ্গী। ক্রমে খৃস্টানদের অধিকার থেকে কেড়ে নেয় তারা আলেপ্পা, হারবান ও মসুল। ইমামুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর মুসলিম মুজাহিদরা লড়তে থাকে সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর নেতৃত্বে। চলতে থাকে জয় পরাজয়ের খেলা। এ সময়ে মুসলিম শক্তির নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবার জন্য এগিয়ে আসেন যে চিরস্মরণীয় বীর মুজাহিদ, তার নাম গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। জঙ্গী বংশের মাধ্যমেই তার নেতৃত্ব গ্রহণ এবং মিশরের ফাতেমীয় রাজত্বের অবসানে গাজী সালাহউদ্দিন কর্তৃক তার কর্তৃত্ব গ্রহণ। তার নেতৃত্বেই দ্বিতীয় পর্যায়ে সকল ক্রুসেডেই বিজয়ী হয় মুসলিম শক্তি। ফ্রান্সের ক্লার্মো ফেরাদ এ ১০৯৫ খৃস্টাব্দে রোমের পোপ দ্বিতীয় আরবানের অনলবর্ষী বক্তৃতায় ঘোষিত ক্রুসেড শেষ পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুযালেম মুসলমানদের দখলে আসার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত হয়। তারপরও নবতর রূপে চলতে থাকে ক্রুসেড।

অতঃপর গাজী সালাহউদ্দিনের মৃত্যুর পর আরম্ভ হয় ক্রুসেডের তৃতীয় পর্যায়। গাজী সালাহউদ্দিনের পুত্রের নেতৃত্বে এই তৃতীয় পর্যায়েও পরাজয় বরণ করে খৃস্টান ক্রুসেডারগণ। এর মধ্যে ১২১৬ সালে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট দুই লক্ষাধিক ধর্মযোদ্ধাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। সেখান থেকে তারা মিশর ও ডালমেটিয়া গমন করে প্রায় ৭০ হাজার নরনারীকে নৃশংস্যভাবে হত্যা করে। পরে ধর্মযোদ্ধারাও পরাজিত হয়। মুসলিম শক্তি ১২৯১ সালে অধিকার করে নেয় আক্রা এবং তার মধ্য দিয়েই পুনরাধিকৃত হয় মুসলিমদের সকল হারানো জনপদ।

ক্রুসেডের বিস্তৃত বিবরণ এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু নয় বলে আমরা কিছুটা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে চলে আসতে পারি মধ্যপ্রাচ্যে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রীয় অবস্থায়। বলার

অপেক্ষা রাখে না যে, এই উন্মুক্ত যুদ্ধবিগ্রহ যেমন ইউরোপের তেমনি মধ্যএশিয়ার জনজীবন হয়ে পড়েছিল চরমভাবে বিপর্যস্ত। আর এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যের বীরবৃন্দ তাদের অধিকারকে সংহত ও বিস্তৃত করার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। এবং তারই পথ ধরে ইসলামের পতাকা বহন করে ভারতবর্ষেও এসেছিলেন তুর্কী ও আফগান বীরবৃন্দ।

পরিশেষে বলতে হয় মোঙ্গল আক্রমণের কথা। চেঙ্গিস পৌত্র হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংসের কথা আগেই বলা হয়েছে। আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ঘটিয়ে হালাকু খানের বাহিনী ১২৬০ খৃস্টাব্দে আক্রমণ করে মিশর। গ্যালিলির আইন জালুদে মোঙ্গল বাহিনীর মোকাবিলা করেন মিশরের মামলুক সুলতান কুতুব ও তার সেনাপতি বাইসার্স। ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধের পর হেরে গেল দুধর্ষ মোঙ্গল বাহিনী। সম্ভব হল প্রচলিত ধারণার এক অবিশ্বাস্য অসম্ভব। ভূলুণ্ঠিত হল চিরদুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনীর রণক্ষেত্রে অপরাজেয়তার গৌরব। ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। ফলে উত্তর আফ্রিকা অভিমুখী মোঙ্গলদের পশ্চিমাভিযান বরাবরের জন্য থেমে গেল, ইসলামের চলমান অস্তিত্ব সুনিশ্চিত হল এবং সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের উপর প্রতিষ্ঠিত হল মামলুক সার্বভৌমত্ব।

কিন্তু এখানেই স্তব্ধ হল না মোঙ্গল ঘটনাক্রম। ইতিমধ্যে হালাকু খান ইরানে প্রতিষ্ঠিত করেছে ইল খানদের রাজত্ব। ধর্মীয় ব্যাপারে হালাকু খান ও তার পরবর্তীরা ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। ১২৯৪ খৃস্টাব্দে কুবলাই খানের মৃত্যুর পর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হল বৌদ্ধ ধর্ম, আর অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষ করে ইরানের, ইল খানেরা ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে গেল। বিশাল মোঙ্গল অধিকারের এই মুসলিম অধ্যুষিত অংশেরই অন্যতম কৃতী পুরুষ তুর্কী বীর তৈমুর লং। আর তারই অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, মাতৃকুলের দিক থেকে চেঙ্গিস খানের রক্তবাহী, ভারতবর্ষে মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বাবর।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এই সম্প্রদায়গুলো ছিল বিশাল ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত। পরিচয়ে চিন্তা-চেতনায় এসব বহিরাগত সম্প্রদায়ের একক কোন সাধারণ সম্প্রদায়ে পরিণত হওয়ার পথে অন্তরায়ও ছিল একাধিক। প্রথমেই আসে এই উপমহাদেশের বিশালত্বজনিত অন্তরায়ের কথা। সেসব দিনে আজকের মত যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন উন্নতি হয় নি যাতে করে দুরবর্তী স্থানে বাস করেও মুসলিম সম্প্রদায়গুলো চিন্তা চেতনায় এক সম্প্রদায়ভুক্ত বলে নিজেদের মনে করতে পারত, একই চিন্তাধারায় পরিচালিত হতে পারত। তাছাড়া, সব সম্প্রদায়ের লোক একই স্থান থেকে বহিরাগত হয়ে একই সময়ে উপমহাদেশে বসবাস করতে আসেনি। বিভিন্ন ভাষাভাষী দেশের, বিভিন্ন জাতি সত্তার লোক বিভিন্ন সময়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে এই ভারতবর্ষে এসেছে। তাদের অতীত জীবন বিশ্বাসও এক ছিল না। এমন কি, ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরও বিভিন্ন ফেরকার অন্তর্ভুক্ত ছিল তারা। ইসলামের অনুসারী হয়েও তাই বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায় চিন্তা-চেতনায়ও অনেকটা বিভিন্নই থেকে গেল। এমনি অবস্থায় অমুসলিমদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এসব মুসলিম সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায়ও ভীত থাকত।

সেই ভীতি অনেকটা কেটে গেল তখন যখন এই উপমহাদেশে মুসলিম শাসন

সুপ্রতিষ্ঠিত হল; তাদের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকল। তবুও, মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিরাপত্তাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এ কথা বলা যায় না। আর এ জন্যই মুসলিম শাসকদের চিন্তা-বিবেচনায় একটা সতর্কতার প্রয়োজন সব সময়ই থেকে গিয়েছিল। হিন্দুদের সঙ্গে আকবরের ক্ষমতার ভাগাভাগি এবং সমভাবে সরকারে মুসলিম উপাদানের ঘাটতিতে প্রথম আলমগীরের দুশ্চিন্তা একই নিরাপত্তাহীনতাবোধ থেকে উদ্ভূত। মুসলিম সাম্রাজ্যটি বিশাল ও পরাক্রান্ত ছিল ঠিকই, কিন্তু তার শক্তিকে কি চ্যালেঞ্জ করা যেত না? অতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনপদে এমনি কোন দুশ্চিন্তা তার জনসাধারণকে চিন্তা পীড়িত করে না, কারণ সেখানে অভ্যন্তরীণ আন্দোলনের ফলে তাদের অমুসলিম শাসনের অধীনে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না; শুধুমাত্র বৈদেশিক আক্রমণাশঙ্কার মুখেই তাদের ভয় জাগ্রত হওয়ার কথা।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের নিরাপত্তা ভীতি বহিঃশত্রুর দিক থেকে যতটুকু না ছিল তার চাইতে বেশি ছিল অন্তঃশত্রুর দিক থেকে। প্রকৃত প্রস্তাবে, সুদীর্ঘকালের মুসলিম শাসনামলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হয়েছিল দুইবারঃ একবার, মোঙ্গলদের ভারত আক্রমণ প্রয়াসকালে; দ্বিতীয়বার, ইংরেজদের আক্রমণ কালে। প্রথমবারের আক্রমণাশঙ্কা অল্পের মধ্যেই দূর হয়ে যায়; আর দ্বিতীয়বারের দীর্ঘ চাতুর্যপূর্ণ আক্রমণে তো এই উপমহাদেশ থেকে মুসলিম শাসনের অবসানই হয়ে যায়। কিন্তু এই সুদীর্ঘ শাসনামলে মুসলিম শাসকদের এবং তারই সঙ্গে এই উপমহাদেশীয় মুসলমানদের সদা আশঙ্কা হিসাবে বিদ্যমান ছিল ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের বিদ্রোহের আশঙ্কা। বিভিন্ন সময়ে বহির্দেশীয় মুসলিম অভিযানকারীদের দ্বারা কোথাও কোথাও ক্ষমতা দখলকে ঠিক সর্বনাশা ভীতির চোখে দেখা হত না; অভিযানকারীরা মুসলিম বলে তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিকারক শত্রু হিসাবে ভাবা হত না। দৃষ্টান্ত হিসাবে মুঘল বনাম আফগানদের সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সংঘর্ষে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা মোটামুটিভাবে ছিল নিরপেক্ষ। তাদের আকাঙ্খা ছিল একটা সুদক্ষ সৎ সরকারের জন্য; সেই লক্ষ্যে দিল্লীর মসনদে মুঘলরাই উপবিষ্ট হোক অথবা আফগানেরা একটা মুসলিম সরকারের সৎ শাসন কায়েম হলেই হল।

কিন্তু যখনই ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা দেখল, একটা হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প নিয়ে মারাঠারা দিল্লীকেন্দ্রিক দুর্বল মুসলিম মুঘল শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য অভিযান চালিয়েছে, তখনই মুসলমানদের সর্বরকম স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা তখনকার আফগান প্রধান আহমদ শাহ্ আবদালীকে আমন্ত্রণ জানাল মুঘল শক্তিকে সাহায্য করার জন্য। লক্ষণীয় যে, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের বিরুদ্ধে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন অযোধ্যার শিয়া মতাবলম্বী নবাব শুজাউদ্দীন এবং সুন্নী মতাবলম্বী রোহিলা প্রধান নজিবুদ্দৌলাহ একসঙ্গে মিলিত হয়ে আফগানিস্তানের শাসনকর্তা আহমদ শাহ আবদালীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন। সে সময়ের জন্য রক্ষা পেয়েছে দিল্লীকেন্দ্রিক মুঘল শক্তির মর্যাদা।

'বহির্দেশীয় মুসলিম অভিযানকারী ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের শত্রু নয়'-এই মতের ব্যতিক্রম ঘটেছিল তাইমুর ও নাদির শাহ্র ভারত অভিযানের ক্ষেত্রে। এই অভিযানকারীদেরকে শত্রুই মনে করেছিল ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা। এমনটি মনে করার কারণ, উভয়ের আক্রমণের ফলে ভারতের শাসক শক্তির মর্যাদাহানি ও বিপর্যয় সাধিত হয়েছিল। কিন্তু এই অভিযানকারীরা যদি ক্ষমতা দখল করে এই উপমহাদেশে

বসবাস করত, তাহলে তাদেরকে শত্রু ভাবার কোন সঙ্গত কারণ থাকত না। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখিঃ সেই তাইমুরের বংশধরেরা পরবর্তীতে ভারতবর্ষের একাংশে ক্ষমতা দখল করে এখানেই বসবাস করছে, এদেশকেই জন্মভূমি স্বদেশ করে নিয়েছে; এবং এসব করছে যখন, তখনই তারা শুধুমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারা সমর্থিতই হয় নি, গৌরবের আসনেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মুসলিম শাসনামলেও ভারতীয় মুসলমানেরা তাদের 'মুসলিম' পরিচয় নিয়ে ভয়-ভীতি সহকারেই তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় মনোযোগী ছিল। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারেঃ এই উপমহাদেশের সমগ্র মুসলমান জনগোষ্ঠীই কি তাদের নতুন জন্মভূমিকে পরদেশ ভেবেই সেখানে বসবাস করে আসছিল? তাদের মনে জাতীয়তাবোধ বলতে কিছুই ছিল না তখন?

আজকের দিনে সুসংজ্ঞায়িত জাতীয়তাবাদের যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার কোন অস্তিত্ব সে সময়ে ছিল না। তাই আজকের জাতীয়তাবাদের নিরিখে তখনকার ভারতীয় মুসলিম মানসের বিচার করা যাবে না। ভারতীয় বামপন্থী সমাজবাদী লেখক সুপ্রকাশ রায় এর কথায়, 'সমগ্র ভারতবর্ষ পূর্বে কখনই একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ ও জাতিরূপে গড়িয়া উঠে নাই। সেই কার্য মোগল শাসনকালে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই ঐক্য ছিল কেবলমাত্র সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিগত প্রশ্ন বাদ দিলেও তখন ভারতবর্ষ ছিল রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে শত খণ্ডে বিচ্ছিন্ন একটা বিশাল ভূখণ্ডমাত্র। এই বিশাল ভূখণ্ড ছিল বহু গোষ্ঠী বহু ভাষা বহু ধর্ম এবং বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতি ও চেতনায় বিভক্ত"। (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুপ্রকাশ রায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭২, পৃঃ ৩)।

শুধু ভারতবর্ষে কেন, এর আগে সারা পৃথিবীতেই যখন এমনি রাষ্ট্রীয় অবস্থা, তখন সকল কুপ্রথা কলহ অবিচার জুলুম পাপাচারে নিমগ্ন আরব সমাজে জ্বলে উঠল তওহীদের আলো। বিপ্লবাত্মক ইসলামের পতাকা উড্ডীন হল আকাশে। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হল মানব মুক্তির লক্ষ্যাভিসারী এক সাধারণতন্ত্র। অতি অল্পকালের মধ্যে এই সাধারণতন্ত্রের বিস্তৃত সীমানার অন্তর্ভুক্ত হল সমগ্র আরব, সিরিয়া, ইরাক, পারশ্য, আরমেনিয়া, সাইপ্রাস দ্বীপ এবং উত্তর আফ্রিকার এক বিরাট অংশ। অতঃপর প্রথমে উমাইয়া"ও পরে আব্বাসীয় 'খলিফাদের' শাসনামলে আরব সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হল রাজতন্ত্র। উমাইয়া রাজবংশের ৯০ বছরের শাসনামলে আরব সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে; তার অন্তর্ভুক্ত হয় উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম সীমা আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত গোটা এলাকা, ইউরোপের স্পেন ও ফ্রান্সের দক্ষিণ পূর্ব অংশ, পূর্বে ভারতবর্ষের সিন্ধু মুলতান, মধ্যএশিয়ার ফারগানা ও খাওয়ারিযম এবং উত্তরে এশিয়া মাইনরের পূর্ব দক্ষিণ অংশ। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের প্রবর্তন করেছিলেন যারা, নবীজি (সাঃ) প্রদর্শিত ও খোলাফায়ে রাশেদার অনুসৃত ইসলামী খেলাফতের আদর্শ ও রূপরেখা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কালপ্রবাহে ক্রমেই পরোক্ষ থেকে পরোক্ষতর এবং শ্রুতিনির্ভর হয়ে উঠেছিল। তারা সবাই পরিচিত ছিলেন মুসলিম রাজতন্ত্রের সাথে।

অন্য কথায়, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের প্রবর্তন করলেন যারা, তারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন রাজতন্ত্রের এক নবতর রূপে, রাজতন্ত্রের কাঠামোয় সমন্বিত করা ইসলামী আইন কানুন ও বিধি বিধান সম্বলিত এক রাষ্ট্রব্যবস্থায়, এবং তারই প্রভাবে সৃষ্ট এক

সমাজ ব্যবস্থা ও এক মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠায়। প্রকৃত ইসলামের আদর্শে গঠিতব্য সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের লক্ষ্যাভিসারী আন্তর্জাতিক ইসলামী 'ইসলামী উম্মা'র যে ধারণা আমাদের রয়েছে, তার থেকে বহু দূরে অবস্থান নিয়ে সেখানে গড়ে উঠল এক 'মুসলিম উম্মা'র ভারতীয় শাখা, গোষ্ঠী অনৈক্যের সঙ্কীর্ণতায় যা ছিল অনেকাংশে দুর্বল। তবুও কালপ্রবাহে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জীবনধর্মিতায় বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ক্রমে তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ধারায় গড়ে ওঠে সমন্বিত সাদৃশ্য, তাই তাদেরকে এক জাতীয়তাবোধের ধারণায় উদ্বুদ্ধ করে। এই সমন্বিত ইন্দো মুসলিম সংস্কৃতি মুলত ইসলামভিত্তিক হলেও প্রধানত তার পরিচয়ে সমুজ্জ্বল ছিল ইসলাম অনুপ্রাণিত মধ্যএশীয় বৈশিষ্ট্য। স্থানীয় সংস্কৃতির অবদান গ্রহণ করেও তার নিজের স্বাতন্ত্র্যে তা হয়ে উঠল বিশিষ্ট। এই উপমহাদেশের মুসলমানেরা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়কে বিলীন হয়ে যেতে না দেওয়ার জন্য ছিল স্থিরসংকল্প। সেই লক্ষ্যে চালিয়ে গেছে তারা সজ্ঞান প্রয়াস। তারা জানত, যুগে যুগে ভারতীয় হিন্দুবাদ নিজের মধ্যে বিলীন করে নিয়েছে অনেক বিদেশী জনগোষ্ঠীকে এবং হিন্দুবাদের এই প্রচণ্ড হজম শক্তিকে লক্ষ্য রেখেই ভারতীয় মুসলমানেরা থেকেছে সদা-সতর্ক এবং চালিয়ে গেছে সতত প্রয়াস। এমনি এক স্থির সংকল্প সতত প্রয়াসই তাদের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যকে সাদৃশ্যমুখী একীকরণের শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। পরিণামে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শের সহযোগী পৃথক এক বিশিষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি হিসাবে। জাতিত্ব চেতনার এই পরিচয় নিয়েই ভারতের মুসলমানেরা এদেশকে স্বদেশ মনে করেই এখানে বসবাস করে এসেছে। তারা যেন ছিল দুটি জগতের বাসিন্দা; একটি সরাসরি তাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎ এবং অন্যটি তাদের অনুপ্রেরণা উৎসের জগৎ যা টিকিয়ে রাখত তাদের আত্মিক অস্তিত্বকে। এটাই তাদেরকে দান করেছে মনোগত ও আবেগসঞ্জাত এক অনুভূতি যা ইতিহাসের সমগ্রকালে নির্দেশিত করেছে তাদের আচরণকে।

এমনি এক জাতিত্ব চেতনাবিশিষ্ট হয়ে ভারতীয় মুসলমানেরা বসবাস করে আসছিল তাদের পাশাপাশি যারা পূর্বেকার বহিরাগত আর্যদের নেতৃত্বে সংগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শক হুন প্রভৃতি বহিরাগত জনগোষ্ঠী এবং ভারতীয় আদি জনগোষ্ঠী নিয়ে 'হিন্দু' নামে অভিহিত ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, বহুকাল আগে থেকেই 'হিন্দ' শব্দের পরবর্তী আহৃত রূপ 'হিন্দু' এর অর্থাৎ ভারতবর্ষের অধিবাসী হিসাবেই 'হিন্দু'বাদের পরিচিতিমূলক ব্যবহার। বহিরাগত আর্যরা ভারতবর্ষে "..... এসে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে ধর্মরাজ্যপাশে, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বেঁধে দিল। ভারতবর্ষে তারা বৈদিক ধর্ম, দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র ও সুক্ত নিয়ে এল। তারা নিজেদের যে সংস্কৃতি আনল, তাতে বাবিল ও আসুরীয় ও ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল।

শতাব্দীর বিরোধ আর মিলনের ভেতর দিয়ে আর্যভাষী নর্ডিকেরা এক সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলল। এই সমন্বিত জনের নাম ভারতীয় জন। বেদ ব্রাহ্মণের ধর্মের সঙ্গে পূর্বতন বিচিত্র বিভিন্ন ধর্মের আদর্শ আচার, অনুষ্ঠান সব মিলেমিশে এক নতুন ধর্ম গড়ে উঠল- পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। বিচিত্র পূর্বতন সভ্যতার উপাদান উপকরণ অঙ্গীভূত করে নতুন সমন্বিত সভ্যতা গড়ে উঠল- ভারতীয় সভ্যতা। পূর্বতন জনসংস্কৃতির সৃষ্টি-পুরাণ, দেবতাবাদ, ভয়-বিশ্বাস, ভাব-কল্পনা, স্বভাব-প্রকৃতি, ইতিকথা, ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বেদ-ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি মিলে মিশে গড়ে উঠল ভারতীয়

সংস্কৃতি। এই সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মনীড় হল উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশ"। (বাঙালীর ইতিহাস, সংক্ষেপে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এর বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)' সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৬০ পৃঃ ১৬)। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত ও পরিচালিত এই যে সমন্বিত ধর্ম, তাকেই সাধারণভাবে অভিহিত করা হল 'হিন্দুধর্ম' বলে; এই 'হিন্দুধর্ম' থেকেই 'হিন্দুবাদ'।

স্বর্ণদিনের অবসানকালে বাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত হিন্দুবাদের যথাসাধ্য প্রয়াস ছিল- তাদের মৌলিক ব্রাহ্মণ্যবাদী আদর্শকে বাঁচিয়ে অন্যান্যদের 'বিরুক্তকর' মতবাদগুলোর বিধানাবলী বৈরী প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর সঙ্গে কোন রকম সমন্বয় সাধন করে হিন্দুবাদকে কালে কালে রক্ষা করে যাওয়া; সঙ্গে সঙ্গে সেসব মতবাদীদের মধ্যেকার অনৈক্য সৃষ্টিকারীদেরকে নিজেদের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে অনুসারীদের তাদেরকে সমন্বয়ের নামে নিজের মধ্যে গ্রাস করে নেওয়া। বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের বেলায় সফল হলেও ইসলাম অনুসারীদের বেলায় হিন্দুবাদের সাফল্যের পরিমাণ সামান্য। এর কারণ, বহু উপাস্যবাদী হিন্দুবাদের সঙ্গে তওহীদভিত্তিক ইসলামের ছিল মৌলিক পার্থক্য। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাস্তবতায় ইসলাম অনুসারীরা প্রকৃত বিপ্লবী ইসলাম থেকে অনেকখানি সরে গেলেও ইসলামের মৌলিক আদর্শ যে তওহীদবাদ তার থেকে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা কখনো সরে যায় নি। তাই হিন্দুবাদীদের সঙ্গে তওহীদবাদীদের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াল এক মোকাবিলাকারী সম্পর্ক।

হিন্দুবাদ ছিল না আদিম স্তরের চেতনাভিত্তিক কোন জীবন ব্যবস্থা যা উন্নততর কোন জীবন দর্শনের প্রভাবে উৎকর্ষ লাভের আশায় ছিল অপেক্ষমান। তার জ্ঞান ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল বহু শতাব্দী ধরে সাধনালব্ধ মনীষার অর্জন যার অবদানের উজ্জ্বল আলোয় হেসে উঠেছিল তার এককালের সুবর্ণ সময়। কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাও ছিল একাধিক যার জন্য সেই সুবর্ণ সময়ের অবসান লগ্নে এই উপমহাদেশে শক হুন প্রভৃতি বিদেশাগত শক্তির প্রতিষ্ঠাকে প্রতিরোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়নি অবশেষে আগত মুসলিম শক্তির প্রতিষ্ঠাকে প্রতিরোধ করা। অতি সূক্ষ্ম ও জটিল এক জীবন দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে জনসাধারণের স্তরে হিন্দুবাদের ছিল না সেই আবেগ যা একটি জীবন বিধানকে প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী করে তুলতে পারত। হিন্দুবাদের সে সময়কার জীবন বিধান জনসাধারণকে প্রাণহীন সংস্কারের পথেই বেশি করে চালিত করেছিল। তদুপরি ছিল তার বর্ণবিভাগ যার পথ ধরে এসেছিল জন বিভক্তি আর সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণ্যবাদ। পরিণামে দেখা গিয়েছিল জৈন ও বৌদ্ধ মতাবাদীদের বিদ্রোহ। ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডিসের কথায় " Both sects in their attitude to caste caused a social revolution but this was incidental to the teachings of the two Masters, for both claimed no break with Aryan tradition--only a new way to liberation. উভয় সম্প্রদায়ই বর্ণ সম্পর্কিত তাদের মনোভাবে এক সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছিল, কিন্তু তা ছিল দুই গুরুরই উপদেশাবলীর প্রাসঙ্গিক ঘটনা মাত্র; কারণ তাদের উভয়ই আর্য-ঐতিহ্য থেকে কোন বিচ্ছিন্নতা দাবী করেনি, দাবী করেছিলেন মুক্তির এক নতুন উপায়"। (A History of India, Michael Edwarded, 1976, p.32)

এ সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথ রায় এর মন্তব্য ঃ "ভারতে বৌদ্ধ বিপ্লবের পরাজয় ঘটেনি বরং তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই তা ব্যর্থ হয়েছে। সেই বিপ্লবকে জয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজশক্তি তেমনভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। তার ফল

হলো এই যে, বৌদ্ধ মতবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেশ অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক অত্যাচার, বিচারবুদ্ধির স্বেচ্ছাচারিতা আর আধ্যাত্মিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডুবে গেলো। বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র সমাজ তখন ধ্বংস ও বিলুপ্তির ভয়াবহ কবলে পড়ে গেছে। এরই জন্য নিপীড়িত জনগণ ইসলামের পতাকার নীচে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো আর ইসলামও রাজনৈতিক সমানাধিকার না হোক, অন্তত তাদের সামাজিক সমানাধিকার দিলো"। (The Historical Role of Islam এর অনুবাদ .... ইত্যাদি পৃঃ ৯৬-৯৭)।

হিন্দুবাদ ও হিন্দু সমাজের এমনি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইসলামের মানবিক উদারতা ও সামাজিক সাম্য এবং সর্বোপরি বিভিন্ন বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে মানুষের সামগ্রিক মুক্তির আবেগ এই উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাকে সহজতর করে তুলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ ও স্বীকার করতে হবে যে, হিন্দুবাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলোর জন্য ইসলাম অনুসারীদের সামগ্রিক বিজয়ের যে সুযোগ বিদ্যমান ছিল তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি সে সময়কার মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরেই বিরাজমান কতগুলো দুর্বলতার জন্য। দুর্বলতাগুলোর উৎস নিহিত ছিল রাজতন্ত্রী ইসলামের প্রতিষ্ঠার মধ্যে এবং তারই প্রভাবক্লিষ্ট মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় নেতৃত্বের ভেতরকার মতপার্থক্যের স্বাভাবিকতায়। ভারতবর্ষীয় মুসলিম সমাজ তখন শিয়া-সুন্নী-খারিজী প্রভৃতি এবং সেসব ফেরকার উপ-ফেরকায় বিভক্ত ছিল। সর্বোপরি, মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সামগ্রিকভাবে আবার শুদ্ধাচারী গোড়াপন্থী এবং অ-গোড়াপন্থী এই দুই ভাগে বিভক্ত। ধর্মীয় নেতৃত্বের এই যে বিভক্তি, এই যে ফেরকাবাজী তার সুযোগ নিত রাজতন্ত্রী মুসলিম শাসকেরা, এই উপমহাদেশীয় সুলতান সম্রাটেরা। নিতে হত তাদের রাজতন্ত্রী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই।

পরিশেষে বলা যায়, বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে-বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে যে মুসলিম সমাজ বা জাতি, সামগ্রিকভাবে তার শক্তি সামর্থ মোটেই আশানুরূপ ছিল না। প্রকৃত ইসলামের যে বিপ্লবী প্রাণশক্তি এই জাতিটিকে একীভূত এক বিরাট শক্তিতে পরিণত করতে পারত, তার দুঃখজনক অভাবই বিরাজমান ছিল সমগ্র জাতির চিন্তা চেতনায়। সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মুঘলদের যে মুসলিম শাসন তা ইসলামী আদর্শে যতটা না অনুপ্রাণিত ছিল, তার চাইতে বেশি অনুপ্রাণিত ছিল রাজতন্ত্রীয় আদর্শে। ফলে, সেই সামরিক শক্তির ভাটার কালে সর্ব রকম দুর্যোগ নেমে এসেছিল মুসলিম শাসকদের মত সমগ্র মুসলিম জাতির ভাগ্যেও।

এখানে উল্লেখ্য যে, স্বজাতির এমনি করুণ অবস্থার কথা উপলব্ধি করেই মুজাদ্দিদ আলফ সানির ভাবশিষ্য মাওলানা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রঃ) সমাজের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তথাকথিত বাদশা সম্রাটদের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে প্রকৃত ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে সমগ্র মুসলিম জাতিকে। সেই-ই ছিল আরম্ভ; জাতির ভাগ্যে সুবহে সাদিকের প্রত্যাশিত মুহূর্ত তখনও যে অন্ধকারে ঢাকা!!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরাক্রান্তের পতন-কথা

সুলতান-খলিফা-সম্রাট এই শব্দগুলোর কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আরব সাম্রাজ্যে যখন রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রচলন হল, তখনও মুসলিম বাদশাদের বাহ্যিক পরিচয়ে থাকত 'খলিফা' শব্দের আবরণ। প্রকৃত খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যখন সুদূর কল্পনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, তখন আরব সাম্রাজ্যের তথা মুসলিম জাহানের জনসাধারণও এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য হল। সঙ্গে সঙ্গে নবরূপী 'খলিফারাও' জেনে রাখলেন যে, ইসলামের নবীজি (সাঃ) প্রদর্শিত ও খোলাফায়ে রাশেদা অনুসৃত সেই খেলাফতের স্বপ্ন মুসলিম উম্মার মন ও মানস থেকে একেবারে মুছে যায় নি। তাই যথাসম্ভব সেই ইসলামের রাজতন্ত্রীয় অনুসারী সেজেই মসনদ রক্ষার তাগিদ তারা অনুভব করেছিলেন। তাই তাদের উপাধি-পরিচয়ে ছিল 'খলিফা'র আবরণ। আরব সাম্রাজ্য যখন ব্যাপ্তিতে আরব-আযম ছাড়িয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যে পরিণত হল এবং 'খলিফাদের' প্রত্যক্ষ শাসন সামর্থ্য যখন অক্ষমতার গ্লানিতে ম্রিয়মান হয়ে পড়ল, তখনই মুসলিম সাম্রাজ্যের নানা দেশে ঘটল 'সুলতানদের' উদ্ভব। নিজ নিজ রাজ্য রক্ষায় সুলতানেরা প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন স্বাধীন কিন্তু লোকদেখানোভাবে তারা প্রকাশ করতেন মুসলিম জাহানের কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতীক 'খলিফা'র আনুগত্য। ভারতবর্ষে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই 'সুলতানদের' মাধ্যমেই। এই রীতিটা চলে আসছিল মুঘলদের ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত। মুঘলরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতবর্ষ থেকে এই রীতিটাও উঠে গেল। তারা পরিচিত হয়ে উঠলেন বাদশাহ বা সম্রাট বলে। কিন্তু মসনদ রক্ষার লক্ষ্যে এই বাদশাহ বা সম্রাটরাও সুলতানদের মত মুসলিম জনসাধারণকে ইসলামের নামে ভুলিয়ে রাখার প্রয়োজনটা স্মরণে রাখতেন। পারতপক্ষে ধর্মীয় নেতৃত্বের স্পর্শকাতরতায় হাত দিতেন না; তবে পরোক্ষভাবে সেই নেতৃত্বকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতেও পিছপা হতেন না কোন সময়ই। তার ফলে স্বল্পকালীন স্বার্থসিদ্ধির সুবিধাটা মুসলিম রাজশক্তি ভোগ করত ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘকালীন ক্ষতিটা জমা হত রাজশক্তি ও মুসলিম জনসাধারণ নির্বিশেষে সমগ্র মুসলিম জাতির ভাগ্যের আধারে।

শিয়া-সুন্নী-খারিজী প্রভৃতি ফেরকা বিরোধ ছাড়াও গোঁড়াপন্থী ও অ-গোঁড়াপন্থী বিরোধে সবচেয়ে ক্ষতিকারক কলহের সৃষ্টি হয় মুসলিম সমাজে সুফীবাদের নামে ভাববাদী এক উপ-সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কারণে। 'ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব'দের মধ্যে সুফীদের সম্পর্কে মতামত গঠনের ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে এজন্য যে, এই সুফীদেরকে কেন্দ্র করেই 'অ-গোঁড়াপন্থী' ফেরকার বিস্তৃতি ঘটেছিল। এবং তার পরিণামে তাদের মধ্যে এসেছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাত, এসেছিল রাজশক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ। তাতে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতীয় মুসলিম সমাজ।

'তাসাউফ' শব্দ থেকেই সুফী শব্দটা এসেছে। তাসাউফ হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের আশায় বন্ধুর পথ পরিক্রমার এক প্রক্রিয়া। এ পথের পথিক যাঁরা তাঁদেরকেই বলা হয় সুফী। ইসলাম তাসাউফকে অনুমোদন দিয়েছে। বস্তুত ইসলামে আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি দিক রয়েছে যাকে দুটি স্তরও বলা যায়। তার একটি হচ্ছে শরিয়াত, অপরটি মা'রেফাত। শরিয়াত হচ্ছে তার

ব্যবহারিক দিক, তার বহিরঙ্গ রূপ; আর মা'রেফাত তার আধ্যাত্মিক দিক, তার অন্তরঙ্গ রূপ। শরিয়াতকে ভিত্তি করে তার উপর দাঁড়িয়েই মা'রেফাতের স্তরে উপনীত হতে হয়। এটা এক অনুশীলননির্ভর পথ পরিক্রমা। এ পথ পরিক্রমায় স্তরের পর স্তর পেরিয়ে শরিয়াতের উপর দাঁড়িয়ে, তরিকত, হকিকত, অতঃপর মা'রেফাতের স্তরে উন্নীত হতে হয়। মা'রেফাতের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান লাভ করা, জানা। এ জানায় বিশ্বকে জানা যায়, এ জানায় নিজেকে জানা যায়, এ জানায় পরম সত্তা আল্লাহকে জানা যায়। জ্ঞান লাভের অর্থে যে মা'রেফাত সে জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, সে জ্ঞানই সকল জ্ঞানের সমন্বিত জ্ঞান। এই জ্ঞানের সাহায্যে যে জানা, সে জানাই প্রকৃত জানা। এই পুরা ব্যাপারটিই তাসাউফ।

তাসাউফের পথে যিনি এগিয়ে যেতে চাইবেন, তাঁর জন্য শরীয়াতের পূর্ণ জ্ঞান ও অনুশীলন এক অতি আবশ্যিক শর্ত। এ শর্ত পূরণ না করে কেউ তাসাউফের পথে অগ্রসর হতে পারে না। শুধুমাত্র জ্ঞান আহরণ ও জানার প্রয়াস নয়, কঠোর অনুশীলনও এ শর্তের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃত সুফীকে একাধারে শরীয়াত ও মা'রেফাতের পা'বন্দ হতে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, ভারতবর্ষে সুফীদের মধ্যে অনেকেই এ শর্ত পালন করতেন না। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা শরিয়াত বিরোধী ভাবধারার উদ্ভব ঘটাতেন। আর এ নিয়েই আরম্ভ হয় গোঁড়াপন্থী ও অ-গোঁড়াপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে প্রথম থেকেই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ রাজকীয় স্বীকৃতি অনুসারেই মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নিয়ন্ত্রক হিসাবে নিয়োজিত হতেন। কেন্দ্রীয় শাহী দরবার থেকে আরম্ভ করে নিম্নতর প্রশাসনিক স্তরসমূহেও নানা পর্যায়ের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নিয়োজিত হয়ে ইসলাম সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও আচার-বিচারের দায়িত্ব পালন করতেন। অন্যদিকে, দেশের মুসলিম জনসাধারণে্য যথেষ্ট প্রভাব ও জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন সূফীবৃন্দ। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায় যে, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সূফীবৃন্দ উভয়ের মধ্যেই অনুদার ও গোলমেলে লোকের অভাব ছিল না যার ফলে উভয় শ্রেণীর মধ্যে অনৈক্যের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এক সময়ে সে অনৈক্য সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করল। এবং পরিণামে এই অনৈক্য, এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যথেষ্ট ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াল শুধুমাত্র মুসলিম জনসাধারণ বা মুসলিম রাজন্যবর্গের জন্যই নয়, ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াল রাজন্যবর্গ জনসাধারণ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্যই। গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় নেতৃত্ব ও অ-গোঁড়াপন্থী সুফী নেতৃত্বের এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সঙ্গে শিয়া-সুন্নী খারিজীদের অনৈক্য সমস্যা যুক্ত হয়ে কালক্রমে বিরাট এক আত্মঘাতী সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যা মানুষের চেতনার গভীরে প্রোথিত থাকে। প্রকৃতিগতভাবে তা যতটা না যুক্তিগ্রাহ্য, তার চাইতে বেশি অনুভবগ্রাহ্য। ধর্মের জন্য প্রকৃত প্রেরণা জন্ম নেয় আবেগাপ্লুত এক আকাঙ্খার মাধ্যমে। তাই সকল আস্তিক্যবাদী ধর্মই এমন সব ভক্তের সৃষ্টি করে যারা অতীন্দ্রিয়তার মধ্যেই খুজে পায় হৃদয়ের সান্ত্বনা ও শান্তি। এই অতীন্দ্রিয় জগৎই সুফী দরবেশগণের ধ্যানের জগৎ। এবং অতীন্দ্রিয় জগতের পথিক বলেই মত ও পথ-ভ্রান্তির সম্ভাবনা তাদের কিছুটা বেশি বৈকি। এই ভ্রান্তি থেকেই শেষ পর্যন্ত কোন কোন সুফী দরবেশ ধর্মবিরোধী বলেও অভিহিত হতে পারেন।

সাধনার মাধ্যমে সুফীরা আল্লাহ প্রেমে বিলীন হয়ে যেতে চান এবং সর্বশেষ পর্যায়ে আল্লাহর দীদার লাভের আশায় তাদের সকল প্রয়াস নিয়োজিত করেন। এটা একটা দেহাতীত প্রক্রিয়া, আধ্যাত্মিক অর্থে আবেগসঞ্জাত চেতনায়ই শুধু তা সম্ভব। এই

চেতনা বা বোধের তীব্রতায় সুফীরা এই বিশ্বনিখিলের সকল সৃষ্টির সঙ্গেই আল্লাহ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে চান; প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতির গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে চান না। এবং এ জন্যই প্রচলিত অর্থে যে ধর্মীয় রূপ, তার সঙ্গে বিরোধিতার উদ্ভব ঘটে। যে সুফী এ ব্যাপারে সমধিক সচেতন ও বিজ্ঞ, এই বিরোধিতার সম্ভাবনাকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন; প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতিকে অশ্রদ্ধা না দেখিয়েই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হন। সুফীরা সাধারণত ধর্মের বহিরঙ্গের চাইতে তার অন্তরঙ্গ রূপের উপর জোর দেন বেশি। আলোচ্য সময়ে সমধিক সচেতন ও বিজ্ঞ সুফীবৃন্দ ধর্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপের সমন্বয় সাধনে নিয়োজিত ছিলেন; কিন্তু কেউ কেউ বহিরঙ্গ রূপকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে অন্তরঙ্গ রূপ নিয়েই নিমগ্ন থাকতেন। আর এটা ধর্মবিরোধী বলে অভিহিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তদুপরি, এ পথের পথিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত ছিল না। কেউ কেউ ইসলামের বহিরঙ্গকে মানতেই চাইতেন না; তারা ছিলেন অদ্বৈতবাদের সমর্থক। আর এই অদ্বৈতবাদের রন্ধ্রপথেই অমুসলিম অদ্বৈতবাদীদের খুবই কাছাকাছি এসে যেতেন তারা। অদ্বৈতবাদের বেদোদ্ভূত ধারণা সুফীদের অদ্বৈতবাদী ধারণার সঙ্গে মিল খুজতে গিয়ে, কোন কোন দলের ধারণায়, তা পেয়েওছিল। হিন্দুদের সংস্পর্শে আসার দরুণ এবং মধ্যএশিয়া ও তার আশেপাশের জনপদে ইসলাম বিস্তারের কালে সেখানে বিদ্যমান বৌদ্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচয়ও ঘটেছিল।

এমনি পরিস্থিতিতে কখনও শাসকদের গৃহীত ভূমিকা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুঘল সম্রাট আকবর ও সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকোর নাম উল্লেখ করা যায়। তাদের মতামত গৃহীত ব্যবস্থা ধর্মতাত্ত্বিকদের বিবেচনায় ইসলামের সমূহ ক্ষতিই করেছে। সম্রাট আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহীর কথা সকলেরই জানা আছে। পরবর্তীতে শাহজাদা দারাশিকো ও আকবর প্রবর্তিত এই মতের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তার রচিত 'মাজমু-উল-বাহরাইন' গ্রন্থের ভূমিকায় এর স্বীকৃতি রয়েছে।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের প্রকৃতি-পরিচয়ে এটা ধরা পড়বে যে সিন্ধু-মুলতান অধিকারের সময় থেকে আরম্ভ করে মুঘল আমলের বাবর-হুমায়ুনের শাসনকাল পর্যন্ত শাসন-প্রকৃতির যে পরিচয়, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে সম্রাট আকবরের সময় থেকে। সম্রাট আকবরই 'মুসলিম শাসনের' সমার্থক 'মুঘল শাসনের' ধরণ গভীরভাবে বদলে দিয়েছিলেন। আকবর-পূর্ববর্তী সুলতানী শাসন ও বাবর-হুমায়ুনের মুঘল শাসনামলেও রাজপুরুষেরা আইনকানুন প্রণয়নে ইসলামী বিধানকে অমান্য করতেন না। ওই আমলের প্রশাসন-নীতিতে যে ধারণাটা প্রাধান্য পেয়েছিল তা ছিল এই যে, চাপের মুখে অ-ন্যায্য দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে বিজিতদের সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে নয়, বরং ন্যায়ভিত্তিক ধর্ম-বর্ণ-বিজিত-বিজয়ী নির্বিশেষে সমদৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সুশাসনই কেবল বিজিতদেরও বিপুলাংশকে সরকারের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন করে তুলতে পারে। এ নীতিই মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেছিলেন সুলতানী আমলের শাসন কর্তৃপক্ষ, এবং বাবর হুমায়ুনের শাসনামলেও এ নীতির অন্যথা হয়নি। তারা এ দেশের কৃষি ব্যবস্থায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যথাযোগ্য সুযোগ সুবিধা দান করে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে অমুসলিমদের নিয়োগের নীতি প্রচলন করেছিলেন। আর এভাবেই অমুসলিমদের মধ্যে থেকে একটি রাজানুগ্রহীত আমলা অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি করে অধিকাংশ দেশবাসীর আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু আকবরের সময়

থেকেই তা যথেষ্ট রকমে বদলে গেল। রাজপুত কন্যাদের সঙ্গে আকবর মুঘল সম্রাট ও শাহজাদাদের বিবাহের রীতি প্রবর্তিত করলেন, তাতে শরিয়াতের বিধান পালনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হল। হিন্দু রাজপুত কন্যারা বিবাহের পরেও নিজ ধর্ম পালন করতেন। তদুপরি, হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রয়াসরূপী এসব বিবাহ শুধুমাত্র শাহী পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল, আমীর ওমরাহ বা অন্যদের মধ্যে তা সংঘটিত হতে পারত না। রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারেও ইসলামী রীতিনীতিকে প্রাধান্য দেওয়ার রেওয়াজও বন্ধ হয়ে গেল। এক কথায়, আকবরের শাসন নীতি আর ইসলামসম্মত থাকল না।

ফলে এই দাঁড়াল যে মুঘল সাম্রাজ্যে মুসলিমরা হয়ে গেল অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত একটি সম্প্রদায়। শক্তির সহিষ্ণুতা আর শক্তির অকার্যকারিতা এক নয়। সহিষ্ণুতা ও অমুসলিমদের সন্তুষ্টিবিধানের প্রয়াস আগেকার শাসনামলেও ছিল; কিন্তু ইসলামী নীতি তাতে বিসর্জিত হত না। সম্রাট আকবর নীতি বদলে দৃঢ়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন ঠিকই, কিন্তু তা করলেন ইসলাম, এমন কি মুসলিম স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে নয়, করলেন মসনদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই।

জাতিগতভাবে ভারতে মুসলিমরা ছিল একাধারে বিজয়ী এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ; আর হিন্দুরা বিজিত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ। এমনি অবস্থায় বিজয়ীদের শাসন ব্যবস্থা সর্বক্ষণই উভয় সঙ্কটে দোদুল্যমান থাকে। শাসন ব্যবস্থার সাফল্য তখন নির্ভর করে প্রতিপ্রত্তি প্রাধান্য এবং আত্মসমর্পণ-আনুগত্যের নাজুক ও স্পর্শকাতর ভারসাম্য রক্ষার উপর। আত্মসমর্পণ আনুগত্য সম্পূর্ণাঙ্গ না হলে প্রতিপত্তি প্রাধান্য অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং তেমন অবস্থায় তা বিলুপ্তির সম্ভাবনাও শঙ্কিত থাকে। ভারতবর্ষে আকবর পরবর্তী শাসনামলে তা -ই হয়েছিল।

আকবরের প্রশংসনীয় শাসন-নীতি তো প্রণীত হয়েছিল দেশে মুঘল আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণকে নিরঙ্কুশ করার মানসেই। কিন্তু পরবর্তীতে তো দূরের কথা, তার জীবদ্দশাতেই তা কি নিরঙ্কুশ হয়েছিল? হয় নি। মহারানা প্রতাপ সিংহ তার সেই অভিলাষ পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মুঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকারে রাজী না হওয়ার জন্য মহারানা প্রতাপ সিংহ হয়ে উঠলেন হিন্দুদের পুজনীয় আদর্শ ব্যক্তি। এটাই ছিল স্বাভাবিক। বিজয়ী মুসলিম রাজশক্তির পক্ষ থেকে বিজিত হিন্দুদের সন্তুষ্টি বিধানের প্রয়াস যত ব্যাপক আর গভীরই হোক, তা কখনও বিজিতদের জাতিগত অবমাননা বোধকে দংশন না করে পারে না। ভারতীয় হিন্দুদের বেলায়ও তা ছিল সত্য।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে তখন গোঁড়াপন্থী ও অ-গোঁড়াপন্থীদের দ্বন্দ্ব বেড়েই চলল। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অমুসলিম দরবারীরা প্রভাবশালী হয়ে উঠল। এখানে উল্লেখ্য যে মুসলিম-অমুসলিম দরবারীরাই ছিল মুঘল আমলের অভিজাত শ্রেণী। মুসলিম দরবারীরা যে তখন খুব একটা সংঘবদ্ধ ছিল, তা নয়। ইরান থেকে আগত শিয়া অভিজাতবৃন্দ মুঘল দরবারে স্থান পাওয়ার পর থেকেই শিয়া-সুন্নী প্রশ্নটা এই সংঘবদ্ধতার মূলে বেশি করে আঘাত হানতে লাগল। ফলে, মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে বিভক্তি এসে যাওয়ায় অমুসলিম অভিজাতদের প্রাধান্য আরও বেড়ে গেল।

রাজ্য শাসনের প্রথম দিকে আকবর ছিলেন গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় নেতৃত্বের সমর্থক। এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন সুন্নী মুসলমান। কিন্তু কিছুদিন পর দরবারী অভিজাতদের

স্বার্থ সংঘাতের ফলে ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি রাজকীয় সমর্থনে এল পরিবর্তন। শিয়া অভিজাতবৃন্দ সুন্নী ধর্মীয় নেতাদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই প্রসন্ন ছিলেন না, হিন্দু অভিজাতেরা তো ছিলেনই না। ফলে দরবারে সুন্নী অভিজাতদের মত ধর্মীয় ক্ষেত্রে সুন্নী ধর্মীয় নেতারাও অসহায় হয়ে পড়লেন। তাছাড়া সুন্নী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দও খুব একটা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না। এদিকে রাজপুত কন্যারাও মুঘল হেরেমে এত প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন যে, সম্রাটের মন মেজাজের উপরও তারা ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতিকূল প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়ে উঠলেন। তদুপরি, সম্রাট আকবর ক্রমেই মধ্যএশিয়ার সুন্নী অভিজাতদের চাইতে ইরানীয় শিয়া অভিজাত ও ভারতীয় হিন্দু অভিজাতদের প্রতি অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে উঠলেন। এর প্রধান কারণ, আকবর মধ্যএশিয়ার সুন্নী অভিজাতদের দ্বারা বাবর হুমায়ুনের বিপদ সৃষ্টির কথা সম্যক অবগত হয়েছিলেন। তাই নিজ ক্ষমতার নিরাপত্তার কথা মনে রেখেই শিয়া ও হিন্দু অভিজাতদের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছিলেন। সর্বোপরি, কান কথার প্রভাব তো ছিলই।

যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুন্নী গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আকবর সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন তা সংঘটিত হয়েছিল জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক নবীজি (সাঃ) এর অবমাননার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। শেখ আবদুন নবী তখন সদরুস সুদুর, কেন্দ্রীয় ধর্মীয় নেতা। সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি হিসাবে তিনি সেই ব্রাহ্মণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের রীতি অনুসারে যেহেতু কোন মৃত্যুদণ্ডই সম্রাটের অনুমোদন ব্যতীত কার্যকরী হতে পারত না, সেহেতু ওই দণ্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য পাঠানো হল সম্রাট আকবরের অনুমোদনের জন্য। সম্রাট পড়লেন উভয় সংকটে। একদিকে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী মতাবলম্বী জনসাধারণের ভাবাবেগ, অন্যদিকে দরবারী শিয়া ও হিন্দু অভিজাতদের এবং হেরেমের হিন্দু বেগমদের চাপ। এ অবস্থায় চরম সিদ্ধান্তের দায়িত্ব সম্রাট সদরুস সুদুরের উপরই ন্যস্ত করলেন। সদরুস সুদুরের নির্দেশে প্রাণ দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হল। ক্ষুব্ধ হলেন দরবারের হিন্দু অভিজাত ও হেরেমের হিন্দু বেগমগণ। শিয়া অভিজাতবৃন্দ তাতে ইন্ধন যোগালেন। সম্রাটের স্বার্থের মূলে নাড়া লাগল। বিরূপ হয়ে উঠলেন সম্রাট সদরুস সুদুর শেখ আবদুন নবী তথা সমগ্র ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি।

সম্রাট আকবর সদরুস সুদুরের ক্ষমতাকে তার নিজ কর্তৃত্বের প্রতি এক চ্যালেঞ্জরূপে দেখতে আরম্ভ করলেন এবং নিজ কর্তৃত্ব ও স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। সুন্নী দরবারী ফৈজী ও আবুল ফজলের পিতা অন্য এক সুন্নী ধর্মীয় নেতা শেখ মুবারকের সাহায্য চাইলেন তিনি।

শেখ আবদুন নবীর দণ্ডাদেশ এ কারণে কিছুটা দুর্বল ছিল যে, তার এই দণ্ডাদেশ হানাফী মতের সঙ্গে পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। শেখ মুবারক রাজ্যের আরও কিছুসংখ্যক ধর্মীয় নেতার মতামত নিয়ে ফতোয়া প্রকাশ করলেন যার মূল কথা এভাবে প্রকাশ পেল যে, ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণ করেও ধর্মীয় নেতৃত্বের কোন সিদ্ধান্তে যদি মতভেদের অবকাশ এসে যায় তাহলে দেশের 'ন্যায়বান সুলতান বা শাসক' সে সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার রাখেন। শেখ মুবারকের ফতোয়ায় সম্রাট আকবরকে সেই 'ন্যায়বান শাসক' বলে মত প্রকাশ করা হয়।

প্রকৃত ব্যাপারটা হল, অতীতে মুসলিম শাসনকর্তা ইসলামী বিধি-বিধান সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হতেন বলে তিনিই এসব ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। পরবর্তীতে সুলতান-সম্রাটরা যখন ইসলামী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে

তেমন একটা জ্ঞানগম্যি রাখতেন না, তখনই ওসব 'ধম্মোকম্মো'র ব্যাপারে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ধর্মজ্ঞানীদের প্রয়োজন দেখা দিল। এই প্রয়োজনের পথ ধরেই শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ নেতা সুলতান-বাদশার পাশাপাশি ধর্মীয় সর্বোচ্চ নেতা সদরুস বা শায়খুল ইসলামের পদ প্রবর্তন। এবং অবশেষে এই সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতৃত্বও যখন সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় নেতার কাছে 'বিরক্তিকর' বলে বিবেচিত হল, তখন 'ন্যায়বান সুলতান বা শাসক' বিশেষণে বিশেষিত করে সম্রাট সুলতান কর্তৃক ধর্মীয় সর্বোচ্চ-নেতাকে পাশ কাটাবার বন্দোবস্ত করা হল। কিন্তু শেখ মুবারকের মাধ্যমে সম্রাট আকবরের এই চালাকির কথা মুসলিম সমাজে অজ্ঞাত রইল না। আকবর তখন এই ফতোয়া অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কখনও অগ্রসর হন নি। তার পরিবর্তে তিনি যে পথ অবলম্বন করলেন তাতে পরিণামে ইসলামের মূলে আরও কুঠারাঘাত করা হল। সম্রাটকে অ-গোঁড়াপন্থী 'ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের' মধ্য থেকে সদরুস সুদুর নিয়োগ করতে প্ররোচিত করা হল এবং তিনি তা-ই করলেন। তদুপরি, 'ন্যায়বান শাসক' আকবর সর্বদিক বিবেচনায় এনে শেষতক প্রচলিত ইসলামকে পাশ কাটিয়ে সকল ধর্মের সমন্বয়রূপী এক নবধর্ম 'দ্বীন-ই-ইলাহী'র প্রবর্তন করলেন। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা ধ্বনিতে অভিনন্দিত হলেন 'শ্রেষ্ঠ' মুঘল সম্রাট আকবর।

মসনদে নিরাপত্তা রক্ষার্থে এত যে করলেন সম্রাট আকবর, তাতেও কি তিনি ভারতীয় হিন্দুদের লালিত স্বপ্নের সম্ভাব্য রূপকারের আসন থেকে মহারানা প্রতাপ সিংহকে সরাতে সক্ষম হয়েছিলেন? হন নি। উদয়পুরের মহারানা সুপ্রতিষ্ঠিতই রইলেন ভারতীয় হিন্দু মানসের অক্ষয় আসনে। এদিকে শুদ্ধাচারী গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় নেতৃত্ব রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হল। সমগ্র দেশে ভাববাদী সুফী উপাধিধারীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেল এবং তার সঙ্গে বেড়ে গেল শরিয়াতের ব্যাপারে সাধারণ স্তরের তথাকথিত 'সুফীদের' লাগামহীন অসংযত মন্তব্য সবারই আক্রমণের বিষয়।

আকবরের সুদীর্ঘ শাসনকাল গত হয়ে এল জাহাঙ্গীরের শাসনকাল। এই পুরা সময়টা ধরে ধর্মীয় ক্ষেত্রে চলল স্বেচ্ছাচারিতা। শুদ্ধাচারী ধর্মীয় নেতৃত্ব তখন একেবারেই দিশাহারা। এক বিশাল সাম্রাজ্যের স্রষ্টা হিসাবে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত সে সাম্রাজ্যের এক নিপুণ শাসক হিসাবে এবং রণকুশলী ও কূটনীতিকুশলী হিসাবে যত শ্রেষ্ঠত্বই লাভ করুন সম্রাট আকবর, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তার শুদ্ধিকরণ করতে গিয়ে তিনি ভারতীয় ইসলামের ও মুসলিম শাসনের সমূহ ক্ষতিই সাধন করলেন। রাজতন্ত্রের আওতায় ইসলাম এতোদিন তবুও আলেম উলামাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টিকারী একমাত্র কার্যকরী উপাদান যে ইসলাম, তাকে অধঃপতনের পথে অবনমিত করার প্রক্রিয়াটি শুরু করে দিয়ে মহামতি আকবর ইসলামকে অধিকতর নামসর্বস্বতার আঙ্গিনায় ঠেলে দিলেন। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটেও এর প্রভাবে সৃষ্ট হল মারাত্মক অবস্থা। এবং এসবের পেছন থেকে একটি প্রশ্নই উকি দিচ্ছিল ঃ প্রচলিত (ইসলাম) বিরোধী শক্তির ক্ষমতার আসনে সমাসীন অবস্থায়, অমুসলিমদের ক্রমবর্ধিত শক্তির প্রেক্ষাপটে ইসলাম অনুসারীদের বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার ধ্বংস ভীতির মুখে, মুসলিম সমাজ কি তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে?

কিন্তু ইসলাম তো এত সহজে পরাজিত হবার নয়। অনুধাবন করতে নেতৃবৃন্দের কিছুটা সময় লেগেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল যখন তখন তার প্রতিকার করা হল বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ও প্রবলভাবে। সম্রাট আকবর অবিশ্যি ১৫৯৫ সালের পর তার দ্বীন-ই-ইলাহী নিয়ে তেমন একটা উৎসাহ উদ্দীপনা দেখান নি। এত ঢাকঢোল পেটানো তার নবধর্মের সদস্য সংখ্যা মাত্র ১৮ তে সীমিত থাকায় তার ভবিষ্যতটা ধরা পড়েছিল নিশ্চয়ই। তাও তো এই সংখ্যা সম্রাটের ডান হাত বাম হাত বলে পরিচিত দরবারীদের নিয়ে, আর হিন্দু দরবারীদের মধ্যে এই দ্বীনে নাম লিখিয়েছিলেন শুধুমাত্র বীরবল।

অতঃপর আবুল ফজল নিহত হন ১৬০২ সালে এবং আকবরের মৃত্যু হয় ১৬০৫ সালে। উল্লেখ্য যে সম্রাটের মৃত্যুকালে শাহী দরবারের সুন্নীপন্থীরা শুদ্ধাচারী গোঁড়াপন্থীদের সমর্থক হিসাবে যথেষ্ট কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিল। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের পরিবর্তে তারই রাজপুতানী বেগমের গর্ভজাত প্রথম পুত্র খসরুকে মসনদে বসানোর রাজপুত পরিকল্পনাটি সেই গ্রুপের দরবারীরা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন এবং মসনদ লাভকারী জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায়েও সমর্থ হয়েছিলেন যে, সম্রাট আকবরের আমলে যেসব ইসলামী রীতিনীতিকে বরবাদ করে দেওয়া হয়েছিল সেগুলোকে আবার বহাল করা হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি আদায় করলে কি হবে, ব্যাপার তখন অনেকটাই জটিল হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি যুগের জনমানস বা জন মেজাজ বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হয়ে ভিন্ন ভাষায়/কথা বলে: আর সেই ভিন্ন ভাষার অন্তরালে যে যুগ দাবি অনুক্ত থাকে, তার মর্মার্থ অনুধাবন করে যিনি সেই দাবি পূরণের লক্ষ্যে যুগ ভাষাকে আশ্রয় করে সঠিক পথে চলার নির্দেশ দিতে পারেন, তিনিই স্বীকৃত হন যুগন্ধর এক পথ-প্রদর্শক হিসাবে, সেই যুগের নকীব হিসাবে। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেই ঝড়ো অমানিশায় যার ভিন্ন ভাষার কথা ধ্বংসমুখী হতাশাগ্রস্ত জাতির কানে পশে তাকে চকিত-চঞ্চল করে তুলল, তিনি হলেন হযরত শেখ আহমদ সরহিন্দী যমানার দ্বিতীয় মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদ আলফ সানি। পুরা নাম শেখ আহমদ সরহিন্দী আল ফারুকী আল নকশবন্দী। ১৫৬২-৬৩ সালের দিকে জন্ম এবং ১৬২৪ সালে ইন্তেকাল। তখনকার দিনের উচ্চতম স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত শেখ আহমদ শুধু ইসলামী ধর্মতত্ত্ব নয়, দর্শন শাস্ত্রেও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছিলেন। অতঃপর তাসাউফের পথে অগ্রসর হন তিনি। পিতা শেখ আবদুল আহাদের কাছে চিশতীয়া তরীকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে পরবর্তীতে প্রথমে শাহ্ কামালের অধীনে কাদেরীয়া সিলসিলায় এবং পরে দিল্লীর খাজা বাকিবিল্লাহর অধীনে নকশবন্দীয়া সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হন। এভাবে শরিয়াত ও মা'রেফাত সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী শেখ তার যুগের সেই ভিন্ন ভাষা বুঝতে পারলেন; তার দৃঢ় প্রতীতি জন্মাল যে ইসলামের পুনর্জাগরণই হচ্ছে এই যমানার দাবি এবং এই দাবি মেটানোকেই তিনি গ্রহণ করলেন জীবনের মহান ব্রত হিসাবে।

তদনুযায়ী সমস্যা সম্পর্কে পুরাপুরি জ্ঞাত হওয়ার জন্য কঠোর সাধনায় মগ্ন হলেন সরহিন্দের শেখ। একের পর এক অনুধ্যান ও অনুভবের স্তর পেরিয়ে পরম জ্ঞানলোকের সন্ধানে একটি স্তরে পৌঁছে উল্লসিত আবেগের সঙ্গে তার মনে হলঃ শরিয়াত হয়তো এক অন্ধত্বের বিশ্বাস। কিন্তু মুর্শিদের উপদেশে মনকে সংযত করে অনুধ্যানের পথে আরও অগ্রসর হলেন শেখ। চমকিত অনুভবে এবার মনে হলঃ অদ্বৈতবাদ হল চরম ভাবাবিষ্টতায় উপলব্ধ একটি অবস্থা মাত্র, পরম সত্য নয়। এতে

দুঃখভারাক্রান্ত হল তার মন। কারণ, চরম ভাবাবিষ্ট উপলব্ধিকেই তিনি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পরম পূর্ণতা বলে ধরে নিয়েছিলেন; তার মনে হল, তিনি হয়তো সাধনার সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। অতঃপর দিনের পর দিন আরও গভীর মনোনিবেশের ফলে তার এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, অতীন্দ্রিয় ভাবাবিষ্ট উপলব্ধিই পরম পূর্ণতা নয়; অতীন্দ্রিয় আবেগ যে ভাবাবিষ্টতার পথে এক অনুভব মাত্র- এই বোধ অর্জনই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির পরম সাফল্য। শেখ সরহিন্দীর এই সত্য দর্শন ওই যুগে অতীন্দ্রিয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তারে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছিল।

যথাসময়ে হযরত শেখ আহমদ সরহিন্দী যমানার মুজাদ্দিদ বলে স্বীকৃত ও পরিচিত হলেন। এই দ্বিতীয় মুজাদ্দিদের কঠোর অধ্যাত্ম সাধনার ফলে অর্জিত সিদ্ধান্তের ফলে ইসলামী সুফীবাদ সঠিক অবস্থানে পুনঃস্থাপিত হল, পুনঃরচিত হল শরিয়াতের সঙ্গে মা'রেফাতের সেতুবন্ধন। জঞ্জালসম অপব্যাখ্যার হাত থেকে মুক্ত হল ইসলাম। ১৬১৮ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ইসলামী রীতিনীতি কায়েমের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য গোয়ালিয়র দুর্গ কারারুদ্ধ হন হযরত মুজাদ্দিদ আলফ সানি। শাহজাদা খুররম (পরবর্তীতে সম্রাট শাহজাহান) হযরত সরহিন্দীর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন এর আগে থেকেই। গোয়ালিয়র দুর্গের কারাগারে হযরত সরহিন্দীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে সেই দুর্গেই কারারুদ্ধ বিখ্যাত মুঘল সেনাপতি মুহব্বত খানের। ফলে, মুহব্বত খাও হযরত সরহিন্দীর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। একবছর কারাবাসের পর মুক্তি পান হযরত মুজাদ্দিদ আলফ সানি। শাহী দরবারে চলতে থাকে দরবারীদের বিভিন্ন গ্রুপের স্বার্থসিদ্ধির খেলা। ধর্মীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও চলতে থাকে পুনর্গঠন। হযরত মুজাদ্দিদের প্রচারিত আদর্শ স্পর্শ করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের হৃদয়। তারপর হযরতের ইন্তেকাল এবং তারও তিন বছর পর ১৬২৭ সালে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাদা খুররমের মসনদ লাভ।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে শাহী দরবারে ইসলামপন্থীদের অবস্থান দৃঢ় হল। ইতিপূর্বে তাসাউফের ভ্রান্তিমূলক প্রচারণা, শাহী দরবারের সুন্নী বিরোধী শক্তির প্রভাব এবং সম্রাট আকবরের ধর্মীয় আচরণ ও ক্রিয়াকাণ্ড- এই তিনটি প্রতিকূলতা মিলে ভারতীয় মুসলিম সমাজে যে সর্বনাশা ধস নামতে আরম্ভ করে, হযরত শেখ আহমদ সরহিন্দী সেই ধসকে রোধ করে ইসলামকে ভারতীয় সমাজে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছিলেন। ভারতবর্ষে ইসলাম ওই সময়টায় যে বিপন্ন অবস্থায় পতিত হয়েছিল, তার থেকে লক্ষা পাওয়ার জন্য অদ্বৈতবাদের বর্জন প্রয়োজন ছিল। আর অনেকাংশে মুসলিম সমাজ থেকে তার বর্জন করাতে পেরেছিলেন বলেই হযরত সরহিন্দীর মতাদর্শের সার্থকতা, তার মুজাদ্দিস উপাধির যথার্থতা। মতাদর্শের যে পথ তিনি রচনা করে গিয়েছিলেন, সম্রাট শাহজাহানের শাসনাবসানে দারা শিকোহ বনাম আওরঙজেবের ক্ষমতা-দ্বন্দ্বে বিজয়ী হিসেবে আওরঙজেবের উত্থান সেই দাবিরই স্বাভাবিক প্রকাশ।

অন্যদিকে সম্রাট আকবরেরই নতুন সংস্করণ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছিলেন সম্রাট শাহজাহানের প্রথম পুত্র শাহজাদা দারাশিকোহ। শাহজাহানের জীবিতাবস্থায় তিনি তো সম্রাট হয়েই ছিলেন, বাকি ছিল শুধুমাত্র একটা অভিষেকানুষ্ঠান। শাহীমহল ও দরবারের ইসলাম বিরোধীরা সেই 'সুদিনের' অপেক্ষাতেই ছিলেন। আর ইসলামপন্থীরা সমবেত হয়েছিলেন আওরঙজেবকে কেন্দ্র করে। চরিত্রে বিশ্বাসে ও

সামর্থ্যে আওরঙজেবের সেই যোগ্যতাও ছিল। ইসলাম বিরোধী পক্ষের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শাহজাদা দারাশিকোহ সম্রাট আকবরের চাইতেও অধিকতর উপযোগী হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিলেন। আকবরের মননশক্তি যেখানে সুশৃঙ্খলভাবে চালিত ছিল না, সেখানে দারাশিকোহ শুধুমাত্র সুশৃঙ্খল পরিশীলিত মননের অধিকারীই ছিলেন না, সেই মনন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাদিও রচনা করেছিলেন তিনি। অদ্বৈতবাদের শিক্ষা আর উপাসনারূপে অদ্বৈতবাদের প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা দুটি ভিন্ন জিনিস। প্রথমটায় অদ্বৈতবাদ ব্যক্তির মধ্যেই সীমিত থাকে ও সমাজকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে; কিন্তু দ্বিতীয়টায় তা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমাজকে ওই মতবাদের প্রতি প্ররোচিত করেও সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে ভাঙনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়; বিশেষ করে মুসলিম সমাজে ওই ব্যক্তিটি হন যদি কোন শক্তিমান রাজপুরুষ। নিশ্চিতভাবে শাহজাদা দারাশিকোঁহ ছিলেন সেই সম্ভাব্য রাজপুরুষ। কিন্তু ঘটনাচক্রে দারাশিকোহ মার খেয়ে গেলেন আর এক শক্তিমান রাজপুরুষ আওরঙজেবের হাতে। কিন্তু ততদিনে ভারতীয় হিন্দু অভিজাতদের বহুদিনের পোষিত প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরণে দরবারীদের শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বও যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। এই দ্বন্দ্বের অবদানে পুষ্ট হয়ে হিন্দু প্রত্যাশা তখন মারাঠা শক্তির মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের বিপদরূপে দেখা দিয়েছে।

দক্ষিণ ভারতে মুসলিম রাজ্য গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের শিয়া সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে মারাঠারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাদের লুণ্ঠন অত্যাচারে লাঞ্ছিত রাজ্য দুটিকে রক্ষা করবার মত শক্তির অধিকারী ছিলেন না গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানেরা। তাই তারা বাধ্য হয়ে মারাঠাদের সঙ্গে গোপন সমঝোতার আশ্রয়ই গ্রহণ করলেন। এতে করে তারা নিজেদের মসনদ রক্ষা করার আশ্বাসই পেলেন মাত্র, লুণ্ঠন অত্যাচার থেকে রেহাই পেল না রাজ্য দুটি। এভাবে ক্রমবর্ধমান রণশক্তির অধিকারী হয়ে মারাঠারা মুঘল অধিকারেও হানা দিতে প্রবৃত্ত হল যখন, তখনই মারাঠা ও তাদের মিত্র গোলকুণ্ডা বিজাপুরের শিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হল সম্রাট আওরঙজেবকে।

বলা হয়ে থাকে আওরঙজেবের ধর্মীয় নীতিই মারাঠা শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের বিপর্যয়ের মূল কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। মন্তব্যটা গ্রহণীয় নয় এ কারণে যে, মারাঠা জাগরণে কোন ধর্মীয় নীতিই কার্যকর ছিল না, কার্যকর ছিল ভারতবর্ষে মুসলিম রাজশক্তিকে চিরতরে নির্মূল করে সেখানে হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলার দুর্নিবার আকাঙ্খা। দিল্লীর মসনদে আওরঙজেবের বদলে দারাশিকোহ আসীন হলেও মুঘল শক্তিকে মারাঠা শক্তির মোকাবিলা করতে হত। সম্রাট আকবর যদি মুসলিম ধর্মীয় নীতিতে পরিবর্তন এনেও হিন্দু প্রত্যাশার রূপকারের আসন থেকে মহারানা প্রতাপ সিংহকে সরাতে না পেরে থাকেন, দারাশিকোহ সম্রাট হয়েও সেই একই আসন থেকে সরাতে পারতেন না মারাঠা প্রধান শিবাজীকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতীয় হিন্দু প্রত্যাশা তো কোন উদারনীতি সম্পন্ন মুসলিম শাসকের অপেক্ষায় বেড়ে ওঠেনি, বেড়ে উঠেছিল কোন এক শিবাজীরই অপেক্ষায়। এটাকে তাদের শিবাজী স্বপ্ন বলেও চিহ্নিত করা যায়। ভারতীয় হিন্দু মানসের এই স্বাভাবিক সত্যটাকে বুঝতে হয়তো ভুল করেছিলেন সম্রাট আকবর, অথবা হয়তো বুঝতে পেরেও তাকে হিন্দু মুসলিম মিলনের মাধ্যমে চিরতরে দূরীভূত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। সম্রাট আকবরের চিন্তায় যাই থাকুক, বাস্তব সত্য হল এই যে,

মুসলিম শাসন রীতিতে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত পরিবর্তন ভারতবর্ষে এতদিনকার প্রচলিত 'মুসলিম শাসন'কে নিছক 'মুঘল শাসনে' রূপান্তরিত করে ফেলেছিল। রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনঃপরিবর্তন ঘটিয়ে সম্রাট আওরঙজেবের সেই 'মুঘল শাসন'কে পুনরায় 'মুসলিম শাসনে' পরিণত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে 'ইসলামী শাসন' তো প্রায় হাজার হাজার বছর আগেই আরবের মরুতে পথভ্রান্ত অবস্থায় দিশাহারা।

রাজতন্ত্রী উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ্যে সূচিত হয়েছিল রাজ্য শাসনে প্রকৃত ইসলামের নীতি বিচ্যুতির যে দীর্ঘতম কাল, তারই স্বাভাবিক পরিণতিকে ঠেকাতে পারলেন না মুসলিম জাহানের কোন ব্রতশীল শাসকই। ভারতবর্ষেও তা ঠেকাতে ব্যর্থ হলেন মুঘল সম্রাট আওরঙজেব। সম্রাটের এ ব্যর্থতার পেছনে অনেকটাই কার্যকরী ছিল মুঘল দরবারের শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব।

ঘটনা পারম্পর্যে এভাবে বিচার্য বিষয়গুলোকে গুলিয়ে ফেলা হয়, আর ইসলাম পরিণত হল নিজেরই মধ্যে বিভক্ত এক প্রতিষ্ঠানে। বস্তুত মুসলমানেরা একক পতাকার নীচে একত্রিত হতে না পেরে সঙ্কীর্ণচেতা আনুগত্যের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে বিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা যদি সাম্রাজ্য হারিয়ে দুর্ভোগে নিপতিত হয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে অংশত নিজেদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে অপারগতার জন্যই।

মূলত, আমীর ওমরাহদের মধ্যেকার এই আত্মঘাতী বিরোধের জন্যই সূচিত হল মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান। ১৭০৭ খৃস্টাব্দে সম্রাট আওরঙজেবের মৃত্যুর পর ষড়যন্ত্র ও স্বার্থ সংঘাতের আধিক্যে নড়বড়ে হয়ে উঠল এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী মুঘলশক্তির দুর্গ। এমনি অবস্থায় এক মূর্তিমান মুসিবতরূপে ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে দিল্লীতে আবির্ভূত হয় নাদির শাহ'র বাহিনী। এই আক্রমণে প্রকটভাবে উন্মোচিত হল মুঘলশক্তির অন্তঃসারশূন্যতা। প্রায় দুই মাস দিল্লীতে অবস্থান করে জান মাল ও মানের অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করে বিজয়ী নাদির শাহ জরিমানা স্বরূপ বহু কোটি টাকা, মুঘলদের বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন ও বিশ্বখ্যাত কোহিনুর মণিসহ ইরানে ফিরে যান। তার সঙ্গে লাভ করেন সিন্ধু নদের পশ্চিমে অবস্থিত মুঘলদের বিশাল ভূখণ্ডের মালিকানা। চরম লাঞ্ছনা ও গ্লানি নিয়ে দিল্লীর মসনদে টিকে থাকেন মুঘল বাদশাহ মুহাম্মদ শাহ।

ততদিনে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের নানা স্থানে দেখা দিয়েছে সুবাদারদের বিদ্রোহ। মারাঠা শিখ প্রভৃতি জাতির নবজাগরণ ও বিরোধিতার মুখে অসহায় মুঘল শক্তির সম্ভাব্য অবসানের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় মুসলিমদের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে আসে এক চরম বিপদের মহাসংকেত। এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ভারতীয় মুসলিম সমাজে দেখা দিলেন হযরত মুজাদ্দিদ আলফ সানির ভাবশিষ্য শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রঃ)। সমগ্র পরিস্থিতি অনুধাবন করে তিনি বুঝতে পারলেন যে, মুসলিম সমাজের নৈতিক চরিত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনই হচ্ছে এই সময়ের দাবী। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বুঝতে পারলেন যে, এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বেশ কিছুটা সময়; কিন্তু জাতিকে আসন্ন বিপদের গ্রাস থেকে রক্ষা করা যে এখনই জরুরী। তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন যে মুসলমানরা শুধুমাত্র তাদের নেতৃবর্গকেই হারায় নি, হারিয়েছে তাদের অখণ্ডত্বের ধারণাকে। একটা সুসমন্বিত জনগোষ্ঠী থেকে তারা অধঃপতিত হয়েছে এক অসহায় জনতায়।

এর মধ্যে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আফগান-প্রধান আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী ও মথুরা আক্রমণ করে ফিরে গেছেন এবং ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধ প্রহসনে বিজয়ী হয়ে বাংলায় স্থাপন করেছেন ইংরেজ প্রভুত্ব ও সেই প্রভুত্বে বিস্তৃত হতে চলেছে দিল্লী পর্যন্ত। এমনি অবস্থায় প্রবল উৎসাহ ও দৃঢ়তা নিয়ে ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের আশায় দিল্লী পানে ছুটে আসে দুর্ধর্ষ মারাঠা বাহিনী। ১৭৬১ খৃস্টাব্দে মুঘলশক্তিকে একত্রীকরণের মানসে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী বিভিন্ন মুসলিম প্রধানের কাছে আবেদন জানালেন এবং তারই প্রচেষ্টায় মুসলিম প্রধানেরা শেষ পর্যন্ত মিলিত হয়ে ভারতবর্ষের মুসলিম শক্তিকে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন আফগান প্রধান আহমাদ শাহ আবদালীকে। তদনুসারে ১৭৬১ খৃস্টাব্দে পানিপথের প্রান্তরে সংঘটিত হল হিন্দু মারাঠা শক্তি ও আফগান মুঘল শক্তির গুরুত্বপূর্ণ মোকাবিলা। গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, এই তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলেই মারাঠাদের হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের অভিলাষ প্রায় দুশ' বছরের জন্য বিলম্বিত হয়ে যায়। কিন্তু বিজয়ী মুসলিম পক্ষও কার্যত সেই বিজয়কে ধরে রাখতে পারল না। বিজয়ী বীর আহমদ শাহ আবদালী ফিরে গেলেন নিজ দেশে। ভারতবর্ষের মুসলিম প্রধানেরাও নিজেদের পূর্ব স্বভাবে পুনরাবির্ভূত হলেন। নড়বড়ে মুঘল শক্তির গৌরব দুর্গ তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল। ভারতবর্ষে দুর্দমনীয় নবশক্তিরূপে আবির্ভূত হল ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ভারতীয় মুসলিম সমাজের ভাগ্যে নেমে এলো সুদীর্ঘ অমারজনীয় অন্ধকার।

"When the Sea ebbs a tide, water is left standing in a few despressions, similarly when the Mughal Empire collapsed, a few centres of Muslim rule continued to exist for some time, the cheif of these were the states of Bengal. Oudh, Mysore and Hyderabad . Bengal was the first to fail; Mysore disappeared as a Muslim state in 1799. when Tipu Sultan died fighting in the defence of his capital, Seringapatam. Oudh was first reduced to vassalage and then annexed in 1856. Hyderabad also became dependent upon the East india Company. জোয়ারের পর সমুদ্রে যখন ভাটার টান পড়ে, কিছু কিছু নীচু জায়গায় তখন পানি থেকে যায়, ঠিক তেমনি মুঘল সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের পথে এসে দাঁড়াল, তখন কিছু সময়ের জন্য কতিপয় স্থানে মুসলিম শাসন বিদ্যমান থাকল। এসব স্থানের মধ্যে প্রধান ছিল বাংলা, অযোধ্যা, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদ। (অতঃপর) বাংলার পতন ঘটে প্রথম; মুসলিম রাজ্য হিসেবে মহীশূর অদৃশ্য হয়ে যায় ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে যখন টিপু সুলতান নিজের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হন। অযোধ্যাকে প্রথম সামন্ত রাজ্যে পরিণত করা হয় এবং পরে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করে নেওয়া হয়। হায়দ্রাবাদ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে"। (The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent, Dr. I. H. Qureishi, 1962, pp 174-75)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুবে বাঙ্গালায় ছদ্মাবৃত ক্রুসেডার

কিছুটা পুনরাবৃত্তি করেই আরম্ভ করছি। স্বর্গলোকের চাবি যখন পেয়ে গেল পর্তুগীজ জলদস্যুরা, তখন আর তাদের পায় কে? ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক ভারতবর্ষের বাণিজ্যপথ আবিষ্কারের পরপরই পর্তুগাল রাজ গ্রহণ করে বসলেন জবরদস্ত উপাধি- Lord of the Navigation, Conquests and Trade of Aethiopia, Arabia, Persia and India; মহামান্য পোপের সনদ বলে প্রাচ্য বাণিজ্যের পূর্ণ অধিকার তার নিজের। এখন থেকে তিনি প্রাচ্য সাগর সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিশ্বর। রাজার মত প্রজাদেরও ধারণা, বিশেষ করে পর্তুগালের নাবিক পরিচয়ের প্রতিটি জলদস্যুদেরও ধারণা তারাই প্রাচ্য সাগর সাম্রাজ্যের অধিকর্তা। পোপের সার্টিফিকেট বলে স্বয়ং গডের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। তাদের বিশ্বাস মতে, খৃস্টান ছাড়া আর কেউই তো মানুষ নামের যোগ্য নয়. মুসলমানেরা তো নয়ই। এমনি মনোবৃত্তি সকলের। এমনি মনোবৃত্তি থেকেই প্রণীত তাদের বাণিজ্য নীতি। ভাস্কো ডা গামার স্বভাবঃ "If peaceful traffic proved less profile, he readily indulged in the use of sword and fire" (History of Bengal, Vol.II Dr. Surendra Nath Sen, edited by Sir Jadumath Sarker, The University of Dacca, Second Impression 1972, P. 351) শান্তিপূর্ণ উপায় কম লাভজনক বলে প্রমাণিত হলে তরবারী আর আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে কর্মোদ্ধার করাকেই শ্রেয় মনে করতেন ভাস্কো ডা গামা।

আর ব্যবসা বাণিজ্যের সততা? "Nothing was unfair to a fanatical Christian and fanaticism was the order of the day, particularly in the comparatively less civilized lands of the West, when a Moor or Muslim happened to be the victim." (ibid, p. 353) কোন ধর্মান্ধ খৃস্টানের কাছে অন্যায় বলে কিছু ছিল না এবং ধর্মান্ধতা ছিল তখনকার নিয়ম-নীতি বিশেষ করে তুলনামুলকভাবে প্রতীচ্যের কম সভ্য দেশগুলোতে এবং বিশেষ করে প্রতিপক্ষ হত যখন মুসলমান।

এসব ধ্যান-ধারণার বশবর্তী পর্তুগীজরাই ভারতীয় উপকূলীয় বন্দর গোয়াতে প্রতিষ্ঠিত করল তাদের প্রাচ্য সাগর রাজধানী এবং সাম্রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন তার বিস্তৃতির প্রয়োজনও দেখা দেবে না কেন? গোয়া প্রধান আলবারগেরিয়া ১৫১৮ সালে বঙ্গোপসাগরের পথে পাঠালেন এক পর্তুগাল অভিযাত্রীর দল। ৪ টি জাহাজ ভাসিয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছল এসে দলটি। দল নেতার নাম দোম সেলভেইরা। তার অল্পদিন আগেই অবিশ্যি আর এক পর্তুগীজ এজেন্ট কোয়েল হো, বাংলার খবরাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে পৌঁছেছিল এক মুসলিম জাহাজের যাত্রী হয়ে। ১৫১৭ সালে এনড্রেডের নেতৃত্বে বঙ্গোপসাগরের অবস্থা জানার জন্য যে পর্তুগীজ অভিযাত্রী দল পাঠানো হয়েছিল, কোয়েল হো ছিল তারই অন্যতম সহযাত্রী। এনড্রেড বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে দুর প্রাচ্যের সম্পদ প্রাচুর্যের আকর্ষণে অভিযাত্রী দল নিয়ে চলে যায় সুমাত্রায়। সেখান থেকে ফেরার পথে এক মুসলিম জাহাজের ভদ্র যাত্রী হয়েই চট্টগ্রামে পৌঁছে। কিন্তু সিলভেইরা চট্টগ্রামে আসার পথে নিজের স্বভাবকে চেপে রাখতে না পেরে দস্যুরূপে আত্মপ্রকাশ করে দুটি মুসলিম বাণিজ্য তরণীকে আক্রমণ

করে বসে। তার একটির মালিক ছিলেন চট্টগ্রামের মুসলিম প্রশাসকের ভাই। পরিচয়টা সিলভেইরার জানা ছিল না। দিক নির্দেশনার সাহায্যকারী হিসেবে অধিকৃত বাণিজ্য তরণীর নাবিককে সঙ্গে নিয়েই চট্টগ্রামে পৌঁছল এসে সিলভেইরা। অতঃপর খবরটা জানতে কারও দেরী হলনা। কোয়েল হো জাহাজে ভদ্র শান্ত যাত্রীর মতই ব্যবহার করেছিল বলে চট্টগ্রামে তার সমাদরের কোন ত্রুটি হল না। কিন্তু সিলভেইরার হল বিপদ। জানাজানি হয়ে গেল যে, সে এক জলদস্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। পর্তুগীজরা প্রতীচ্যমুখী প্রাচ্যের বাণিজ্য পথে মুসলিমদের সঙ্গে কি ব্যবহার করে, তা চট্টগ্রামের রাজপুরুষদের জানাই ছিল। কাজেই বিপদেই পড়ে গেল সিলভেইরা। তবু তাকে তেমন কোন শাস্তি না দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল গোয়াতে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষের উপকূলে গোয়াকে রাজধানী করে প্রাচ্যের সাগর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার পর পর্তুগীজরা তাদের ব্যবহার যথাসম্ভব ভব্যতার আবরণ দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিল। কিছুটা চালাকির আশ্রয় নিয়েই প্রাচ্যের বিভিন্ন শাসকদের সঙ্গে দেন দরবার করার প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করেছিল। কিন্তু তা করতে গিয়েও অনেক সময় তাদের স্বভাব প্রকাশ পেয়ে যেত। "With a strange and perverse consistency, the Portuguese continued to offend the susceptibilities of a civilised society and a cultural court by their failure to conform to the heigher standard of international conduct prevailing in India, and most of their misfortunes in Bengal were due to lawless habits contracted with impunity in the congenial climes of the 'dark continent'. ভারতবর্ষের রাজ দরবারগুলোতে বিদ্যমান উঁচুস্তরের আন্তর্জাতিক রীতিনীতিসম্পন্ন অবস্থার সঙ্গে, সভ্য সমাজ ও সংস্কৃতিবান দরবারের ব্যবহাররীতির সঙ্গে বিচিত্র ও বিকৃত স্বভাব পর্তুগীজরা কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারত না"। (ibid, p-354)

সিলভেইরার মত আরও একটি কুকর্ম করে বসল পেরেইরা নামক অন্য এক পর্তুগীজ। সেটা ১৫২৬ সালে। চট্টগ্রামে খাজা শিহাবুদ্দিন নামক এক ধনী পারশ্যবাসীর বাণিজ্য তরী সে লুণ্ঠন করে বসল। তাও ধামাচাপা দেওয়া হল কোন রকমে। কিন্তু ১৫২৮ সালে ঘটে গেল আর এক ঘটনা। মার্টিম এফোনসো দ্য মেলো নামক এক পর্তুগীজ ৮ টি জাহাজ নিয়ে আসছিল সিংহলের পথে। সমুদ্রে উঠল ঝড়। তাতে দ্য মেলোর জাহাজগুলো ভাসতে ভাসতে বার্মার পেগুতে গিয়ে ঠেকল। চড়ায় আটকা পড়ায় তাদের হল বিপদ। বিধ্বস্ত জাহাজগুলোর বেঁচে থাকা লোকজনসহ দ্য মেলোকে অবশেষে কয়েকজন জেলে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে দিতে ভুল করেই হোক আর ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক, নিয়ে গেল মাতামুহুরী নদীতীরস্থ থানা চকরিয়ায়। পর্তুগীজ বলে জানতে পেরে চকরিয়ার থানাদার তাদের বন্দী করে রেখে দিল জেলখানায়। নানা দেন-দরবারের পর মুক্তি পেয়ে দ্য মেলো চলে গেলো গোয়ায়। পরের বছর চট্টগ্রাম তথা বাংলার রাজধানী গৌড়ের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে গোয়ার গভর্নর এই দ্য মেলোকেই পাঠালেন বাংলায়। সঙ্গে ৫টি জাহাজ ও ২০০ সৈন্য। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে শুভেচ্ছা মিশনে এলেও দ্য মিলোর পর্তুগীজ স্বভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করা জাহাজগুলোর পণ্যসামগ্রীর অধিকাংশই সে গোপনে বিক্রি করতে লাগল; গোপনে বিক্রির উদ্দেশ্য শুল্ক ফাঁকি দেওয়া। তদুপরি নিজেই এমন একটা ভুল সে করে বসল যার পরিণতি হল খুবই বিপজ্জনক। বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহ। মাহমুদ শাহর কাছে প্রচুর উপঢৌকন

পাঠাল দ্য মেলো। কিন্তু তার মধ্যে পাওয়া গেল মুসলিম বণিকদের বাণিজ্য তরী থেকে লুণ্ঠন করা বিশেষভাবে চিহ্নিত দ্রব্যাদি। সুলতান দরবারে শুভেচ্ছা প্রতিষ্ঠাকারী দ্য মেলো ও সঙ্গীদের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে গেল। সুলতান দিলেন প্রাণদণ্ডের আদেশ। কিন্তু এক দরবেশের অনুরোধক্রমে প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত করে সুলতান তাদেরকে পাঠালেন কয়েদ খানায়।

এই বিপদের খবর পেয়ে গোয়ার গভর্নর এন্টোনিও দ্য সিলভা সসৈন্যে পাঠালেন বাংলায়। উদ্দেশ্যঃ প্রথমে অনুরোধ উপরোধ করে পর্তুগীজ বন্দীদের মুক্তি লাভ করা, তাতে ব্যর্থ হলে বল প্রয়োগে বন্দীদের উদ্ধার সাধন। চট্টগ্রামে পৌঁছে দ্য সিলভা মেনেযেস দূত পাঠাল সুলতানের দরবারে; দূতের মাধ্যমে সুলতানের কাছে গোয়ার গভর্নরের পত্র। কিন্তু এক মাসের মধ্যেও পত্রের উত্তর আসছে না দেখে মেনেযেস চট্টগ্রামে সুলতানের লোকদের আক্রমণ করে অনেককে হত্যা করে বসল। ঠিক সে সময়ে ১৫৩৫ সালে দিওগো রেবেল্লো জাহাজভর্তি সৈন্য নিয়ে সাতগাঁও-এ হাজির হয়। রেবেল্লো আদব কায়দা মাফিক গৌড়ে দূত পাঠায়। এবার সুফল ফলে সঙ্গে সঙ্গে। এই সুফলের প্রধান কারণ, মাহমুদ শাহ তখন পাঠান বীর শের খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এবং নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য মিত্র খুঁজতে আগ্রহী। মুক্ত হয়ে গেল পর্তুগীজ বন্দীরা; শুধু তাই নয়, মার্টিম এফোনসো সুলতানের সামরিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়ে গেল এবং পর্তুগীজ সৈন্যরা পরিগণিত হল সুলতানের মিত্র বাহিনীরূপে।

শের খানের সঙ্গে মাহমুদ শাহর যুদ্ধে অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছিল পর্তুগীজরা। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি মাহমুদ শাহর। শের খানের সঙ্গে তিনি সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন। এর মধ্যে ১৫৩৮ সালে গোয়ার পর্তুগীজরা গুজরাটের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বাংলার পর্তুগীজ সৈন্যরা বাংলা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। আর অস্থিরমতি বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহ এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সংযোগ রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন; বাংলার নিয়ন্ত্রণ এসে যায় শের খানের হাতে। কিন্তু মাহমুদ শাহর সঙ্গে মিত্রতার ফলে পর্তুগীজরা বাংলায় তাদের অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়। বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহ মৈত্রীর শর্তানুসারে পর্তুগীজদেরকে সাতগাঁও ও চট্টগ্রামে কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। ওই দুই বন্দরে কুঠি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজরা নিজেদের কাস্টম হাউসও নির্মাণ করে নেয়। ফলে বাংলায় তাদের অবস্থিতি হয়ে ওঠে সুদৃঢ়।

পর্তুগীজদের কাছে বাংলায় রাজশক্তির পরিবর্তনে শের খানের বিজয় লাভ ছিল অনভিপ্রেত; কারণ, পর্তুগীজরা বাংলার তদানীন্তন সুলতানী শাসনের দুর্বলতা সম্পর্কে বেশ ওয়াকেবহাল হয়ে উঠেছিল এবং তার প্রেক্ষাপটে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ণয় করে নিয়েছিল। কিন্তু মহাধুরন্ধর ও শক্তিমান শের খানের শুরের শাসনামলে তাদের ভবিষ্যৎ হয়ে পড়েছিল অনিশ্চিত। সেজন্যই দেখা যায়, মাহমুদ শাহর পতনে পর্তুগীজরা সুলতানী আমলের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শক্তিগুলোর সঙ্গে নতুন প্রশাসনের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করছে। এখানে স্মরণীয় যে বাংলায় রাজশক্তির পরিবর্তন হলেও তার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নতুন রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ তেমন প্রতিষ্ঠিত হত না। আর এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র শক্তিগুলোই নতুন রাজশক্তির চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াত। ১৫৩৮ সাল থেকে ১৫৫৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় পর্তুগীজ সংক্রান্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়নি। কিন্তু ১৫৫৯ সালে হঠাৎ করেই দক্ষিণ বাংলার বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী এক ক্ষুদ্র জনপদ বাকলার অধিপতির সঙ্গে পর্তুগাল রাজের এক সন্ধির খবর পাওয়া

যায়। এই সন্ধি বলে বাকলারাজ পরমানন্দ রায়ের সঙ্গে গোয়ার একটা সামরিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাতে পর্তুগীজ জাহাজগুলোকে নোঙর করার জন্য বাকলায় অথবা বাকলা রাজের অধীনস্থ যে কোন স্থানে অবাধ অধিকার দেওয়া হয়, সে সব জাহাজে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য পুরাপুরি স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং পর্তুগীজ পণ্যের উপর বাড়তি কোন শুল্ক ধার্য করা যাবে না বলে স্বীকার করা হয়। এর পরিবর্তে বাকলা রাজের চারটি বাণিজ্য তরণীকে গোয়া, হরমুজ ও মালাক্কা বন্দরে নোঙর করার অনুমতি দেয়া হয়। স্পষ্টতই, এই চুক্তিপত্রে বাকলা রাজের আনুগত্যের ভূমিকাই ফুটে উঠেছে বেশি করে। চুক্তিপত্রে আরও উল্লেখ ছিল, বাকলা রাজের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জনপদের কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হলে পর্তুগীজরা বাকলা রাজের পক্ষ হয়ে লড়াবে। এর থেকে বাকলা রাজের রাজ্য বিস্তারের স্বপ্নও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই ঘটনা থেকে অনুধাবন করা চলে যে, ভারতবর্ষে মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয় যে কোন রাজপুরুষের পক্ষ নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আইনগত বিধান অর্জনের চেষ্টায় রত ছিল পর্তুগীজেরা। তদুপরি বাণিজ্য সুবিধা আদায়ের চেষ্টা তো ছিলই। এ সম্পর্কে মালাবার উপকূলে কালিকট ও কোচিন বন্দরে পর্তুগীজদের এমনি প্রচেষ্টার কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। কালিকট রাজের কাছ থেকে স্বার্থ আদায়ে সুবিধা হচ্ছে না দেখে পর্তুগীজরা কোচিন রাজকে হাত করেছিল; এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর করে দেবে বলে কোচিন রাজকে লোভ দেখিয়েছিল। তার বদলে চুক্তির মাধ্যমে আদায় করে নিয়েছিল কোচিন এলাকায় অবাধ বাণিজ্যিক অধিকার এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কোচিন রাজের পক্ষে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আইনগত বিধান। পরবর্তীকালে কোচিন রাজের স্বপ্ন কি করে শুন্য বিলীন হয়ে গিয়েছিল তা আমরা দেখেছি। বাকলা রাজের বেলাতেও চুক্তির পরিণাম কোচিন রাজের স্বপ্নের মতই শুন্য মিলিয়ে গিয়েছিল। বাকলার এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির পরবর্তী রাজপুত্র রামচন্দ্রের সঙ্গে বাংলার বারভূঁইয়াদের অন্যতম যশোরের প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিয়ে হয়। কিন্তু মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার কালে এইসব ক্ষুদ্র শক্তি কোনটাই টিকে থাকতে পারেনি।

বাংলার স্থানীয় ক্ষুদ্র শক্তির সঙ্গে যেসব পর্তুগীজ যোদ্ধা জড়িত থেকে ইতিহাসে খ্যাত বা অখ্যাত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে কার্ভালো এবং গঞ্জালেসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীপুরের ভুঁইয়া কেদার রায়ের বাহিনীতে নিযুক্ত ছিল কার্ভালো। কার্ভালোর মত যুদ্ধব্যবসায়ীরা বিভিন্ন স্থানীয় প্রধানদের সঙ্গে জড়িত থেকে একদিকে তাদের দেশের জন্য, অন্যদিকে নিজেদের ভাগ্য নির্মাণের জন্য প্রাণপাত করে গেছে। "Of these Domingo Carvalho was by far the ablest and did not miss any opportunity of serving his country`s cause when one was available." (ibid, p-360)

চট্টগ্রাম সৈকতের অদূরে সন্দ্বীপ তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ এবং লবণ শিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র। ফলে, সন্দ্বীপ হয়ে ওঠে পাঠান মুঘল, মগ ও পর্তুগীজদের এক পারস্পরিক যুদ্ধক্ষেত্র। ১৫৬৯ সালেও সন্দ্বীপ ছিল মুসলিম অধিকারে, কিন্তু ১৬০২ সালে কার্ভালো কেদার রায়ের পক্ষে সন্দ্বীপ দখল করে নেয়। তবে স্থানীয় অধিবাসীগণ কার্ভালোর কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে। কার্ভালো তখন দিয়াঙ্গার ক্যাপ্টেন ম্যাটোসকে তার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ম্যাটোস এসে হাজির হলে সন্দ্বীপকে দুইভাগে বিভক্ত করে একজন

এক ভাগের শাসনকার্যে লিপ্ত হয়। শাসনকার্য মানে জোর জবরদস্তি করে জনপদটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। কার্ভালো এবং ম্যাটোসকে পর্তুগাল রাজ নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। সন্দ্বীপ থেকে কেদার রায়ের কর্তৃত্ব শুন্যে মিলিয়ে যায়। কিন্তু কার্ভালো ম্যাটোসের সন্দ্বীপ অধিকার বেশিদিনের জন্য স্থায়ী হয়নি। আরাকানের মগ রাজার সঙ্গে কার্ভালো ম্যাটোসের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। দুই পক্ষেরই জয় পরাজয়ের পর তারা সন্দ্বীপ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এখানে এটাও উল্লেখ্য যে, এই সব যোদ্ধা জলদস্যুদের মত তাদের নিয়ন্ত্রিত জনপদে এসে ভিড় জমাত খৃস্টান যাজকেরা; তাদের ধর্মপ্রচারের ধরণ ছিল দস্যুদের মতই শক্তিভিত্তিক। তাই তাদেরকে বলা চলে পর্তুগীজ ধর্মদস্যু।

সন্দ্বীপ হারিয়ে কার্ভালো ফিরে যায় শ্রীপুরে, ম্যাটোস দিয়াঙ্গায়, আর অন্যান্য পর্তুগীজ ও ধর্মযাজকরা বাকলা ও যশোরে। এর আগেই হুগলী বন্দরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পর্তুগীজ আধিপত্য। শ্রীপুর থেকে কার্ভালো এসে হাজির হয় হুগলী বন্দরে। ততদিনে বাংলায় মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে। তবুও হুগলী পৌঁছেই কার্ভালো মুঘলদের বিরুদ্ধে কাজে লেগে যায়। একদিকে মুঘলদের বিরুদ্ধে অন্যদিকে আরাকান রাজের বিরুদ্ধে কার্ভালো সংঘর্ষে লিপ্ত হয়; এবং যেহেতু সকল পর্তুগীজই জলযুদ্ধে ছিল বিশেষ পারদর্শী, তাই কার্ভালোই অনেক সংঘর্ষে জয়যুক্ত হয়। কিন্তু হঠাৎ করেই যশোরের প্রতাপাদিত্যের ষড়যন্ত্রে তার মৃত্যু হয়।

ম্যাটোসের একদা অধিনস্থ সৈনিক গঞ্জালেস ছিল সন্দ্বীপে বিশেষভাবে পরিচিত। "Sandwip nafurally recalls the exploits of a romantic ruffian whose name has been written large in letters of blood in the unhappy annals of that island." (ibid, p-361). রক্তের অক্ষরে লেখা এই খুনেদস্যুর নামই গঞ্জালেস। খুন-খারাবি, দস্যুতা ও কখনও কখনও লবণের ব্যবসা করে এই গঞ্জালেস ১৬০৯ সালে সমগ্র সন্দ্বীপেরই অধিপতি হয়ে বসে। এ ব্যাপারে গঞ্জালেস বাকলার অধিপতির সঙ্গে ১৫৫৯ সালের পর্তুগাল রাজের সেই চুক্তির খেলাফ করে। বঙ্গোপসাগরের বদ্বীপ অঞ্চলে তখন বাহুবলের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই সুবাদে সন্দ্বীপের এই নতুন অধিপতির অধীনে গড়ে ওঠে এক বিরাট ক্ষমতাদর্পী বাহিনী-এক হাজারের মত পর্তুগীজ সৈনিক, দুই হাজারের মত ভারতীয় সৈনিক, দুই শত অশ্বারোহী এবং আশিটি সশস্ত্র রণতরী। বাকলার হতভাগ্য অধিপতি এই বিরাট দুর্ধর্ষ বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার আগেই গঞ্জালেস বাকলা অধিপতির অধিকার থেকে কেড়ে নেয় দক্ষিণ শাহবাযপুর ও পটেলডাঙ্গা নামক দুটি দ্বীপ। ইতিমধ্যে গঞ্জালেসের সঙ্গে এসে জোটে আরাকান রাজ পরিবারের এক পলাতক সদস্য, নাম যার অনপোরাম। অবিশ্যি অল্পদিনের মধ্যেই এই নতুন মিত্র নিহত হয়। তাছাড়া বাংলার দক্ষিণ পূর্বাংশের জনপদগুলোর দিকে এগিয়ে আসছে তখন পরাক্রান্ত মুঘল বাহিনী। ফলে, আরাকান রাজ আর গঞ্জালেসের মধ্যে স্থাপিত হয় নতুন মৈত্রী। কিন্তু শীঘ্রই আরাকান রাজের কাছে গঞ্জালেসের মৈত্রী ভঙ্গের বাস্তবতা ধরা পড়ে। মৈত্রী ভেঙ্গে যায়।

গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও গঞ্জালেসের সম্পর্ক প্রীতিকর ছিল না। তবু আরাকান অধিকারের উদ্দেশ্যে গঞ্জালেস বার্ষিক আনুগত্য কর প্রদানের অঙ্গীকার করে গোয়ার সাহায্যপ্রার্থী হয়। আসেও সে সাহায্য। কিন্তু সাহায্য বাহিনীর নায়ক বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে অপ্রত্যাশিতভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় আরকান রাজের নতুন মিত্র ইউরোপবাসী ওলন্দাজ নৌবাহিনীর দ্বারা। সংঘর্ষ চলতে থাকে; কিন্তু ভাগ্য তখন

গঞ্জালেসের বিরুদ্ধে। অবশেষে ফিরে যায় পরাজিত গোয়া বাহিনী এবং তারই সাথে গোয়ায় ফিরে যায় গঞ্জালেসেরই অনেক সহযোদ্ধা। পরের বছর সন্দ্বীপ দখল করে নেয় আরাকান রাজ, আর গঞ্জালেস হয় দুর্ভাগ্যের নির্মম শিকার। এই গঞ্জালেস সম্পর্কে ডক্টর সেন বলেন, "His infamous carrer covered a brief period of ten years. Gonzales had the making of a great leader, but his training and environments made of him a pirate of the lower type. For unrelieved crulty and treachery his record had hardly any parallel, but with better education under more favourable circumstances he might have been a Raleigh or a Drake." (ibid, p-363) কিন্তু সেই শিক্ষা কোথায় এবং কিভাবে পেতে পারত দানবীয় জীবনদর্শনের অধিকারী পর্তুগীজ দস্যুদের অন্যতম খুনে দস্যু এই গঞ্জালেস? ভারত মহাসাগরে এবং সেই সুবাদে বঙ্গোপসাগরে আগত পর্তুগীজ জলদস্যুদের কারুরই তো সে শিক্ষা বা স্বভাব ছিল না। আর এক কার্ভালো বা এক গঞ্জালেসের মৃত্যুতেই বাংলার উপকূল শুধু উপকূলই কেন- বলা যায় সারা বাংলাই পর্তুগীজদের দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পায়নি। বাংলার পাঠানেরা তখন মুঘলদের কাছে পর্যুদস্ত, বাংলার স্থানীয় প্রধান বার ভুঁইয়ারাও ভুগছে মুঘল আতঙ্কে। এমনি অবস্থায় আগত পর্তুগীজ যাদ্ধারা বিভিন্ন ভুঁইয়াদের বাহিনীতে সংযুক্ত। তখনো বাকরগঞ্জের বাকলায়, যশোরের চণ্ডিকানে, ঢাকার শ্রীপুরে, নোয়াখালীর ভুলুয়ায় এবং ঢাকা ময়মনসিংহের কাত্রাবোতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে পর্তুগীজ কলোনি। এমনি প্রেক্ষাপটেই বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল মুঘল নিয়ন্ত্রণ। আর পর্তুগীজেরা স্থানীয় প্রধানদের সাহায্য করার নামে যুদ্ধ ব্যবসা ছেড়ে আঁকড়ে থাকল তাদের বাণিজ্য কুঠিগুলো।

চট্টগ্রামের বন্দরকে পর্তুগীজরা বলত 'Porto grande` বা 'বড় বন্দর'। আর সাতগাঁও এর বন্দরকে 'Porto Pequeno` বা 'ছোট বন্দর'। এই ছোট বন্দরটাই ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু পলিমাটির দরুণ নদীর গতিপথ বদলে যাওয়ায় এবং নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় সেই ছোট বন্দরকে নিয়ে পর্তুগীজরা পড়ল অসুবিধায়। সাতগাঁও থেকে তাই ছোট বন্দর স্থানান্তরিত হয়ে হুগলিতে গেল ষোড়শ শতাব্দীর শেষে দিকে। এই হুগলিতে বন্দর স্থাপনের অনুমতি পর্তুগীজরা পেয়েছিল মুঘল সম্রাট আকবরের কাছ থেকে। সম্রাট আকবর জানতেন পর্তুগীজদের জনশক্তির কথা। তিনি এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পর্তুগীজেরা প্রধানত বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই বিভিন্ন ক্ষুদ্র শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। হুগলী বন্দরে তাদের বাণিজ্যাধিকারের ফরমান পেলে পর্তুগীজেরা বাণিজ্যের উন্নতি বিধানেই সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। তা ছাড়া মুঘল প্রশাসন যখন সমুদ্রপথ নির্বিবাদ রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন পর্তুগীজেরাই সে কাজে সফল হোক। তাই হয়তো তিনি পর্তুগীজদের ফরমান দিয়ে দিলেন। আকবরের পর সম্রাট জাহাঙ্গীরও পিতার সমর্থন করলেন। কিন্তু সম্রাট শাহজাহান অত্যাচারী বলে পর্তুগীজদের বাণিজ্যাধিকারের ফরমান নাকচ করে দেন ১৬৩২ সালে। এমন কি বেশ কিছু সংখ্যক পর্তুগীজ জলদস্যুদের বন্দী করে নিয়ে এলেন আগ্রায়।

সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল চট্টগ্রামে জলদস্যুদের উৎপাত নিয়ে। আরাকানী মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুরা মিলে চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে চালিয়েছিল সীমাহীন অকথ্য অত্যাচার। এই মিলিত দস্যুদলকে লোকেরা হার্মাদ বলে অভিহিত করত। বাংলার উপকূলীয় অঞ্চল থেকে এই হার্মাদরা মানুষজনকে ধরে এনে হুগলী বন্দর থেকে জাহাজে করে দাস হিসাবে চালান দিত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন

বন্দরে। হুগলী পরিণত হয়েছিল এক দাস বাজারে। এরই অবসান কল্পে সম্রাট শাহজাহান পর্তুগীজদের কাছ থেকে হুগলী বন্দর ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নিলেন। হুগলী বন্দর হাতছাড়া হওয়া থেকেই বাংলায় পর্তুগীজ দৌরাত্ম্যের অবসান সূচিত হয় এবং সম্রাট আওরঙজেবের সময়ে তারা বাংলায় একেবারেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তবে বাংলায় পর্তুগীজ সম্প্রদায় কম করে হলেও থেকেই যায়, এবং মজাদার ও বিস্ময়কর ব্যাপার হলোঃ এই দুর্ধর্ষ দুর্বিনীত পর্তুগীজেরা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও তাদের অনেক স্মরণীয় অবদান রেখে গেছে।

এবার ভারতবর্ষের উপকূলীয় পর্তুগীজ সাগর সাম্রাজ্য তাদেরই স্বধর্মী ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা। অর্থাৎ ভারতীয় উপকূলে প্রবেশান্তে পর্তুগীজদের বাণিজ্য প্রাধান্য লাভের উপর তাদের যে বৈষয়িক উন্নতি, তা দেখে ইউরোপের অন্যান্য জাতিরাও ভারত বাণিজ্যে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে একটা মজাদার ব্যাপার ঘটে ১৫২১ সালে। পৃথিবী যে গোল একথা প্রাচ্যে জানা থাকলেও ওই ১৫২১ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় খৃস্টান সমাজের কাছে জানা ছিল না। বিজ্ঞানের এসব 'শয়তানী' ধারণা খৃস্ট ধর্মযাজকদের নির্দেশক্রমে ইউরোপীয় খৃস্টান সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না কিছুতেই। এমনি অবস্থায় ভৌগোলিকভাবে পাশাপাশি অবস্থানকারী দুটি দেশ স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে এসে গেল বাণিজ্যিক বিরোধ। মহামান্য পোপ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এক অনুশাসন জারী করে নির্দেশ দিলেন যে দুটি সমুদ্র পথে ওই দুটি জাতি তাদের বাণিজ্যপোত চালনা করবে। এক জাতি অন্য জাতির চলাপথে অগ্রসর হবে না। তদনুযায়ী, এক জাতি যাবে পশ্চিমাভিমুখে এবং অন্যটি পূর্বাভিমুখে। পোপের অনুশাসনে উত্তর সমুদ্র পথের কোন উল্লেখ ছিল না এবং সে পথে স্পেন পর্তুগালের সমুদ্র যাত্রার অধিকার ছিল না। তাতে করে ইউরোপের অন্যান্য দেশের উদ্যমশীল নাবিকরা উত্তর-পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রপথে বাণিজ্যপোত ভাসাতে থাকল। এল ১৫২১ সাল। ম্যাগেলেন নামক এক স্পেনীয় নাবিক দক্ষিণ আমেরিকা প্রদক্ষিণে যাত্রা করে ক্রমাগত জাহাজ চালিয়ে পৌঁছে গেল পর্তুগাল সাগর সাম্রাজ্যের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। এ সংবাদ ইউরোপে প্রচারিত হওয়া মাত্র তাদের সামনে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে গেল। প্রমাণিত হয়ে গেল যে পৃথবী গোল এবং পোপের ধারণা ভ্রান্ত; তার অনুশাসনও অর্থহীন। অন্য পথে যাত্রা করেও প্রাচ্য বাণিজ্যের তোরণ উন্মুক্ত হয়ে গেল শুধু স্পেনবাসীর সম্মুখে নয়, অন্যান্য জাতির সম্মুখেও। পোপের প্রতি খৃস্টান সমাজের অন্ধবিশ্বাসের ভিতও নড়ে উঠল। ঘটে চলল নতুন নতুন ধ্যান ধারণার উন্মেষ, নবজীবনের অনুসন্ধান। প্রাচ্যের সাগরেও দেখা দিল পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রাচ্যের পথে বাণিজ্যপোত ভাসাল ইউরোপের অন্যান্য দেশ। ইউরোপীয় বণিকদের ভারতবর্ষে আগমনের ধারাবাহিকতা বুঝাবার সুবিধার জন্য নীচে কিছু তথ্য সন্নিবেশিত করা হল।

১৫৯৯ সাল — ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (লন্ডন) প্রতিষ্ঠা।

১৬০০ সাল — ইংল্যাণ্ডের সরকার কর্তৃক লন্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ব্যবসায়ের সনদ প্রদান

১৬০২ সাল — নেদারল্যাণ্ডের ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (ওলন্দাজ কোম্পানীর) প্রতিষ্ঠা।

১৬০৯ সাল — পুলিকটে (ভারতীয় উপকূলে) ওলন্দাজ কোম্পানীর ফ্যাকটরী স্থাপন।

১৬১১ সাল — মসুলিপত্তনে লন্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফ্যাক্টরী স্থাপন।

১৬১৫ সাল — স্যার টমাস রো'র ভারতে আগমন।

১৬১৬ সাল — সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক স্যার টমাস রোকে দরবারে সাক্ষাত প্রদান। ওই সালেই ওলন্দাজ কোম্পানী কর্তৃক সুরাট বন্দরে ফ্যাক্টরী স্থাপন।

১৬১৮ সাল — স্যার টমাস রো কর্তৃক লন্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে বাণিজ্য সনদ লাভ।

১৬২৫ সাল — বাংলার চুচুরাতে ওলন্দাজ কোম্পানীর ফ্যাক্টরী স্থাপন।

১৬২৭ সাল — সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু। ওই সালে অথবা ১৬৩০ সালে শিবাজীর জন্ম।

১৬৩২ সাল — সম্রাট শাহজাহানের হুকুমে পর্তুগীজদের কাছ থেকে হুগলী বন্দরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ।

১৬৩৪ সাল — লন্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলায় বাণিজ্য করার সনদ লাভ।

১৬৩৯ সাল — মাদ্রাজে লন্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক সেন্ট জর্জ দুর্গ প্রতিষ্ঠা।

১৬৫১ সাল — বাংলায় বাণিজ্য করার সুবিধার লক্ষ্যে হুগলীতে লন্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ফ্যাক্টরী স্থাপনের সনদ প্রদান।

১৬৫৮ সাল — সম্রাট হিসেবে আওরঙজেবের অভিষেক।

১৬৬১ সাল — লন্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বোম্বাই এর কর্তৃত্ব লাভ।

১৬৬৪ সাল — শিবাজী কর্তৃক সুরাট বন্দরের লুন্ঠন, ফরাসীদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কাম্পানী প্রতিষ্ঠা।

১৬৬৮ সাল — সুরাটে ফরাসী কুঠির নির্মাণ কাজ আরম্ভ।

১৬৭০ সাল — শিবাজী কর্তৃক দ্বিতীয়বার সুরাট বন্দর লুন্ঠন।

১৬৭৪ সাল — লন্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দূত কর্তৃক গোপনে শিবাজীর অভিষেক উৎসবে যোগদান এবং শিবাজীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন।

১৬৮০ সাল — শিবাজীর মৃত্যু। ইংরেজ কোম্পানীকে সম্রাট আওরঙজেব কর্তৃক সনদ প্রদান।

১৬৮৬ সাল — হুগলী থেকে ইংরেজ কোম্পানী কর্তৃক মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

১৬৯০ সাল — মুঘল ও ইংরেজদের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদন।

১৬৯৮ সাল — নতুন ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা, দূর প্রাচ্যে বাণিজ্য

১৬৯৯ সাল — কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠা।

১৭০৭ সাল — সম্রাট আওরঙজেবের মৃত্যু।

১৭০৮-'০৯ সাল — দুটি ইংরেজ কোম্পানীর একত্রীকরণ।

এমনি অবস্থায় ইংরেজ বণিক সমাজের মধ্যে দেখা দিলেন স্যার যোসিয়া চাইলড। বাণিজ্য ব্যাপারে যা চলছে, তাতে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইংরেজ কোম্পানীর বণিকেরা ওলন্দাজ ফরাসী বণিকদের কাছে মার খাবে, তারই সঙ্গে মুঘলদের কাছে দুর্বল আনুগত্য দেখিয়ে বাণিজ্যের ক্ষতি করবে এটা স্যার যোসিয়া চাইলডের মোটেই পছন্দ ছিল না। মুঘলদের বিরুদ্ধে মারাঠারাজ শিবাজীর ছলাকলা ও অভিপ্রায়ের ব্যাপারে অবগত হয়েছিলেন চাইলড সাহেব। স্পষ্ট বুঝেছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত মুঘলদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটেছে ভারতবর্ষের মাটিতে। তাছাড়া তার বিশ্বাস জন্মেছিল ওলন্দাজ ফরাসীদের শক্তি ও ব্যবহারের মোকাবিলার জন্য শক্তিমত্তারই প্রয়োজন। স্যার চাইলডের এই গরম মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে অল্প দিনের মধ্যেই।

ষোল শতকের প্রারম্ভে পর্তুগীজ নাবিক প্রধান আলমিদা স্বপ্ন দেখেছিল ভারতীয় উপকূলভিত্তিক এক সাগর সাম্রাজ্য বিস্তারের যার অধিশ্বর হবেন পর্তুগাল রাজ। তার ধারণা ছিল, স্থলভাগে ভারতবর্ষে এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু আলবুকার্ক চেয়েছিল সাগরসহ গোটা ভারতবর্ষকেই পর্তুগাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে। সতের শতকের তিরিশের দশকে এসব পর্তুগীজ স্বপ্ন শুন্য মিলিয়ে যায়। কিন্তু নবরূপে সে স্বপ্ন বাসা বাধে এক ইংরেজ উচ্চাভিলাষী স্যার যোসিয়া চাইলডের চোখে। তার বলদৃপ্ত উচ্চারণ অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানীর উচিত হবে, " ....to lay the foundation of a large, welf-grounded, sure English dominion in India for all time to come..... "। সে স্বপ্নেরও ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল ১৬৯০ সালে সম্রাট আওরঙজেবের সঙ্গে জব চার্নকের চুক্তির মাধ্যমে। ১৬৮৬ সালেই হুগলীর যুদ্ধে ইংরেজরা তাদের শক্তির ঝলক দেখিয়ে দিয়েছিল মুঘল শক্তিকে। আর কেউ না বুঝলেও সম্রাট আওরঙজেব ইংরেজের শক্তি সম্ভাবনাকে স্পষ্টতই অনুভব করতে পেরেছিলেন। আর তাই তো ১৬৯০ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ইংরেজদের ওলন্দাজ ফরাসীদের চাইতে অনেক বেশি সুবিধা দিতে, বলা যায়, বাধ্য হয়েছিলেন মহাপরাক্রান্ত মুঘল সম্রাট আওরঙজেব।

তারপর আওরঙজেব উত্তর মুঘল শক্তির দ্রুত অবক্ষয়। দুর্বল পতনশীল মুঘল কেন্দ্রীয় অসহায়তার সুযোগে ইংরেজ কোম্পানী ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলার স্থলভাগেই বাণিজ্য সুবিধার বিস্তার ঘটাতে সমর্থ হয়। "In Bengal, it was impossible to trade on the coast, and the Company`s establishments were inland." (A History of India, Michael Edwardes, NEL Mentor edition 1967, p-12) কিন্তু স্থলভাগেও ইংরেজদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের বাধার সৃষ্টি করতে লাগল ফরাসীরা। ১৬৭৫ সালে ফরাসীরা কুঠি স্থাপন করে পণ্ডিচেরীতে ১৬৯০-৯২ সালে বাংলার চন্দননগরে। "Until 1742, French settlements prospered; after that date, Duplex dreamed the same dreams as josiah Child-the stage was set for the struggle for dominion, ১৭৪২ সাল পর্যন্ত স্থাপনাগুলো উন্নতিলাভ করেই যাচ্ছিল; ওই তারিখের পর ডুপ্লেও যোসিয়া চাইলডের মত একই স্বপ্ন দেখতে লাগলেন.... উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মঞ্চ স্থাপন হয়ে গেল। (ibid p. 13)

পরিশিষ্ট – ক

ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম শক্তির ক্রমধারা

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ- কুল মাখলুকাতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নাযেলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব পবিত্র আল কুরআনের এই বীজ বাণীকে মূল করে সর্বাঙ্গীন মানব মুক্তির লক্ষ্যে নানাবিধ কুসংস্কার পৌত্তলিকতা, বস্তুপূজা, ভোগবাদিতা প্রভৃতির নাগপাশে আবদ্ধ আরববাসীদের মাঝে যার শুভ আবির্ভাব তিনিই মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ দ্বীন বা জীবন বিধান যে ইসলাম তার সার্থক রূপকার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তিনি ছিলেন আরববাসীদের ধর্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় এক কথায়, সামগ্রিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনকারী শ্রেষ্ঠ সংস্কারক। এসব বৈপ্লবিক কৃতিত্বের জন্যই বিশ্বখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ বলেছিলেনঃ যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় আদর্শ মতবাদ সম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক নায়কের শাসনাধীনে আনা হত, তবে একমাত্র মুহাম্মদ (সাঃ) ই সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের আলোকে সারা বিশ্বে সকল মানুষের জন্য কল্যাণমুখী এক মহান ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাটাই ছিল আমদের নবীজি (সাঃ) এর জীবন ব্রত। এই ব্রত সম্পাদনের লক্ষ্যে চরম বিশৃঙ্খল এক সার্বিক পরিস্থিতি থেকে জন্মভূমি আরবকে একটি সুশৃঙ্খল জাতির দেশে পরিণত করতে তার সময় লেগেছিল মাত্র ২৩ বছর। ৬১০ খৃস্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে নবুওত লাভ করে মক্কা জীবনে তিনি ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম প্রচারের প্রকাশ্য কাজ আরম্ভ হয় ৬১৩ খৃস্টাব্দে এবং তার মেরাজ গমন সম্পন্ন হয় ৬১৯ খৃস্টাব্দে। ইসলাম প্রচারে তিনি কুরাইশদের পক্ষ থেকে বিরাট বাধার সম্মুখীন হন; লাঞ্চনা অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অতপর ৬২২ খৃস্টাব্দে মুষ্টিমেয় অনুসারীসহ হিজরত করেন মদিনায়। সেখানে অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিস্থিতিতে নব নির্মিত মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে আরম্ভ করেন একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের অনুশীলন। মদিনার পৌত্তলিক ইহুদী নাসারা ও ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করে ৬২৪ খৃস্টাব্দে সম্পাদন করেন মদিনা সনদ।

এই সনদ প্রণয়নে নবীজি মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলাম ভিত্তিক এক আদর্শ রাষ্ট্র ও তার প্রতিষ্ঠাকারী এক ব্রতশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে যে প্রজ্ঞার পরিচয় দেন, তা তুলনাহীন। মদিনা সনদের শর্তাবলী থেকে তিনটি মানবতাবাদী লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ এক, বহুবিভক্ত মদিনাবাসীদের মধ্যেকার বিবাদ বিসম্বাদ বন্ধ করে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করা। দুই, সম্প্রদায় ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিকের সমানাধিকার ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং তিন, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী সদ্ভাব ও পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মুইরি বলেন, ইহা হযরতের অসামান্য মাহাত্ম্য ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগেই নহে বরং সর্বযুগে ও সর্বকালের মানবতার জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। এভাবে বিশ্ব লোকের রহমত আমাদের নবীজি (সাঃ) মানুষকে দিলেন ইসলাম নির্দেশিত একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রথম রুপরেখা।

এরই সঙ্গে আরম্ভ হল প্রতিবাদী কুরাইশদের সঙ্গে তার কঠোর কঠিন মুকাবিলা, একের পর এক যুদ্ধ। ৬২৪ এ বদরের যুদ্ধ ৬২৫ এ উহুদের যুদ্ধ, ৬২৭ এ খন্দকের, ৬২৮ এ খাইবারের, ৬২৯ এ মুতার যুদ্ধের পর মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয় ৬৩০ খৃস্টাব্দে। তারপরও চলতে থাকে সংঘর্ষ, ৬৩০ খৃস্টাব্দেই তিনি শত্রুর মুকাবিলা করেন হুনাইন তায়েফ ও তাবুকের প্রান্তরে। স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী রাষ্ট্রের সুদৃঢ় ভিত্তি। ৬৩০ খৃস্টাব্দেই তিনি বিদায় হজ্জে এসে আরাফাতের ময়দানে দান করেন তার শেষ অভিভাষণ উম্মতের প্রতি তার শেষ উপদেশ নির্দেশ। অতপর ৬৩২ খৃস্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে তার ওফাত হলে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় দায়িত্ব বর্তায় খোলাফায়ে রাশেদার ওপর।

আব্বাসীদের সামগ্রিক জীবনে নানাবিধ বৈপ্লবিক সংস্কার সাধনে ইসলামের মহানবীর কৃতিত্ব ও সাফল্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কল্যাণমুখী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নানাবিধ পাপাচার, দুর্নীতি অরাজকতা নিন্দনীয় আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মানুষকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ঘোষিত হল তৌহিদের নিষ্কলুষ অমোঘ বাণী আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তৌহিদের এই বীজ বাণীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি ভ্রাতৃসংঘে আবদ্ধ করলেন সকল ইসলাম অনুসারীকে। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে তিনিই সর্বপ্রথম রক্ত বা কৌলিন্যের পরিবর্তে তৌহিদের ভিত্তিতে একটি জাতি গঠন করলেন। ঘোষিত হলঃ সকল মানুষ সমান, মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ তিনিই যিনি আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত এবং মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকামী। সেই সঙ্গে কুঠারাঘাত করা হল অমানবিক দাস প্রথার মূলে।

নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ঘোষিত হল ঃ নারীর ওপর পুরুষের যতটা অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও আছে ততটা অধিকার। এমনিভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাধিত হল বহুবিধ বৈপ্লবিক সংস্কার। একটি শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পুজিবাদী অর্থনীতির মূল্যেৎপাটন করে রাষ্ট্রীয় সম্পদকে জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবহার করার সুব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। এভাবেই মদিনার ধর্মভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো থেকে আরম্ভ হল সর্বাঙ্গীন মানব মুক্তির লক্ষ্যাভিসারী এক ইসলামী বিশ্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পালা।

এখানে উল্লেখ্য যে, নবীজী (সাঃ) র রেসালাত কাল ও পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদা কালে এই ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল পবিত্র মদিনা নগরী।

খোলাফায়ে রাশেদুন

(৬৩২-৬৬১ খৃঃ)

(১) হযরত আবু বকর (রাঃ) ঃ ৬৩২-৬৩৪ খৃস্টাব্দ;
(২) হযরত উমর (রাঃ) ঃ ৬৩৪-৬৪৪ খৃস্টাব্দ ;
(৩) হযরত উসমান (রাঃ) ঃ ৬৪৪-৬৫৬ খৃস্টাব্দ;
(৪) হযরত আলী (রাঃ) ঃ ৬৫৬-৬৬১ খৃস্টাব্দ;

নবীজি (সাঃ) প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় ও জীবন ব্যবস্থাকে পুরাপুরি অনুসরণ করা হয়েছিল বলে এ শাসনকালকে খোলাফায়ে রাশেদা বা সত্যাদর্শী খেলাফত কাল বলা হয়।

উমাইয়া খেলাফত

(৬৬১-৭৫০ খৃঃ)

(১) খলিফা মুয়াবিয়া ঃ ৬৬১-৬৮০ খৃস্টাব্দ;
(২) খলিফা ইয়াজিদ ঃ ৬৮০-৬৮৩ খৃস্টাব্দ;
(৩) খলিফা দ্বিতীয় মুয়াবিয়া ঃ ৩ মাস রাজত্ব করেন ;
(৪) খলিফা প্রথম মারওয়ান ঃ ৬৮৪-৬৮৫ খৃস্টাব্দ;
(৫) খলিফা আবদুল মালিক ঃ ৬৮৫-৭০৫ খৃস্টাব্দ;
(৬) খলিফা প্রথম ওয়ালিদ ঃ ৭০৫-৭১৫ খৃস্টাব্দ;
(৭) খলিফা সুলাইমান ঃ ৭১৫-৭১৭ খৃস্টাব্দ;
(৮) খলিফা উমর বিন আবদুল ঃ ৭১৭-৭২০ খৃস্টাব্দ;
(আজিজ বা দ্বিতীয় উমর)
(৯) খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদ ঃ ৭২০-৭২৪ খৃস্টাব্দ;
(১০) খলিফা হিশাম ঃ ৭২৪-৭৪৩ খৃস্টাব্দ;
(১১) খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ ঃ ৭৪৩-৭৪৪ খৃস্টাব্দ;
(১২) খলিফা তৃতীয় ইয়াজিদ ঃ ৭৪৪ খৃস্টাব্দ ;
(১৩) খলিফা ইব্রাহীম ঃ ৭৪৪ খৃস্টাব্দ;
(১৪) খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান ঃ ৭৪৪-৭৫০ খৃস্টাব্দ;

কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি উমাইয়া বংশীয়দের করায়ত্ত হলে সেখানে প্রবর্তিত হয় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র। খোলাফায়ে রাশেদা কালের মজলিসে শূরার বিলুপ্তি ঘটে। এবং বায়তুল মালকে খলিফার পারিবারিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। বংশীয় শাসকরা হন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাজধানী স্থানান্তরিত হয় দামেস্কে। ইসলামায়ন নীতির পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় আরবায়ন নীতি। তবে আরব সাম্রাজ্য তখন বিশালাকার ধারণ করে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা উৎসাহিত হয় ও প্রসার লাভ করে।

আব্বাসীয় খেলাফত

(৭৫০-১২৫৮ খৃঃ)

(১) আবুল আব্বাস ঃ ৭৫০-৭৫৪ খৃস্টাব্দ;
(২) আল মনসুর ঃ ৭৫৪-৭৭৫ খৃস্টাব্দ;
(৩) আল মাহদী ঃ ৭৭৫-৭৮৫ খৃস্টাব্দ;
(৪) আল হাদী ঃ ৭৮৫-৭৮৬ খৃস্টাব্দ;
(৫) হারুন আল রশিদ ঃ ৭৮৬-৮০৯ খৃস্টাব্দ;
(৬) আল আমীন ঃ ৮০৯-৮১৩ খৃস্টাব্দ;
(৭) আল মামুন ঃ ৮১৩-৮৩৩ খৃস্টাব্দ;

আব্বাসীয় খেলাফত কালে রাজধানী দামেস্ক থেকে স্থানান্তরিত হয় বাগদাদে। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ধারা আব্বাসীয় বংশীয়দের রাজত্ব কালেও অটুট থাকে। বলা হয়ে থাকে, উমাইয়াদের আরবায়ন নীতি তখন ইসলামায়নের নীতিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু সেটা যত না আদর্শগত, তার চাইতে বেশি দেশগত সাম্রাজ্য তখন অনাবর বিভিন্ন জনপদে বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু আব্বাসীয়দের সুদীর্ঘ শাসন কালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দুর্বলতার ধস নামে।

(৮) আল মুতাসিম : ৮৩৩-৮৪২ খৃস্টাব্দ;
(৯) আল ওয়াসিক : ৮৪২-৮৪৭ খৃস্টাব্দ;
(১০) আল মুতাওয়াক্কিল : ৮৪৭-৮৬১ খৃস্টাব্দ;
(১১) আল মুনতাসির : ৮৬১-৮৬২ খৃস্টাব্দ;
(১২) আল মুসতাইন : ৮৬২-৮৬৬ খৃস্টাব্দ ;
(১৩) আল মুতাজ : ৮৬৬-৮৬৯ খৃস্টাব্দ;
(১৪) আল মুহতাদী : ৮৬৯-৮৭০ খৃস্টাব্দ;
(১৫) আল মুতামিদ : ৮৭০-৮৯২ খৃস্টাব্দ;
(১৬) আল মু তাজিদ : ৮৯২-৯০২ খৃস্টাব্দ;
(১৭) আল মুখতাফী : ৯০২-৯০৭ খৃস্টাব্দ;
(১৮) আল মুকতাদির : ৯০৭-৯৩২ খৃস্টাব্দ;
(১৯) আল কাহির : ৯৩২-৯৩৪ খৃস্টাব্দ;
(২০) আল রাযী : ৯৩৪-৯৪০ খৃস্টাব্দ;
(২১) আল মুততাকী : ৯৪০-৯৪৪ খৃস্টাব্দ;
(২২) আল মুসতাকফী : ৯৪৪-৯৪৬ খৃস্টাব্দ;
(২৩) আল মুতী : ৯৪৬-৯৭৪ খৃস্টাব্দ;
(২৪) আল তাঈ : ৯৭৪-৯৯১ খৃস্টাব্দ;
(২৫) আল কাদির : ৯৯১-১০৩১ খৃস্টাব্দ;
(২৬) আল কাইম : ১০৩১-১০৭৫ খৃস্টাব্দ;
(২৭) আল মুকতাদী : ১০৭৫-১০৯৪ খৃস্টাব্দ;
(২৮) আল মুসতাহজীদ : ১০৯৪-১১১৮ খৃস্টাব্দ;
(২৯) আল মুসতারশিদ : ১১১৮-১১৩৪ খৃস্টাব্দ;
(৩০) আল রশীদ : ১১৩৪-১১৩৫ খৃস্টাব্দ;
(৩১) আল মুকতাফী : ১১৩৫-১১৬০ খৃস্টাব্দ;
(৩২) আল মুসতানজিদ : ১১৬০-১১৭০ খৃস্টাব্দ;
(৩৩) আল মুসতাদির : ১১৭০-১১৮০ খৃস্টাব্দ;
(৩৪) আল নাসির : ১১৮০-১২২৫ খৃস্টাব্দ;
(৩৫) আল যাহির : ১২২৫-১২২৬ খৃস্টাব্দ;

ঐতিহাসিক আত তাবারীর মতে, আব্বাসীয় খেলাফতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সূচনা হয়, আল মনসুরের সময়ে, আল মামুন তা পূর্ণ করেন, এবং আল মুতাজিদ তার যবনিকাপাত করেন। এসব নামের সঙ্গে যুক্ত হবে হারুন অল রশীদের নাম। তাঁদের নৈপুণ্য বিদ্যোৎসাহিতা ও দূরদর্শিতা আব্বাসীয় খেলাফতকে স্মরণীয় করে তোলে।

আঞ্চলিক শাসন কর্তাদের উচ্চাভিলাষ ও রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়ে ওঠে। এসব শাসনকর্তা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদেরকে মুসলিম জাহানের 'খলিফা' বলে দাবি করাটা বিজ্ঞজনোচিত মনে না করে 'সুলতান' বলেই নিজেদেরকে অভিহিত করতে লাগলেন। ইবনে খালদূনের মতে, কোন রাজবংশের যোগ্য শাসনকাল সাধারণত একশ বছরের বেশি স্থায়ী হয় না। প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী উমাইয়া খেলাফতের মত আব্বাসীয় খেলাফতের বেলাতেও একথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রায় পাচঁ শ বছর ব্যাপী আব্বাসীয় খেলাফত প্রকৃত পক্ষে একশ বছরের মত সময় গৌরবের সঙ্গে শাসন কার্য চালিয়েছে। ৮৪৭ খৃস্টাব্দ থেকেই খলিফারা প্রকৃত ক্ষমতা হারাতে আরম্ভ করেন। এই অধঃপতন কালে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফতেরও সৃষ্টি হয়- মিশরে ফাতেমীয় খেলাফত, এবং স্পেনে উমাইয়া খেলাফত। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে এ দু'টি খেলাফতও ছিল বংশানুক্রমিক রাজত্ব।

(৩৬) আল মুসতানসির : ১২২৬-১২৪২ খৃস্টাব্দ;
(৩৭) আল মুসতাসিম : ১২৪২-১২৫৮ খৃস্টাব্দ;

ফাতেমীয় খেলাফত

(৯০৯-১১৭১ খৃঃ)

(১) ওবায়দুল আল মাহদী : ৯০৯-৯৩৪ খৃস্টাব্দ;
(২) আল কাইম : ৯৩৪-৯৪৬ খৃস্টাব্দ;
(৩) আল মনসুর : ৯৪৬-৯৫২ খৃস্টাব্দ;
(৪) আল মুইজ : ৯৫২-৯৭৫ খৃস্টাব্দ;
(৫) আল আযীয : ৯৭৫-৯৯৬ খৃস্টাব্দ;
(৬) আল হাকিম : ৯৯৬-১০২১ খৃস্টাব্দ;
(৭) আল যাহির : ১০২১-১০৩৬ খৃস্টাব্দ;
(৮) আল মুসতানসির : ১০৩৬-১০৯৫ খৃস্টাব্দ;
(৯) আল মুসতালি : ১০৯৫-১১০১ খৃস্টাব্দ;
(১০) আল আমীর : ১১০১-১১৩০ খৃস্টাব্দ;
(১১) আল হাকিম : ১১৩০-১১৪৯ খৃস্টাব্দ;
(১২) আল যাফির : ১১৪৯-১১৫৪ খৃস্টাব্দ;
(১৩) আল ফয়েয : ১১৫৪-১১৬০ খৃস্টাব্দ;
(১৪) আল আদিদ : ১১৬০-১১৭৪ খৃস্টাব্দ;
* সালাহউদ্দিন ইউসুফ : ১১৭৪-১১৯৩ খৃস্টাব্দ;
* সালাহউদ্দিনের ৩ পুত্র
রাজ্যের ৩ অংশ রাজত্ব করেন : ১১৯৩-১১৯৬ খৃস্টাব্দ;
* মালিক আদিল : ১১৯৬-১২১৮ খৃস্টাব্দ;
* আল কামিল : ১২১৮-১২৩৮ খৃস্টাব্দ;
* আল আদিল (২য়) : ১২৩৮-১২৪৪ খৃস্টাব্দ;
* আস সালিহ : ১২৪৪-? খৃস্টাব্দ;
* তুরান শাহ : ?-১২৫০ খৃস্টাব্দ;

রাজধানী বাগদাদ ভিত্তিক সুন্নী আব্বাসীয় খেলাফতের বিরোধী মিশরে শিয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সায়ীদ ইবনে হুসাইন। তিনি ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী উপাধিগ্রহণ করে মসনদে আরোহণ করেন। এ বংশেও আল মনসুরের মত যোগ্য খলিফার অভাব ছিল না। কিন্তু প্রায় উম্মাদ খলিফা আল হাকিমের মৃত্যুর পর অযোগ্য খলিফাদের আবির্ভাব ঘটে। এমনি অবস্থায় ১১৭১ খৃস্টাব্দে গাজী সালাহউদ্দিনের অভ্যুদয় মুসলিম শক্তির গুণিত পরিবর্তন সাধিত হয়। ইতোমধ্যে ১০৯৬ খৃস্টাব্দে খৃস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে অবতীর্ণ হয় এবং একের পর এক যুদ্ধে বিজয়লাভ করতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটেই মিশরে প্রথমে নূরউদ্দিন জঙ্গী এবং পরে ১১৭৪ খৃস্টাব্দে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর অভ্যুদয় ঘটে। তার এবং পরবর্তী শাসকদের সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা হবে।

স্পেনে উমাইয়া শাসন ও খেলাফত

(৭৫৬-১০৩১ খৃঃ)

আমীর হিসেবে

(১) আব্দুর রহমান (আদ দাখিল)	ঃ ৭৫৬-৭৮৮ খৃস্টাব্দ;
(২) প্রথম হিশাম	ঃ ৭৮৮-৭৯৬ খৃস্টাব্দ;
(৩) প্রথম হাকাম	ঃ ৭৯৬-৮২২ খৃস্টাব্দ;
(৪) আবদুর রহমান (২য়)	ঃ ৮২২-৮৫২ খৃস্টাব্দ;
(৫) মুহম্মদ	ঃ ৮৫২-৮৮৬ খৃস্টাব্দ;
(৬) মুনজীর	ঃ ৮৮৬-৮৮৮ খৃস্টাব্দ;
(৭) আবদুল্লাহ	ঃ ৮৮৮-৯১২ খৃস্টাব্দ;
(৮) আবদুর রহমান (৩য়)	ঃ ৯১২-৯২৯ খৃস্টাব্দ;
(খলিফা হিসাবে)	
আবদুর রহমান (৩য়)	ঃ ৯২৯-৯৬১ খৃস্টাব্দ;
(৯) দ্বিতীয় হাকাম	ঃ ৯৬১-৯৭৬ খৃস্টাব্দ;
(১০) দ্বিতীয় হিশাম	ঃ ৯৭৬-১০০৯ খৃস্টাব্দ;
(১১) মুহম্মদ আল মাহদী	ঃ ১০০৯-১০৩১ খৃস্টাব্দ;

রাজধানী ঃ কর্ডোভা। ৭১২ খৃস্টাব্দে দামেস্কের উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে তারিক বিন জিয়াদ ও মুসা বিন নুসায়েরের প্রচেষ্টায় স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ৭৫০ খৃস্টাব্দে আব্বাসীয় বংশের হাতে খেলাফত চলে যাওয়ার পর উমাইয়া খলিফা হিশামের দৌহিত্র আবদুর রহমান ইবনে মুয়াবিয়া ছদ্মবেশে দামেস্ক ত্যাগ করেন এবং ৫ বছর পালিয়ে থেকে ৭৫৬ খৃস্টাব্দে স্পেনে এসে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। অতঃপর সেখানে চলতে থাকে রাজতন্ত্রীয় শাসন। তখন তারা মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যতম আমীর। কিন্তু আব্বাসীয় খেলাফতের দুর্বলতার জন্য ৯২৯ খৃস্টাব্দে তৃতীয় আবদুর রহমান সেখানে উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। পরিশেষে তাদেরও দুর্বলতা ও অযোগ্যতার জন্য ১০৩১ খৃস্টাব্দে স্পেন থেকে উমাইয়া শাসন এবং সেই সঙ্গে মুসলিম শাসনেরই অবসান ঘটে। ক্রুসেড পর্যন্ত মুসলিম শাসন বিলম্বিত হয়নি।

An Englishman at the Court of Sivaji

The great antagonist of Aurangzeb, Sivaji was the subject of many and hostile contemporary descriptions. The one given here by Henry Oxinden is plain, unbiased, and factual. Oxinden was sent by the President and Council of the East India Companys factory at Surat to negotiate with sivaji for the privileges of trade. The problem presented to the British was how to deal with sivaji, who was actually in possession of the ports of the west coast, without antagonizing Aurangzeb. Oxinden was successful in his negotiations and a grant was made by sivaji on 12 june 1674. This narrative is taken from an Ms. Diary in the India Office Library, London.

The 22nd; We received orders to ascend up the hill into the castle, the Raja having enordered us a house there; which we did.

Leaving Pancharra about three of the clock in the afternoon, we arrived at the top of that strong mountain about sunset, which is fortified more by nature than by art, being of very difficult access, with but one advance to it which is guarded by two narrow gates, and fortified with a strong wall high and bastions thereto. All the other part of the mountain is a direct precipice, so that it is impregnable except the treachry of some in it betrays it. On the mountain are many strong building, as the Raja`s court and houses for other Ministers of State, to the number of about three hundred. It is in length about two and a half miles and breadth half a mile; but no pleasant trees nor any sort of grain grows thereon. Our house was about half a mile from the Raja`s palace, into which we retired with no little content.

The 26th: The Raja, by the solicitation of Naranji Pandit, gave us audience though busily employed with other great affairs, as his coronation, marriage, etc. I presented him and his son, Sambhuji Raja, with those particulars appointed for them by the President and Council, which they seemed to take very kindly, and the Raja assured us that we might now trade securely in his dominions without the least apprehension of evil from him, for that the peace was concluded. I repied that was our intent, and to that effect the President of the Council had sent me to his court to procure some Articles signed and privileges granted by him, which were the same we enjoyed in Hindustan, Persia, etc, where we traded. He answered it was well, and referring me to Moro Pandit, his Peshwa or Chancellor to examine the Articles and give an account what they were, he and his son took their leaves and retired into their private apartments, where they were busily employed with the Banyans in consultation and other ceremonies, and will hear of no manner of business until the coronation be over. We likewise departed to our house again, when I gave his Honour an account of my transactions hitherto.

May 28th : Went to Naranji Pandit and took his advice concerning the presenting the rest of the Ministers of State who told me that I might go in person to Moro Pandit, but to the rest I should send what was for them by Narayan Sinay, declaring likewise that if I would have our business speedily effected and without impediment, it was necessary to present some officers with pamerins [lenghs of fine cloth] etc. who were not mentioned in our list of presents, to which I assented considering that the time of year was far spent, and that should we forced to stay the whole rains at Rahiri, the Honourable Companys charge would be greater than the additional presents came to, and therefore desired to know who they were which we must oblige. He answered that two pamerins were not enough for Moro Pandit, that we must present him with four, and Dataji Pandit wakia novis or public

intelligencer with a ring that is valued at 125 rupes; the Dabir or Persian escrivan, with four pamerins Samji Naiji keeper of the Seal, with four pamerins and Abaji Pandit with four pamerins and then I need not doubt of a speedy conclusion. Otherwise they would raise objection and scruples on purpose to impede our negotiations; for every officer in court expeceted something according to his degree and charge. So we took our pamerins etc., for them, and went, accompained by Naranji Pandits son, to Moro pandit with his present who received it very kindly and promised he would press the Raja to confirm the Articles and dispeed us, as did all the rest of the ministers unto whom by Naranji Pandits advice, I sent Narayan Sinay and a servant of my own.

The 30th: The Raja was married to a fourth wife without any state of ceremony, and doth every day distribute his alms to the Brahmins.

The 9th and 10th: Every day solicited Naranji Pandit to get our Articles signed and dispatch us, the rains being sent in violently......

The 11th : Naranji Pandit sent word that the Raja had granted all the demands and Articles excepting our money passing current in his country which he accounted needless and had signed them; that tomorrow the rest of the Ministers of State would sign them and that we might depart as soon as we pleased.

The 12th: This day the rest of the Ministers of State Signed the Articles, and I went to receive them at the Pandits house, when they were delivered me by him, who expressed much kindness for our nation and promised on all occasions to negotiate our business at court with the Raja. for which having rendered him thanks, and given a cousin of his a pamerin for his pains in translating the Articles and other services, I took my leave of him.

The 13th : Departed Rahiri castle and the 16th arrived at Bombay and delivered his Honour the Articles of peace signed and ratified by Sivaji and his Ministers of State.

(A history of India, Michael edwardes 1967 pp. 163-166)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পলাশী প্রহসনের কথকতা ও নবাব সিরাজ

বন্দর কালিকট ও রণক্ষেত্র পলাশী। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর কালিকট। পাশ্চাত্যের পর্তুগীজ নাবিকদল ভাস্কো ডা গামার নেতৃত্বে কালিকট বন্দরে তাদের বাণিজ্য পোতের নোঙর পড়েছিল ১৪৯৮ সালের ২০ শে মে। ভারতবর্ষের বন্দরে ইউরোপীয় বাণিজ্য পোতের এই-ই প্রথম নোঙর। ভাস্কো ডা গামা পর্তুগাল-অধিপতি রাজা ম্যানুয়েলের আশীর্বাদ নিয়ে ভারতবর্ষের পথে রওনা দেয় ১৪৯৭ সালের জুলাই মাসে; প্রায় ১১ মাস পরে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে তারা এসে পৌঁছায় কালিকটে। আরম্ভ হয় ইউরোপীয় বণিকদের ভারতবর্ষীয় উপকূল পরিক্রমা। এ পরিক্রমা শুরু করে পর্তুগীজরা, ক্রমে সে পরিক্রমায় শরীক হয় ইউরোপের আরও আরও জাতি- ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার, বেলজিয়ান, ইংরেজ। কালিকট থেকে যে পরিক্রমার শুরু, সমাপ্তি তার হুগলী-কলকাতা হয়ে মুর্শিদাবাদের স্থল রণক্ষেত্র পলাশীতে, ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন তারিখে।

এই পরিক্রমা শুরু করেছিল পর্তুগীজ ভাস্কো ডা গামা, শেষ করেছে ইংরেজ রবার্ট ক্লাইভ। সময়ের ব্যবধান প্রায় দু'শ ষাট বছর। এই সময়ের মধ্যে যা ঘটেছে, তা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, অসীম তাৎপর্যপূর্ণও। গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ এজন্য যে, সম্পদ প্রাচুর্যে ভরপুর এই ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান এবং সম্পদ লোভাতুর ইউরোপীয়, বিশেষ করে ইংরেজ, বানিয়াদের ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা হয় এই সময়টাতেই। গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ এজন্যও যে, এ সময়টায় সংঘটিত ঘটনাবলীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেসবে সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের চরিত্র-পরিচয়। সর্বোপরি, এসব ঘটনা স্মরণযোগ্য এজন্য যে এতদ্দেশীয় সাধারণ মানুষের কান্নাহাসির ইতিহাস এসবের সঙ্গে জড়িত।

ঘটনাবলী-সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের ভাগ্য পরিবর্তনের এই সূচনা কালের লীলাখেলা ও ছলাকলা, তার পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ বিস্তৃত বিভিন্নমুখী প্রেক্ষাপট। লীলাখেলা ও ছলাকলার প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে ওই প্রেক্ষাপটে পূর্ণ অবহিতির বিশেষ প্রয়োজন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্য কথা, ধর্মীয় ব্যবহার কথা, সংশ্লিষ্ট জনদের চরিত্র কথা সব কিছু দিয়েই রচিত এই সুদীর্ঘ বিস্তৃত বিভিন্নমুখী প্রেক্ষাপটের কথকতা। এই কথকতায় জড়িয়ে আছে বাণিজ্য সূত্রে এতদ্দশে পদার্পণ করে বিদেশী বানিয়ার রাজ্যপ্রাপ্তির কল্পনাতীত অঘটন, জড়িয়ে আছে এতদ্দেশীয় চরিত্রানুগ স্বার্থচিন্তা, পাশ্চাত্য বানিয়াদের অন্তর্কলহ, এতদ্দেশীয় স্বার্থান্বেষীদের কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার আত্মঘাতী মনোবিকার, এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্য বানিয়াদের দানবীয় শোষণ প্রবৃত্তির প্রকাশ। এই দানবীয় প্রবৃত্তির মূলে কাজ করেছে ইসলাম অনুসারীদের বিরুদ্ধে খৃস্ট ধর্মানুসারীদের যুগ সঞ্চিত যে সহিংস ও হিংস্র মনোবৃত্তি, তার নির্লজ্জ প্রকাশ। ভারতীয় উপকূল পরিক্রমার সমাপ্তিতে পলাশীর বিপর্যয়কে সম্যকরূপে বুঝতে হলে ওই সুদীর্ঘ বিস্তৃত বিভিন্নমুখী প্রেক্ষাপটকে জানতে হবেই-যা অনেকটাই তুলে ধরা হয়েছে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ সমূহে।

এবার পলাশীর কথা। পলাশীর যুদ্ধকে প্রায় সবাই বলেন 'প্রহসন'। সেই পলাশী

প্রহসনের দিনটি ছিল ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন, বৃহস্পতিবার। এই দিনে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজ উদ দৌলার বাহিনীকে 'পরাজিত' করেছিল ইংরেজ বানিয়া কোম্পানীর অধিনায়ক রবার্ট ক্লাইভের বাহিনী। ইংরেজ ঐতিহাসিক লেঃ কর্নেল ম্যালিসনের মতে নবাব বাহিনীতে ছিল ৩৫০০০ পদাতিক সিপাহী, ১৫ ০০০ অশ্বারোহী সেনা এবং ৫৩ টি কামান; ঐতিহাসিক ওর্মির মতে ৫০০০০ পদাতিক, ১৪ ০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০ টি কামান' আর স্ক্রাফটনের মতে ৫০০০০ পদাতিক, ১৫০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০ টি কামান। এবং কোম্পানী বাহিনীতে ছিল ৯০০ ইউরোপীয় সৈন্য, ১০০ তোপাসী এবং ২০০০ দেশীয় সিপাহী। স্পষ্টতই, ইউরোপীয় ও দেশীয় সিপাহী তোপাসী নিয়ে সর্বমোট ৩০০০ এর মত এক ক্ষুদ্র কোম্পানী বাহিনী হারিয়ে দিয়েছিল প্রায় ৬৫০০০ এর এক বিশাল নবাব বাহিনীকে। এমনিতে ব্যাপারটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক পলাশীর এই যুদ্ধকে যুদ্ধই বলতে চাননি। পলাশীর যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে কোন যুদ্ধই ছিল না, ছিল ষড়যন্ত্রমূলক একটা যুদ্ধের অভিনয় মাত্র, একটা পাতানো যুদ্ধের খেলা, একটা প্রহসন। ঐতিহাসিক শ্রী নিখিলনাথ রায় এর কথায়, "বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পলাশীতে যে ইংরেজরা জয়লাভ করিয়াছিলো, ইহা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেরই মত। আমরা আর একজন ইংরেজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছিঃ Truth will ascribe the achievement to treachery (মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, শ্রী নিখিলনাথ রায়, ৩য় সংস্করণ, ১৩১৬ সন, পৃঃ ২২২)। উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত প্রায় ৬৫০০০ নবাব বাহিনীভূক্ত সৈন্যের মধ্যে প্রায় ৪৫০০০ সৈন্যই ছিল বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি সেনানায়কদের অধীনে। তাই তেইশে জুনকে অভিহিত করা যায় 'পলাশী প্রহসনের দিন' বলে। প্রকৃত প্রস্তাবে এ দিনটিকে এতদ্দেশীয়দের জন্য, বিশেষ করে মুসলিমদের জন্য, এক ভাগ্য বিপর্যয়ের দিন বা 'পলাশী বিপর্যয়ের দিন'ও বলা যায়। কার্য কারণের নিরিখে বিশ্লেষণ করলে এ দিনটিকে বরং এতদ্দেশীয় মুসলিমদের ভাগ্য বিপর্যয়ের চুড়ান্ত ফল প্রকাশের দিন হিসাবেও চিহ্নিত করা যায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তেইশে জুন ছিল যুদ্ধাভিনয়ের মাধ্যমে বহুকাল ধরে চলমান একটা গভীর ষড়যন্ত্রের সাফল্য প্রকাশের দিন। বক্ষমান আলোচনায় এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে প্রয়াস পাব। তার আগে এখানে উদ্ধৃত করব ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় এর কথাঃ "ভারতীয় সমাজের বিপর্যয়ের সুযোগ লইয়া বিদেশী ইংরেজ শক্তি সহজলব্ধ শিকার হিসাবে ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয় তাহারই আরম্ভ মাত্র।

.... তৎকালে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী নিজ নিজ গভীর সংকটের আবর্তে তলাইয়া যাইতেছিল, সমাজের উপরতলার বিভিন্ন শক্তি পরস্পরের সহিত হানাহানি করিয়া পরস্পরের ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করিতেছিল। বিদেশী ইংরেজদের উন্নত শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা কাহারও আর অবশিষ্ট ছিল না। ইংরেজ শক্তিও এতদিন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। এবার তাহারা দ্রুত অগ্রসর হইয়া ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল বঙ্গদেশে জাঁকিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষকেই গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল।" (ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুপ্রকাশ রায়, ১৯৬৬, পৃঃ ৭)।

পলাশী বিপর্যয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল তিনটি প্রধান শক্তি বা গ্রুপ। নবাবের অনুগত প্রধানেরা, নবাবের বিরোধী প্রধানেরা এবং ইংরেজরা। নবাবের বিরোধী গ্রুপটি

নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত জগৎশেঠ মাহতাব চাঁদ, রাজবল্লভ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, দুর্লভরাম প্রভৃতি হিন্দু প্রধানদের দ্বারা। ঐতিহাসিক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তার 'পলাশীর যুদ্ধ' গ্রন্থে খোলাখুলিই লিখেছেনঃ "ষড়যন্ত্রটা আসলে হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র".... হিন্দুদের চক্রান্ত হলেও বড় গোছের মুসলমান তো অন্তত একজন চাই। নইলে সিরাজ উদ দৌলার জায়গায় বাংলার নবাব হবেন কে? ক্লাইভ তো নিজে হতে পারেন না। হিন্দু গভর্ণরও কেউ পছন্দ করবেন কি সন্দেহ? জগৎশেঠরা তাদেরই আশ্রিত ইয়ার লুৎফ খাকে সিরাজ উদ দৌলার জায়গায় বাংলার মসনদে বসাতে মনস্থ করেছিলেন। উমিচাঁদেরও এতে সায় ছিল। কিন্তু ক্লাইভ ঠিক করলেন অন্যরকম। তিনি এমন লোককে নবাব করতে চান যিনি ইংরেজদেরই তাঁবে থেকে তাদেরই কথা শুনে নবাবী করবেন। ক্লাইভ মনে মনে মীর জাফরকেই বাংলার ভাবী নবাবী পদের জন্য মনোনীত করে রেখেছিলেন। (পলাশীর যুদ্ধ, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রথম মুদ্রণ, পৃঃ ১৫৮-১৫৯)। এই যে তিনটি শক্তি বা গ্রুপ পলাশীতে তাদের ভূমিকার স্বরূপ জানতে হলে সময়ের বেশ কিছু উজানে চলে যেতে হবে। সেই উজান থেকে ভাটির পথে পলাশীমুখী হলেই শক্তিত্রয়ের পরিচয়, উদ্দেশ্য এবং তাদের কার্যাবলীর স্বাভাবিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। উজান থেকে ভাটির দিকে এই পথ পরিক্রমার প্রথমেই আসবে ইউরোপীয় ক্রুসেডার ও প্রাচ্যের মুসলিম শক্তির সংঘর্ষমুখী বৈরিতার কথা, আসবে মুসলিমদের কাছে ভারতবর্ষের পরাজিত ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির পুনরুত্থানের কথা এবং অযোগ্যতার পথে ক্রমধাবমান মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির কথা। এবং এসব কথা সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই অবহিত হয়েছি। আমাদের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে দুটি ঘটনাকে স্মরণ করতে পারি। প্রথম ঘটনাটি ১৬৭৪ সালের ১২ জুন মারাঠা নায়ক শিবাজী এবং লন্ডন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দুত মিষ্টার হেনরী ওকসিনডেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক গোপন চুক্তির মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ১৭৫৭ সালের সেই জুন মাসেই সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি ও শিবাজী স্বপ্নের লালনকারী জগৎশেঠ রাজবল্লভাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নবাব সিরাজের বিরোধী গ্রুপের সাজানো নেতার গোপন চুক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল প্রবল পরাক্রান্ত সুচতুর বাদশা আওরঙজেবের অগোচরে; আর দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল স্বদেশের স্বাধীনতাব্রতী তরুণ নবাব সিরাজ উদ দৌলার অগোচরে। দুটি ঘটনারই লক্ষ্য ছিল হিন্দুস্থানে কার্যকরী মুসলিম শক্তির পতন।

১৭০৭ সালে বাদশা আওরঙজেবের মৃত্যুর পর মুঘলশক্তি অতি দ্রুত ধ্বংসের পথে ধাবমান হয়। অযোগ্যতা, অদুরদর্শী স্বার্থপরতা, আর বিশ্বাসঘাতকতা ঘিরে ধরে মুঘল শক্তিকে, তার প্রশাসনকে। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের অজ্ঞানসুলভ কার্যাবলী এই উপমহাদেশের মুসলিম শক্তির মূলে হানতে থাকে মরণ আঘাত। ফলে, অরাজকতায় ছেয়ে যায় মুঘল সাম্রাজ্য। কেন্দ্রীয় শক্তিকে পাত্তা না দিয়ে আঞ্চলিক প্রধানেরা নিজ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে যান। ধ্বংসের এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে তোলে ১৭৩৯ সালে নাদির শাহর দিল্লী অভিযান। কাল প্রবাহে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে মুঘল সামরিক শক্তি। ঐতিহাসিক আই এইচ কোরাইশীর কথায়, এমনি অবস্থায় মুঘল শক্তি কিছুটা প্রাণস্পন্দন নিয়ে টিকেছিল বাঙ্গলায়, অযোধ্যায়, মহীশুরে ও হায়দ্রাবাদে। একদা প্রবল প্রতাপান্বিত মুঘল শক্তির এই ধ্বংসপ্রাপ্ত পতিত অবস্থায় আঞ্চলিক শক্তি চতুষ্টয়ের অন্যতম সুবে বাংলার শক্তি ছিল আর কতটুকু? ইংরেজ বানিয়াদের যে সাগর শক্তির পরিচয় পেয়ে বাদশা আওরঙজেব

পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, সে শক্তির মোকাবিলা করতে নবাব সিরাজ পলাশীতে গিয়েছিলেন এমন এক শক্তির উপর নির্ভর করে যা ছিল সেনাপতি সেনানায়কদের বিশ্বাসঘাতকতায় পীড়িত। ভুল করেই নবাব সিরাজ বিশ্বাস করেছিলেন এদের সবাইকে। বিশ্বাস করেছিলেন তার সকল সমর প্রধানকেই যাদের মধ্যে প্রধান তিনজনের নিয়ন্ত্রণে ছিল প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সৈন্য। ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের ছক আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট ছিল। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের সেই মহারণে কৌরব পক্ষীয় সপ্তরথী যে চক্রব্যূহ রচনা করেছিলেন, তাতেই বিজয়ের আশায় প্রবেশ করেছিলেন মহাবীর অর্জুন পুত্র তরুণ বীর অভিমন্যু। প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু সে ব্যূহ ভেদ করে আর বেরিয়ে আসতে পারেন নি অভিমন্যু। তরুণ নবাব সিরাজও তেমনি শক্তিধর ইংরেজ বানিয়া ও বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা সুরচিত ষড়যন্ত্রের পলাশী রণব্যূহে প্রবেশ করেছিলেন; কিন্তু নিজেকে তথা স্বদেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারেন নি।

মুঘল সাম্রাজ্যে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত থাকত বিভিন্ন সমর প্রধানদের হাতে, ঠিক রাষ্ট্র প্রধানের হাতে নয়। তাই কার্যত সৈন্যদের প্রত্যক্ষ আনুগত্যও থাকত সেসব সমর প্রধানের প্রতি, ঠিক রাষ্ট্র প্রধানের প্রতি নয়। এমনি অবস্থায় তিন জন বিশ্বাসঘাতক সমর প্রধানের অধীনস্থ প্রায় ৪৫০০০ সৈন্যের প্রত্যক্ষ আনুগত্যও যতটা ছিল সেসব সমর প্রধানের প্রতি, ঠিক ততটা ছিল না নবাব সিরাজের প্রতি। শুধুমাত্র সেনানায়ক মীর মর্দান ও মোহনলালের নিয়ন্ত্রিত সৈন্যেরা এবং নবাবের নিজস্ব বাহিনীর সৈন্যেরাই অনুগত ছিল নবাব সিরাজের প্রতি।

এ ব্যাপারটার সঙ্গে তখনকার দিনে যুদ্ধে ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রের যথাযথ ব্যবহারের বিষয়টাও জড়িত। এ প্রসঙ্গে এখানে ঐতিহাসিক লেঃ কর্নেল ম্যালিসনের মতামত তুলে ধরতে চাই। বলে রাখা ভাল যে, ম্যালিসন সাহেব তার The Decisive Batles of India রচনা করেছিলেন Stewart এর History of Bengal, Orme এর Military Transactions, সিয়ার উল মুতাক্ষরীন, Caraccioli-এর Life of Clive প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। সেই ঐতিহাসিক ম্যালিসনের ভাষ্য হচ্ছে (অনুবাদ) ঃ " এটা সত্য যে নেটিভ প্রধানেরা কামান বন্দুকের অধিকারী ছিলেন; কিন্তু ওগুলো, নিয়ম মোতাবেকই শুধুমাত্র অযত্নরক্ষিতই থাকত না অথবা থাকত এত পুরনো যে তাতে অগ্নিসংযোগ করা ছিল রীতিমত বিপজ্জনক; কিন্তু নেটিভ সেগুলোর পরিচালনায় ছিল এতটা অদক্ষ যে সেসব থেকে ঘন্টার এক চতুর্থাংশ (অর্থাৎ ১৫ মিনিটে) সময়ে একবার গোলা নিক্ষেপ করতে পারলেই মনে করত যে কাজটি তারা সুসম্পন্ন করেছে। ইউরোপীয়দের সঙ্গে কখনো যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার কারণে তাদের কোন ধারণাই ছিল না যে ওগুলো থেকে মিনিটে পাঁচ ছয়বার গোলা নিক্ষেপ করা ছিল সম্ভব। (The Decisive Battles of India, Lt. Col. Malleson, 1885. pp. 42-43)

কাজেই আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় দক্ষতাবিহীন ২০ হাজারের মত অনুগত বাহিনী মরচে ধরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মীর মর্দান মোহনাল তখনকার আধুনিক যুদ্ধে সুশিক্ষিত ক্লাইভ বাহিনীর বিরুদ্ধে সহজ বিজয় অর্জন করবেন কিভাবে? তা ও তো এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বিজয়ের দ্বারপ্রান্তেই পৌঁছে গিয়েছিল নবাব বাহিনী। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টি আর ইংরেজ কামানের গোলায় গোলাম মীর মর্দানের মৃত্যু সে বিজয়কে অসম্ভব করে তুলল

সর্বোপরি প্রায় ৪৫০০০ সৈন্যের অধিনায়কদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা এবং সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ রাখার জন্য মীর জাফরের উপদেশ নবাবের পরাজয়কেই অবশ্যম্ভাবী করে তুলল।

নবাব সিরাজের চোখে ধরা পড়ল যখন ষড়যন্ত্রের প্রকৃত চিত্র, তখন পলাশী ত্যাগ করে তিনি দ্রুত ফিরে এলেন রাজধানীতে। তখনও তার মনে আশা-বিশ্বাসী যারা তখনও ছড়িয়ে আছেন দেশের বিভিন্ন স্থানে, তাদেরকে সংগঠিত করে শেষ চেষ্টা করবেন দেশকে বাঁচাতে। কিন্তু পারলেন না। পারলেনা না বাঁচাতে নিজেকেও। রাজমহলের কালিন্দী তীরবর্তী স্থানে ধৃত হয়ে নবাব সিরাজ আনীত হন মুর্শিদাবাদে। ১৭৫৭ সালের ৩রা জুলাই জগৎশেঠ ও ক্লাইভের দৃঢ় নির্দেশে মীর জাফরের অনুমতিক্রমে মীরন প্রেরিত মুহাম্মদী বেগের নির্মম অস্ত্রাঘাতে শহীদ হন স্বাধীনতাব্রতী সুবে বাংলার নবাব সিরাজ উদ দৌলা। তখন তার বয়স প্রায় ২৪ বছর মাত্র।

পলাশী যুদ্ধ ঐতিহাসিক ম্যালিসন বলেন (অনুবাদ) ঃ হ্যা বিজয় হিসাবে, ফলাফলের দিক থেকে, পলাশী ছিল এ যাবৎ বিজয়গুলোর সেরা। কিন্তু যুদ্ধ হিসাবে, আমার মতে এটা গৌরব করার মত কিছু নয়। প্রথমত, এটা ছিল না কোন নির্দোষ যুদ্ধ। কে সন্দেহ করবে, সিরাজ উদ দৌলার তিন প্রধান জেনারেল যদি তাদের মনিবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তাহলে পলাশীর বিজয় হতে পারত না? মীর মুদিন (মর্দন) খানের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজরা কোন অগ্রগতিই লাভ করতে পারে নি; (তখন পর্যন্ত) পশ্চাদসরণে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল। ..... না, তারও অধিক, ৯ ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩ শে জুনের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিচারে বসে নিরপেক্ষ কোন ইংরেজই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, সম্মানের মান স্কেলে সিরাজ উদ দৌলার নাম ক্লাইভের নামের অনেক উপরে অবস্থিত। সিরাজ উদ দৌলা ছিলেন ওই বিয়োগান্ত নাটকে প্রধান চরিত্রসমূহের মধ্যে একক চরিত্র যিনি প্রতারণা করতে চেষ্টা করেন নি।" (প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৩ এবং ৭৬)।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কি ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল ওই ৯ই ফেব্রুয়ারী এবং ২৩ শে জুনের মধ্যে? ৯ ই ফেব্রুয়ারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও নবাব সিরাজের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় এক সন্ধিপত্র যাতে কোম্পানী লাভ করে আগের চাইতে অধিক সুবিধা। নবাবের কলকাতা বিজয়কালে যে সম্পদের ক্ষতি সাধন হয়, তার পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতিও নবাবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু ক্লাইভ এতেও সন্তুষ্ট হয়নি। তার মনে তখন ভারতবর্ষে ফরাসী আধিপত্য ধ্বংস করে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের বাসনা উদগ্র হয়ে উঠেছে। এর আগে ইংরেজরা কর্ণাটকে ফরাসীদের এক হাত দেখিয়ে দিয়েছে। ফরাসী সমর্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে কর্ণাটকের মসনদে ইংরেজরা বসিয়েছে তাদের অনুগত জনকে। কর্ণাটকের অনুরূপ ঘটনা সুবে বাঙ্গালাতেও ঘটবে না কেন? ওই সময়টায় ফরাসী যুদ্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

২৩ শে মার্চ নবাব সিরাজের উপদেশ নির্দেশ উপেক্ষা করে ক্লাইভ চন্দননগরে ফরাসী দুর্গ দখল করে বসে। স্বাভাবিকভাবেই নবাব সিরাজ এতে খুবই ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হন। এর মধ্যেই আবার খবর পাওয়া গেল আফগান বীর আহমদ শাহ আবদালীর দুর্ধর্ষ বাহিনী এগিয়ে আসছে সুবে বাঙ্গালার পথে। বাধ্য হয়ে নবাব সিরাজকে উত্তরাঞ্চলের দিকে মনোযোগী হতে হল। এদিকে ইংরেজদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নবাবের

সেনাপতি সেনানায়ক ও অন্যান্য প্রধানেরা নবাব বিরোধী কার্যক্রমে নিষ্ঠাভরে যোগ দিল। দুশ্চরিত্র সভাষদ বেষ্টিত নবাব এমনি পরিস্থিতির শিকার হয়ে সমস্যার জালে আবদ্ধ হয়ে সিংহ শাবকের মত অসহায় বোধ করতে লাগলেন। তদুপরি, ইংরেজদের দাবী ফরাসীদের সময়টা যথাসম্ভব সরিয়ে রাখতে হবে রাজধানী থেকে দূরে।

এর পরবর্তী ক্লাইভেরই দ্বারা এমনি কার্যাবলীতে চিহ্নিত হয়ে আছে যাতে প্রমাণিত হয় যে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ কোম্পানী পুরাপুরিভাবেই নিয়ম নীতি বিগর্হিত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল। ইংরেজদের চন্দননগর দুর্গ আক্রমণের পর থেকে ৩ মাস ধরে কোম্পানী আর নবাবের মধ্যে চলে সুবিধাদি প্রদান প্রসঙ্গে উষ্ণ বাক বিতণ্ডা। এসব বিতণ্ডা থেকে ইংরেজ কোম্পানীর প্রতি নবাব সিরাজের অবিশ্বাস বেড়ে যায়। এরই প্রেক্ষাপটে নবাব কাশিমবাজারের নিকটবর্তী স্থানে রাজা দুর্লভরাম ও মীর জাফরের নেতৃত্বে সেনা সমাবেশ করেন। স্বাভাবিকভাবেই এতে প্রমাদগণে ইংরেজ কোম্পানী। তখনই ঘটে যায় এক বিচিত্র ঘটনা। বেরারের মারাঠা প্রধানের এক পত্র নিয়ে দূত আসে কলকাতায় কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কাছে। পত্রে কোম্পানীর কাছে মারাঠা প্রধানের এই অভিপ্রায় জানানো হয় যে, তিনি ১ লক্ষ ২০ হাজার মরাঠা সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের সাহায্য কল্পে বাংলার পথে ধেয়ে আসতে চান। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ পত্রটি পাঠিয়ে দেন নবাবের কাছে একথা প্রমাণ করার জন্য যে ইংরেজরা নবাবের শত্রু নয়।

ইংরেজদের এই চালাকি ফলপ্রসূ হয়। ইংরেজ মারাঠা আঁতাতে সৃষ্ট চক্রান্তের ফাঁদে আবদ্ধ হন নবাব। ইংরেজদের আবার বিশ্বাস করে তিনি স্বীয় বাহিনীকে ফিরিয়ে আনেন মুর্শিদাবাদে। সফল হয় ক্লাইভের দাবার মোক্ষম চাল। মুসলিম নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজ মারাঠা মৈত্রীর কী অপূর্ব খেলা। এখানে আবার স্মরণযোগ্য ১৬৭৪ সালের ১২ জুন শিবাজীর রাহিরী দুর্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দূত হেনরী ওক্সিনডেন ও শিবাজীর মধ্যে সম্পাদিত মুঘল বিরোধী সেই গোপন চুক্তির কথা। এর মধ্যে নবাব পক্ষীয় বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে ক্লাইভের মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল। এবং এ ব্যাপারে নবাবের আবার জ্ঞানোন্মেষ ঘটল যখন, তখন নিজ কর্তব্য সম্পর্কে তিনি দ্বিধাহীন হলেন।

এরপর তো ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত ধাবিত হল পলাশীর দিকে। আর এই পলাশীতেই সুবে বাংলার পতন, নবাব সিরাজের পতন। এই পতনে দেশের স্বাধীনতা বিক্রিত হয়ে গেল বিদেশী বানিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে এবং কার্যত সূচিত হয়ে গেল ভারতবর্ষেরও পতন প্রক্রিয়া। নবাব সিরাজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যর্থতা সম্পর্কে ডক্টর মোহর আলী বলেন (অনুবাদ)ঃ তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন তার ব্যক্তিগত অপূর্ণতা ও অযোগত্যতার জন্য নয়, ব্যর্থ হয়েছিলেন তার সভাষদদের চরিত্র সঙ্কটের জন্য এবং ওই সময়ের পারিপার্শ্বিকতা তার বিরুদ্ধে থাকার জন্য। তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, কারণ তার নিজের লোকেরাই তাকে প্রতারিত করেছিল, তখনকার প্রভাবশালী 'বাঙ্গালীরা' নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থকেই দেশের স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল, এবং একদা পরাক্রান্ত মুঘল রাজকীয় শাসন কাঠামোতে সুবে বাঙ্গালা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল বলে; বস্তুত কেন্দ্রচ্যুত বাঙ্গালা বা অন্য কোন প্রদেশই ইউরোপীয় জাতিসমূহের ক্রমবর্ধমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট শক্তি অর্জনের বিশেষ করে নৌশক্তি অর্জনের, আগেই এই আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল বলে এবং সর্বোপরি

ইউরোপীয় জাতিসমূহ পূর্ববর্তী শতকগুলোতে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে কালের ওই সন্ধিক্ষণে দুনিয়াজোড়া সম্প্রসারণ ও উপনিবেশ স্থাপনের লক্ষ্যে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল বলে। সিরাজ উদ দৌলার পতন প্রতীচ্যের কাছে প্রাচ্যের, ইউরোপের কাছে এশিয়ার, পতন দৃষ্টান্ত ঘোষণা করেছিল। তাঁর সংগ্রাম ও পতন প্রাচ্যে প্রতীচ্যের অনধিকার প্রবেশ ও আধিপত্যে প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এক স্বাভাবিক ও ব্যর্থ প্রতিরোধের প্রকাশ। সিরাজ উদ দৌলা সফলকাম হন নি, কিন্তু বিচ্যুত হন নি তিনি দেশ রক্ষার দায়িত্ব পালন থেকে। বরং দেশই তাঁকে বিচ্যুত করেছে সাফল্য অর্জন থেকে। (History of the Muslims of Bengal. Vol. 1A Dr. Muhammad Mohar Ali. Riyadh, 1985,.pp. 681-682)

জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাধীনতব্রতী যে কোন মুসলিম শাসন অবসানের লক্ষ্যে আয়োজিত পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজের পতন ঘটাবার ষড়যন্ত্রটা ছিল যেহেতু আসলে হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র এতদ্দেশীয় মুসলিম মানসে সিরাজ স্মৃতি তাই আজও অম্লান চির দেদীপ্যমান। তাদের কাছে সুবে বাঙ্গালার নবাব সিরাজ চির বরেণ্য শহীদ সিরাজ। এবং মুসলমানদের কাছে পলাশী বিপর্যয় তাদেরই পতন ইতিহাসের এক নির্মম প্রকাশ, রোদনভরা এক শিক্ষণীয় অনুভূতি। অবিশ্যি এ শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গ ভঙ্গ রদ করার আন্দোলন কালে নবাব সিরাজ অবিভক্ত বাংলার হিন্দু লেখকদের দ্বারাও এক স্মরণীয় বীর হিসাবে সম্মান ও প্রচারণা পেয়েছিলেন। তখন দেশাত্মবোধের উন্মাদনায় ও প্রয়োজনে সংযোজিত হয়েছে হিন্দু মুসলমানের মিলন কথা যা উচ্চারিত হতে থাকে সভা সমিতিতে ঐতিহাসিক নাটকে। ঐতিহাসিক নাটকের হিন্দু মুসলমান মিলন কথায় নবাব সিরাজ তখন এক অতিপ্রয়োজনীয় চরিত্র। তারপর বঙ্গ ভঙ্গ রদ হল এবং যথাসময়ে ভারত ভঙ্গই হয়ে গেল। ততদিনে নবাব সিরাজের প্রয়োজন অনেকটাই কমে গেছে। ভারত ভঙ্গের দুই যুগ পরে আবার পাকিস্তান ভঙ্গের মাধ্যমে অভ্যুদয় ঘটল স্বাধীন বাংলাদেশের। এ সময়টায় রাজনীতির রীতি অনুযায়ী অবিভক্ত বাংলার একাংশ পশ্চিমবঙ্গে নবাব সিরাজের স্মৃতি বা সম্মান নতুন করে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা পায় নি। হালে সিরাজের বিপরীতে সেখানে বৃদ্ধি পেয়েছে জগৎশেঠের স্মৃতি বা সম্মান। এমন কি মীর জাফরের সম্মানও নাকি সেখানে নবাব সিরাজের তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের আজকের বাংলাদেশেও কোন কোন লেখক বুদ্ধিজীবির মুখে শুনতে পাওয়া যায় মীর জাফরের গুণগাঁথা। পুরা ব্যাপারটাই বিস্ময়কর বৈকি!

যে ব্যক্তিটিকে নিয়ে যুগে যুগে শ্রদ্ধাবোধের এই টানা হেঁচড়া, তাঁর সম্পর্কে বাকি আলোচনার আগে এ ব্যক্তিটির জন্ম পরিচয় ও চরিত্র বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

নবাব আলীওয়ার্দীর দুই ভাই এবং এক বোনের নাম জানা যায়। বড় ভাই হাজী আহমদ খান, (মীর্যা আহমদ আলী খান) ছোট ভাই আলীওয়ার্দী খান (মীর্যা মুহাম্মদ আলী খান) ও বোন শাহ খানম। হাজী আহমদের তিন পুত্র নওয়াজিস মুহাম্মদ খান, সাঈদ আহমদ খান ও জৈনুদ্দিন আহমদ খান। আর আলীওয়ার্দীর তিন কন্যা মেহেরুন্নিসা বা ঘসেটি বেগম, সোমিনা বেগম ও আমিনা বেগম। বড় ভাইয়ের তিন পুত্রের সঙ্গে ছোট ভাইয়ের তিন কন্যার বিয়ে হয়। নওয়াজিস মুহাম্মদ ও ঘসেটি বেগমের কোন সন্তান হয়নি, সাঈদ আহমদ ও সোমিনা বেগমের ইতিহাসখ্যাত পুত্রের

নাম শওকত জঙ্গ এবং জৈনুদ্দিন আহমদ ও আমিনা বেগমের তিন পুত্র মীর্যা মুহাম্মদ বা সিরাজ-উদ-দৌলা, একরাম-উদ-দৌলা ও মীর্যা মেহেদী। হাজী আহমদ ও আলীওয়ার্দীর বোন শাহ খানমের বিয়ে হয় মীর জাফরের সঙ্গে।

মীর্যা মুহাম্মদ ছিলেন নবাব আলীওয়ার্দীর প্রিয়তম নাতি। অপুত্রক জ্যেষ্ঠা নবাব কন্যা ঘসেটি বেগম একরাম-উদ-দৌলাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার ইচ্ছা কোন কারণে-ওয়াজিস মুহাম্মদ নবাবী মসনদ না পেলে একরাম-উদ-দৌলাকে মসনদে বসানো হবে। কিন্তু একসময়ে এই প্রিয় পোষ্যপুত্র একরাম-উদ-দৌলা মারা গেলেন এবং সেই শোকে কিছুদিনের মধ্যে মারা গেলেন নওয়াজিস মুহাম্মদও । আর এদিকে নবাব আলীওয়ার্দীর পর মসনদে সিরাজ-উদ-দৌলা উপবিষ্ট হবেন বলেও ঘোষিত হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই নাখোশ হলেন অপুত্রক বিধবা ঘসেটি বেগম এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মধ্য কন্যার পুত্র শওকত জঙ্গ।

জন্ম পরিচয় দেওয়া হল, এবার চরিত্র কথা। তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুসারে পুরুষ জীবনে, বিশেষ করে রাজকীয় তরুণদের জীবনে, একাধিক নারীর সমাগম ছিল খুবই স্বাভাবিক। তরুণ সিরাজের চরিত্র কথা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক ম্যালিসন বলেনঃ This prince who has been painted by historians in the blackest colours, was not worse than the majority of Eastern princes born in the purple. He was rather weak than vicious unstable rather than tyrannical, had been petted and spoilt by his grandfather. এই রাজপুত্রটি যাকে ঐতিহাসিকেরা কৃষ্ণতম রঙে চিত্রিত করেছেন, রাজমর্যাদায় জন্মগ্রহণকারী অধিকাংশ পূর্বদেশীয় রাজকুমারদের তুলনায় (চরিত্রে) অধিকতর মন্দ ছিলেন না। অনৈতিক অসচ্চরিত্র হওয়ার বদলে বরং তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত, অত্যাচারীর বদলে দৃঢ়তাবিহীন, মাতামহের আদর প্রশয়ে নষ্ট এক তরুণ। (The Decisive Battles of India..... etc p.42)

অথচ ইতিহাসে স্বীকৃত যে, মৃত্যুশয্যায় নবাব আলীওয়ার্দীর অন্তিম উপদেশানুসারে তরুণ সিরাজ ঝেড়ে ফেলে দেন জীবনের সকল উচ্ছৃঙ্খলতা। এক দুর্যোগঘন পরিস্থিতিতে হাতে তুলে নেন দেশের শাসনভার। এদেশে মুঘল শাসনের যে তরী টালমাটাল অবস্থায় ডুবে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল, তারই কর্ণধারের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন নিজেকে। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত History of the Muslims of Bengal গ্রন্থে ডঃ মোহর আলী তাঁর নির্ভরশীল তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর স্বল্পকালীন রাজ্য শাসনে দুর্বলচিত্ততা দেখান নি। তার গৃহীত যে সকল কার্যক্রম দুর্বলচিত্ততার পরিণাম বলে প্রতিভাত হয়, সেগুলো তিনি ষড়যন্ত্র আক্রান্ত পরিস্থিতিতে গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সেসব কার্যক্রম থেকে তাঁকে বরং যথার্থ রাষ্ট্রনায়কসুলভ দক্ষতা দৃঢ়তার অধিকারী শাসক বলেই মনে হয়।

তবু শেষ রক্ষা তিনি করতে পারেন নি। পারেন নি নিজের অযোগ্যতা অদক্ষতার জন্য নয়, নিজের লোকদের দুশ্চচরিত্রতা বেঈমানী ও উপমহাদেশীয় বিরূপ পরিস্থিতির জন্য। তারই সৃষ্ট সুযোগে উপমহাদেশের এই পূর্বপ্রান্তে বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হল পাশ্চাত্যের নবরূপী ক্রুসেডারদের অন্যতম বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।

অতি সম্প্রতি (১৮ মে ১৯৯১) কলকাতার দেশ সাপ্তাহিকীতে 'পলাশী কার চক্রান্ত?' শিরোনামে এক প্রবন্ধে শ্রী সুশীল চৌধুরী লিখেছেনঃ স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে শুধু নয়, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের গবেষণাগ্রন্থেও সিরাজদ্দৌলা ও পলাশী চক্রান্ত সম্বন্ধে কতগুলো বক্তব্য স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে বহুদিন ধরে চলে আসছে। সাধারণভাবে এ বক্তব্যগুলো হল সিরাজদ্দৌলা এতই দুর্বিনীত, দুশ্চরিত্র এবং নিষ্ঠুর ছিল যে তাতে রাজ্যের অমাত্যবর্গ শুধু নয়, সাধারণ মানুষ পর্যন্ত তাকে ঘৃণার চোখে দেখতঃ ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে যে সংঘর্ষের পরিণতি হিসেবে সিরাজ বাংলার মসনদ পর্যন্ত হারাল, তার জন্য দায়ী সে নিজেই; মীরজাফরই পলাশী চক্রান্তের নায়ক এবং তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই পতন হয়েছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবীর। কোন কোন ঐতিহাসিক আবার এতেই ক্ষান্ত নন, ইংরেজদের বাংলা বিজয়ের যথার্থ প্রমাণে ব্যস্ত এসব ঐতিহাসিক প্রাক পলাশী বাঙালী সমাজের একটি দ্বিধাবিভক্ত চিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টায় খুবই সচেষ্ট। এদের বক্তব্য পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলার সমাজ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বিভক্ত ছিল। মুসলমান শাসণের নিপীড়নে নির্যাতিত সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমান নবাবের হাত থেকে অব্যাহতির জন্য কোন ত্রাণকর্তার প্রত্যাশায় অধীর হয়ে পড়েছিল এবং ইংরেজদের জানিয়েছিল সাদর অভ্যর্থনা। অতি সম্প্রতি আবার কিছু ঐতিহাসিকের বক্তব্য, ইংরেজদের বাংলা বিজয় একটি আকস্মিক ঘটনা, এর পেছনে ইংরেজদের কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। পলাশী বিপ্লবের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হচ্ছে, সিরাজদ্দৌলা নবাব হয়ে প্রভাবশালী শাসকগোষ্ঠীকে তার প্রতি বিরূপ করে তোলার ফলে বাংলায় যে অভ্যন্তরীণ সঙ্কট দেখা দেয়, তার শেষ পরিণতিই পলাশী বিপ্লব।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো কতটা সঠিক এবং তথ্য ও যুক্তিনির্ভর তার সূক্ষ্ম এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সম্প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন মহাফেজখানায় যেসব নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছি, তার পাশাপাশি আগের জানা তথ্য ও সমসাময়িক ফার্সী ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের পুনর্বিচার করে সমগ্র বিষয়টির পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব। বর্তমান আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যাবে উপরের অধিকাংশ বক্তব্যই সঠিক নয় এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য দিয়ে এই বক্তব্যগুলোকে খণ্ডন করা যায়। (পৃঃ ৬৫)

অতঃপর শ্রী চৌধুরী দেখিয়েছেন যে, নবাব হওয়ার আগে তাঁর চরিত্র যেমনই থাক, নবাব হওয়ার পর সিরাজের চরিত্রা দোষের কোন প্রমাণ নেই। পনের মাসের স্বল্প রাজত্বকালে সিরাজ কোন পাগলামি, অর্বাচীনতা বা নিষ্ঠুরতার পরিচয় যে দেয়নি, ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ থেকে তা নিঃসন্দেহে প্রমান করা যায়। (পৃঃ ৬৬)

কে বা কারা পলাশীর বিশ্বাসঘাতক এ সম্পর্কে শ্রী চৌধুরীর সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য হচ্ছে সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতার দায় শুধু মীরজাফরের নয় জগৎশেঠদের দায় মীরজাফরের চাইতে বেশি বই কম নয়। আসলে ইতিহাস পরিক্রমায় একটু পিছিয়ে গেলেই দেখা যাবে যে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সব কটা রাজনৈতিক পালাবদলে জগৎশেঠরাই মুখ্য অংশ নিয়েছে। এ সময়কার রাজীনীতিতে পট পরিবর্তনের চাবিকাঠি ছিল জগৎশেঠদের হাতে। ..... রবার্ট ক্লাইভের লেখা চিঠিপত্র দেখার পর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে পলাশী চক্রান্তের পেছনে ইংরেজরা সবচেয়ে বেশি মদদ পেয়েছিল জগৎশেঠদের কাছ থেকে।

প্রাক পলাশী বাংলার সমাজ দ্বিধাবিভক্ত ছিল কি না এবং সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় নির্যাতিত ছিল কি না এ সম্পর্কে প্রবন্ধকারের তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত হলঃ সিরাজদ্দৌলার পতন হয়েছিল শাসকশ্রেণীর এক চক্রীদল ও ইংরেজদের মিলিত ষড়যন্ত্রে, সম্প্রদায়ভিত্তিক দ্বিধাবিভক্ত বাঙ্গালী সমাজের জন্য নয়। .... লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও হল্যান্ডের রাজকীয় মহাফেজখানায় ঠিক প্রাক পলাশী বাংলার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদারদের দুটি তালিকা আমি পেয়েছি। প্রথমটিতে (রবার্ট ওরম এর তালিকা) দেখা যাচ্ছে আলিবর্দির সময় (১৭৫৪-তে) দেওয়ান, তন দেওয়ান, সাব দেওয়ান, বকসী প্রভৃতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছয়টিই হিন্দুরা অলংকৃত করেছে একমাত্র মুসলমান বকসী হল মীর জাফর। আবার ১৯ জন জমিদার ও রাজার মধ্যে ১৮ জনই হিন্দু। বাংলার ওলন্দাজ কোম্পানীর প্রধান ইয়ান কারসেবুমের (Ian Kerseboom) তালিকাতেও (১৭৫৫ সালের) নায়েব দেওয়ান রায় রায়ান উমিদ রায়ের নেতৃত্বে হিন্দুদের একচ্ছত্র প্রাধান্য। ১৭৫৪/৫৫ র এই যে চিত্র নবাব সিরাজদ্দৌলার সময় তার কোন পরিরর্তন হয় নি। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় মুসলমান রাজত্বে হিন্দুরা মুসলমানদের চাইতেও অনেক বেশী সুবিধেজনক অবস্থায় ছিল। ...... বাংলার সমাজ যদি সত্যিই দ্বিধাবিভক্ত হত, তাহলে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ও ফারসী ইতিহাসে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু সেরকম কোন নির্দিষ্ট ইঙ্গিত আমরা তৎকালীন সাহিত্য বা ইতিহাসে পাই না। ..... বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বিশেষ করে এ দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ, বহুদিন ধরে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে পাশাপাশি বাস করে এসেছে। (পৃঃ ৬৯,৭০)

এবার ইংরেজদের সুবে বাংলার কর্তৃত্ব হস্তগত করার পূর্ব পরিকল্পনার কথা। বলা হচ্ছে, পলাশী সম্বন্ধে ইংরেজদের নাকি কোন পূর্ব পরিকল্পনাই ছিল না; পলাশী চক্রান্তে ইংরেজদের কোন ভূমিকাই ছিল না; এবং নবাব দরবারের অন্তর্দ্বন্দ্বই নির্যাতিত মানুষদের মুক্তির লক্ষ্যে ইংরেজদের বাংলার রাজনীতিতে টেনে এনেছিল। এ সম্পর্কে শ্রী সুশীল চৌধুরী বলেনঃ কিন্তু পলাশী প্রাক্কালের যেসব ঘটনাবলী এবং আমাদের কাছে যেসব নতুন তথ্যপ্রমাণ আছে তার সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট দেখা যাবে ইংরেজরাই পলাশীর মূল ষড়যন্ত্রকারী। সিরাজদ্দৌলাকে সরিয়ে অন্য কাউকে মসনদে বসাবার ব্যাপারে তারাই সবচেয়ে বেশী উৎসাহ যুগিয়েছিল। শুধু তাই নয়, পলাশী যুদ্ধের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রধান প্রধান দেশীয় চক্রান্তকারীরা যাতে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকে, তার জন্য ইংরেজরা বারবার চেষ্টা করে গেছে। (পৃঃ ৭০)

১৬৯০ সালের চুক্তিতে কোম্পানীকে দস্তক প্রদানের অধিকার অনুমোদনের কথা এখানে আমরা আবার স্মরণ করতে পারি। স্মরণ করতে পারি ১৭১৭ সালের চুক্তির কথা। কোম্পানী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত গোপন ব্যবসায়ে দস্তকের যথেচ্ছ ব্যবহারে বাধা আসছিল প্রথম থেকেই। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ, নবাব আলীওয়ার্দী খাঁ এবং নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কোম্পানী কর্মচারীদের এই কাজে বাধা দিয়ে আসছিলেন। তাতে আঁতে ঘা লাগছিল কোম্পানী কর্মচারী কর্মকর্তা সকলেরই। ইংরেজরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিল যে এই বিশাল ভারতবর্ষে মুসলিম মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান নিশ্চিতভাবেই ঘনিয়ে আসছে। মারাঠা নায়ক শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটাও সন্দেহের উর্ধে ছিল না। এমনি অবস্থায় ক্রমবর্ধমান শক্তির অধিকারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অদূর ভবিষ্যতে মস্ত বড় কোন কিছুরই আশা করবেই বা না কেন?

বস্তুত কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার স্কট পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে বাংলা বিজয়ের এক বিশদ পরিকল্পনা পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছিল। তাতে এ গৌরবময় ঘটনায় কোম্পানী কি পরিমাণ লাভবান হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। স্কট এটাও জোর দিয়ে বলেছিল যে বাংলা জয় করতে পারলে immense gains would accrue to the English nation...... রাজ্য বিজয় সম্বন্ধে বাংলায় কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে একটা স্পষ্ট মতলব ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। আসলে ১৭৪০ দশকের শেষদিকে ও পঞ্চাশ দশকের প্রথমদিকে ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য চরম সঙ্কটের মুখোমুখি হয়, ফলে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থে তারা বাংলা বিজয় চাইছিল। অবশ্য এই সময় কোম্পানীর বাণিজ্য ও ব্যক্তিগত ব্যবসার মতই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে পড়েছিল। কোম্পানীর কর্মচারীদের সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তিগত বাণিজ্য স্বার্থকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ফরাসীদের বিতাড়ন এবং রাজ্যজয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রয়োজন ঘটেছিল তাতে শুধু যে আন্তঃএশীয় এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থরক্ষার উন্নতি ঘটবে তা না, উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে সরবরাহ, বাজারহাট, ব্যবসায়ী তাতি অন্যান্য কারিগরদের ওপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণও নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ কথা যে শুধু পশ্চাদ সমীক্ষাতেই ধরা পড়ছে তা নয়, তৎকালীন কোম্পানীর কর্মচারীদের বিবৃতি ও কাজকর্মের মধ্য দিয়েও প্রকাশ পেয়েছে, স্কটের বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনা ফ্যাম্বল্যাণ্ড ও ম্যানিংহামের ক্লাইভকে লেখা চিঠি (১ সেপ্টেম্বর ১৭৫৩) যাতে ইংরেজ বাণিজ্যের বিশেষ করে ব্যক্তিগত ব্যবসার ক্রমাবনতির কথা করুণভাবে প্রকাশ পেয়েছে, কোম্পানির বেচাকেনায় দাদনি থেকে গোমস্তা ব্যবস্থার পরিবর্তন, নবাবের প্রতি ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল ও গভর্ণর ড্রেকের অনমনীয় ও মারমুখো মনোভাব এ সবই ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে অভিপ্রায় তারই নির্দেশক। (পৃঃ ৬৭)

'কেন এই পলাশী চক্রান্ত?' এ প্রসঙ্গে শ্রী সুশীল চৌধুরী বলেনঃ মুর্শিদাবাদের শাসকগোষ্ঠীর একটি অংশ এবং ইংরেজরা সিরাজদ্দৌলার অপসারণ চেয়েছিল বলেই পলাশী চক্রান্তের উদ্ভব। উভয়ের কায়েমী স্বার্থের পক্ষে সিরাজ ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। নবাব হওয়ার পর প্রথম থেকেই এটা স্পষ্ট যে বাংলার সামরিক অভিজাত শ্রেণী, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও জমিদারদের নিবিড় জোটবদ্ধতা বাংলার নবাবের পূর্ণ ক্ষমতার ওপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, সিরাজদ্দৌলা তা মেনে নিতে মোটেই রাজী ছিলেন না। নবাব হয়েই সিরাজদ্দৌলা সামরিক ও বেসামরিক উভয় শাসনব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজাতে শুরু করল। মোহন লাল, মীর মদন ও খাজা আব্দুল হাদি খানের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ এই নতুন ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। .... আসলে সিরাজদ্দৌলার মত বেপরোয়া তরুণ নবাব হওয়ায় শাসক শ্রেণীর একটি গোষ্ঠী ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আগের নবাবদের আমলে এই বিশেষ গোষ্ঠীই সম্পদ পুঞ্জীভবনে লিপ্ত ছিল। এখন তাদের ত্রাসের কারণ সিরাজদ্দৌলা হয়ত তাদের সম্পদ পুঞ্জীভবনের পথগুলো বন্ধ করে দেবে। সৈন্যাধ্যক্ষের পদ থেকে মীর জাফরের অপসারণ, রাজা মানিকচাঁদের কারাদণ্ড এবং সর্বোপরি আলিবর্দির একান্ত বিশ্বস্ত ও প্রভূত ক্ষমতাশালী হুকুম বেগের দেশ থেকে বিতাড়নের মধ্যে শাসক শ্রেণীর চক্রীদল বিপদ সঙ্কেত পেয়ে যায়। এসব সত্ত্বেও ইংরেজদের সক্রিয় সংযোগ ছাড়া পলাশী বিপ্লব সম্ভব হত না। সিরাজদ্দৌলা নবাব হওয়ায় ইংরেজদের কায়েমী স্বার্থও বিঘ্নিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা

দেখা দিল। সিরাজ নবাব হওয়ার পর ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীরা ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠল, পাছে নতুন নবাব তাদের দুই কল্পতরুকে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও দস্তকের যথেচ্ছ অপব্যবহার সমূলে বিনাশ করে বসে। (পৃঃ ৭২)। তাই এই তরুণ নবাবকে ধ্বংস করার জন্যই পলাশীর এই চক্রান্ত। এই চক্রান্তের প্রধান হোতা ইংরেজ এবং এদেশীয়রা তাদের সহযোগী।

দস্তকের যথেচ্ছ অপব্যবহার করার সুযোগটাই ছিল কোম্পানীওয়ালাদের স্বার্থের ক্ষেত্রে আসল ব্যাপার। ১৭৫৬ সালের ১ লা জুন ইংরেজদের কাছে নবাবের বিশেষ দূত খাজা ওয়াজেদের কাছে লিখিত নির্দেশে অন্যান্য কারণের মধ্যে দস্তক সম্পর্কিত ব্যাপারটাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। নির্দেশে নবাব তার মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, ইংরেজদের আমার রাজ্য থেকে বহিস্কৃত করার তিনটি প্রকৃত কারণ বিদ্যমান। প্রথমত, দেশের প্রচলিত নিয়মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাজ্যের মধ্যে তারা সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ ও পরিখা খনন করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা দস্তকের সুযোগ সুবিধার যথেচ্ছ অপব্যবহার করেছে এবং যারা কোনভাবেই এই দস্তক ব্যবহারের অধিকারী নয়, তাদেরও বাণিজ্যশুল্ক বাবদ নবাবের রাজস্বের প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। তৃতীয়ত, ইংরেজরা নবাবের এমন সব প্রজাকে আশ্রয় দেয় যারা বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাসভঙ্গকারী কার্যকলাপ ও অন্যায় ব্যবহারের জন্য নবাবের নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য।

শ্রী চৌধুরীর সমাপ্তি মন্তব্যের সাথেও আমরা সম্পূর্ণ একমত, যেখানে তিনি বলেন, শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এ ব্যক্তিগত ব্যবসাই ছিল রাতারাতি বড়লোক হওয়ার সবচেয়ে সহজ পথ এটা যত অন্যায়ই হোক না কেন, তারা ছাড়তে মোটেই রাজী ছিল না। গভর্ণর ড্রেক থেকে শুরু করে সব ইংরেজ কর্মচারীই এই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল এবং কেউই এটার মত লোভনীয় জিনিস ছাড়তে চায় না। সুতরাং ইংরেজরাও চাইছিল সিরাজদ্দৌলাকে হঠাতে। তাই শাসক শ্রেণীর চক্রীদলের সঙ্গে হাত মেলাতে এগিয়ে এল ইংরেজরা।

এভাবে পলাশী চক্রান্ত সফল হল। সফল হল প্রধানত এদেশীয় বেঈমানদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই। এবং আশ্চর্যই বলতে হবে দেশী বিদেশী চক্রান্তকারীদের অনেকেরই জীবনের অবসান হয়েছিল খুবই নির্মমভাবে। (দেখুন পরিশিষ্ট-খ)

পরবর্তী ক্রুসেডের পরবর্তীকালেও ভারতবর্ষে ও সুবে বাঙ্গালায় এবং অন্যান্য দেশেও এই যে বাণিজ্য ও যুদ্ধভিত্তিক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়ে গেল এগুলোকে কি বলে অভিহিত করা যাবে? বাণিজ্য ও যুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন সংঘাত মাত্র, অথবা আরও পরবর্তী ক্রুসেড জাতীয় কিছু? প্রতীচ্যের ধ্যানধারণায় ক্রুসেডের সংজ্ঞা একাধিক। মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদদের সাধারণীকৃত সংজ্ঞানুযায়ী ক্রুসেড ছিল পৃথিবীতে গড এর প্রতিনিধি হোলি পন্টিকের মাধ্যমে পবিত্র কারণে প্রবিডেন্স নির্দেশিত এক পবিত্র যুদ্ধ। অন্য এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, পাপস্খালনের জন্য সাগর পেরিয়ে দলগতভাবে প্রয়োজনে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার মানসে পুরাপুরি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পবিত্র স্থানসমূহে তীর্থযাত্রাই হচ্ছে ক্রুসেড।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর যুগে এবং আঠার শতকেও যুক্তিবাদী দার্শনিকদের মতে

ক্রুসেড ছিল মধ্যযুগীয় গোঁড়ামির একটা সামরিক প্রকাশ। রাজনৈতিক ঐতিহাসিকেরা প্রতীচ্যের অভাবী মানুষদের অধিকতর ধনসমৃদ্ধ অঞ্চল প্রাচ্য অভিমুখে একটা স্থানান্তর প্রক্রিয়া বলে গ্রহণ করতে আগ্রহী। এখানে উল্লেখ্য যে, রোম সাম্রাজ্যের পতনকালে মধ্যযুগের উষালগ্ন চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে এই স্থানান্তরণের জন্য বিখ্যাত নরম্যান ও ফ্র্যাঙ্কগণ ছিল ক্রুসেডে প্রথম সারির অংশগ্রহণকারী। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা ক্রুসেডকে দেখেছেন এক ভিন্ন দৃষ্টিতে। তাদের মতে ক্রুসেড ছিল প্রতীচ্য ইউরোপের প্রাচ্য অভিমুখী সম্প্রসারণবাদের একটি পর্যায়, ছিল ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদিতার একটি প্রয়াস। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে, এগার শতকে ফ্রান্সে যখন খাদ্য সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা হঠাৎ করেই বেড়ে গেল, তখন সেখানকার অভাবী মানুষেরা যে নতুন সুযোগ সমৃদ্ধ অঞ্চলকে করায়ত্ত করতে প্রয়াস পাবে, তা সহজেই অনুমেয়। এই ফ্রান্সের মাটি থেকে ১০৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর প্রথমবারের মত ক্রুসেডের ডাক এসেছিল।

উপরিউক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হচ্ছেঃ প্রাচ্যের উপর প্রতীচ্যের আগ্রাসন, তা ধর্মীয় কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক অথবা বিভিন্ন কারণ নিয়েই হোক, ওই আগ্রাসন ছিল মুসলিম প্রাচ্যের উপর খৃস্টান প্রতীচ্যের আগ্রাসন। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানরত প্রফেসার আজিজ এস, আতিয়া ১৯৬২ সালে তাঁর গবেষণা গ্রন্থ Crusade, Commerce and Culture এ প্রাচ্যের প্রতি প্রতীচ্যের মনোবৃত্তি প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন যে, গ্রীক মানস ও হেলেনীয় সংস্কৃতিই বস্তুত প্রতীচ্য মানসে জাগিয়ে তুলেছিল তার সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য সীমান্ত সম্পর্কে শ্রেষ্ঠত্বের এক সচেতনতা যার জন্য প্রতীচ্য তার সেই সীমান্তকে শুধু রক্ষা করাই নয়, বরং প্রাচ্যে তার বিস্তৃতিও ঘটাতে চেয়েছিল।

খৃস্টপূর্ব পঞ্চাশ শতক থেকেই প্রতীচ্যের হেলেনীয় সংস্কৃতিভিত্তিক চিন্তা-চেতনা ও পারশ্যের নিজস্ব জীবনধারাভিত্তিক চিন্তা- চেতনার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতীচ্যের চিন্তা-চেতনায় বরাবরই ছিল শ্রেষ্ঠত্ব বোধের অহমিকা। একাদশ শতকের শেষদিকে প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহমিকাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রক্তক্ষয়ী ক্রুসেডের মাধ্যমে প্রাচ্য প্রশ্নের সমাধান করতে। এ প্রয়াসে খৃস্টীয় বিশ্বাসের রজ্জু ধরে প্রতীচ্যের রাজ্যগুলো প্রাচ্যের মুসলিম জনপদগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের বিঘোষিত লক্ষ্য ছিল প্রাচ্যের ওই নীচ ইতরদের নিয়ন্ত্রণ থেকে পবিত্র জেরুযালেমের উদ্ধার সাধন। অথচ প্রাচ্যের তুলনায় প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠত্ব বোধের অহমিকাটাই ছিল হাস্যাস্পদ রকমের ভ্রান্তিজাত। ইসলামের আলোকোদ্ভাসিত প্রাচ্যের তুলনায় সে সময়কার প্রতীচ্য ছিল একেবারেই তমসাচ্ছন্ন। ঐতিহাসিক হিট্টির কথায়- প্রাচ্য ছিল "অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তি ও সভ্যতার আলোকবর্তিকাবাহী, যাদের মাধ্যমে প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শন হইয়াছিল পুনরুজ্জীবিত, সংযোজিত ও সম্প্রসারিত"। (হিষ্ট্রি অব দ্য আরবস, পৃঃ ৫৫৭)।

অকারণ অহমিকার পরিণাম যে মোটেই আশানুরূপ হয় নি, তা তো ক্রুসেডের ফলাফল থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বনামখ্যাত চিন্তাবিদ মানবেন্দ্র নাথ রায় এর কথায়, দীর্ঘ তিনশ' বছর শান্তি, সমৃদ্ধি ও সমুন্নতিতে কাটলে পর খৃস্টানদের

প্রতারণামূলক ধর্মযুদ্ধের নামে আক্রমণের জন্যই আরবদের সামরিক শক্তি আবার জ্বলে উঠেছিল। (ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, The Historical Role of Islam এর অনুবাদ মুহম্মদ আবদুল হাই, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৯ পৃঃ ২৩)। আরবদের এই আবার জ্বলে ওঠা সামরিক শক্তিই ক্রুসেডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের বিজয় নিশ্চিত করেছিল, নিশ্চিত করেছিল পরবর্তী ক্রুসেডের বিজয়ও।

কিন্তু আরও পরবর্তী ক্রুসেড পর্যায়ের ফলাফল? সে পর্যায়ে তো মুসলিম শক্তি সর্বত্রই বিপর্যস্ত। প্রশ্ন উঠতে পারে পনের শতকের পরবর্তী যুদ্ধবিগ্রহকে ক্রুসেড বলা যায় কি না! ক্রুসেডের যে বিভিন্ন সংজ্ঞা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া হয়েছে, তাতে পনের শতকের পরের যুদ্ধবিগ্রহগুলোকেও কোন না কোন রূপের ক্রুসেড বলা যেতে পারে বলেই আমাদের ধারণা। বিশেষ করে ওইসব যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত যখন মুসলিম শক্তি বনাম খৃস্টান শক্তির মধ্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতবর্ষে ও সুবে বাঙ্গালার মুসলিম মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে খৃস্টান ওলন্দাজ শক্তি ও ইংরেজ শক্তির মনোভাব আর কার্যক্রম সেই ক্রুসেডকালীন খৃস্টান শক্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না কি?

এই পর্যায়ের যুদ্ধবিগ্রহগুলোতে মুসলিম শক্তি আবার জ্বলে উঠতে পারলে না কেন? এতদিনকার পরাজিত খৃস্টান শক্তি বিজয়ের গৌরবে ভূষিত হল কি করে? উত্তরে তো স্বীকার করতেই হবে প্রতীচ্য শক্তি তখন নবজীবনের জয়গানে উজ্জীবিত। তাদের সামনে একের পর এক উন্মুক্ত হতে লাগল তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবগুলো বন্ধদুয়ার। রেনেসাঁ, জীবনকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার উদ্দীপ্ত আয়োজন। তারপর কেটে যেতে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী। সামন্তযুগের মৃতপ্রায় স্থবির সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে শিল্প বাণিজ্যভিত্তিক এক ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। আর মুসলিম প্রাচ্য? পতনের পথে দ্রুত ধাবমান। কালক্রমে তুর্কী সালতানাত ও খেলাফতের সর্বদেহে জরাজীর্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট। এই খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মুসলিম রাজ্য নানারকম দুর্বলতা ও অনৈক্যের শিকার।

অতঃপর কালপ্রবাহে এসে যায় বিশ শতক। ১৯১৪ সাল। ছোটখাটো সংঘর্ষ থেকে আরম্ভ হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

নবজীবনের ঔজ্জ্বল্য ও প্রাচুর্যপুষ্ট রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রধাণত অর্থনৈতিক আধিপত্য নিয়ে এই বিশ্বযুদ্ধ, অসংখ্য আদম-সন্তান ও বিপুল ধনসম্পদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যার অবসান ঘটে ১৯১৭ সালে, জার্মান জোটের পরাজয়ের মাধ্যমে। এই বিশ্বযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের দুর্বল মুসলিম রাজ্যগুলো হয় মিত্রজোটের পক্ষে নয়তো জার্মান জোটের পক্ষে জড়িত হয়ে পড়ে। তুরস্কের দুর্বল সুলতান ও খলিফা যোগ দেন জার্মান জোটের সঙ্গে। তাই যুদ্ধ শেষে বিজয়ী মিত্র জোটের খড়গ এসে পড়ে নামসর্বস্ব তুর্কী খেলাফতের ওপরও। ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় তুর্কী খেলাফতকে। ধর্মীয় পরিচয়ে চিহ্নিত করলে, Muslims as well as Christians fought on fought on both sides in a war waged not for the capture of the holy places as such, but primarily to defeat the Turks and their German allies. The budding spirit of nationalism in the heart of the long depressed peoples of the Arab Commonwealth of nations in. the Near East combines with the interests of the Western powers

fighting for their lives against the German peril brought them together in a pursuit which led to the liberation of the Holy land. মুসলমান এবং খৃস্টানেরাও এমন এক যুদ্ধে নিয়োজিত হল, এমনিতে যা পবিত্র স্থানসমূহকে অধিকার করার জন্য সংঘটিত ছিল না, ছিল মূলত তুর্কীদেরকে এবং তাদের জার্মান মিত্রদেরকে পরাস্ত করার জন্য। নিকট প্রাচ্যের আরব জাতিপুঞ্জের বহুকাল নির্যাতিত মানুষের হৃদয়ে পোষিত স্ফুটনোন্মুখ স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা জার্মান বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত প্রাতীচ্য শক্তিসমূহের স্বার্থের সঙ্গে একীভূত হওয়ায় সৃষ্ট হল এমন এক প্রয়াস যা পরিচালিত হল পবিত্র ভূমির মুক্তকরণে"। Crusade Commerce and Culture Aziz S Atiya... etc P. 161।

জার্মান জোটের বিরোধী পক্ষ মিত্র জোট বা মিত্র শক্তি (Allied Forces) ১৯১৭ সালের ৯ অথবা ১০ ডিসেম্বর বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে জেরুযালেমে। বিশ্বযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য তো জেরুযালেমকে মুসলিম অধিকার থেকে মুক্ত করা ছিল না। কিন্তু দেখা গেল বিজয়ীদের আবেগ জেরুযালেমের পথেই ধাবিত হল। এর থেকে কি মনে হয়? ক্রুসেড বিপর্যয়ের স্মৃতি তাদের হৃদয় কন্দরে সুপ্ত ছিল না, তা ভেবে দেখবার বিষয় বৈকি।

ক্রুসেডের সর্বগ্রাহ্য সংজ্ঞা কি. পরবর্তী ক্রুসেড এবং আরও পরবর্তী যুদ্ধবিগ্রহাদির পেছনে ক্রুসেড মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল ছিল কি না, তার পেছনে না ছুটে আমরা এখানে দুটি বক্তব্য তুলে ধরছি,

(ক) বর্তমান মুসলিম বিশ্বের স্বনামখ্যাত ভারতীয় মনীষী আল্লামা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী লিখিত এক প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ত্রৈমাসিকীতে। তাতে বলা হয়ঃ ১৯১৪ খৃস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। আরবরা সেখানকার সংখ্যালঘু খৃস্টান সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র ও মিত্র শক্তির প্রতারণাপূর্ণ প্রতিশ্রুতির দরুণ আরব জাতীয়তার যাদুমন্ত্রে সম্মোহিত হলো। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে ১০ জুন মক্কার শরীফ হোসাইন তুর্কীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। ফলে ১৯১৭ খৃস্টাব্দে সিরিয়া ফিলিস্তিন ও তুর্কীদের হাত থেকে স্বাধীন হলো। মিসর বৃটিশ শাসনে চলে গেল। ৯ ডিসেম্বর ১৯১৮ এ ইংরেজরা মুকাদ্দাস বায়তুল দখল করল। ১ অক্টোবর ১৯১৮ এ শরীফ হোসাইনের পুত্র আমীর ফয়সাল ও জেনারেল গুলবানী বিজয়ীর বেশে দামেশকে প্রবেশ করেন। ফরাসী জেনারেল গোর ইসলামের গৌরব বায়তুল মুকাদ্দাস বিজেতা সুলতান সালাহ্উদ্দিন আইয়ুবীর কবরে পদাঘাত করে বললোঃ রে সালাহউদ্দিন! আমরা এসে পড়েছি। আমরা সিরিয়া জয় করেছি। উঠে দেখ! (চব্বিশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ঃ অক্টোবর ডিসেম্বর ১৯৮৪)।

(খ) বিশ্ব সমরে ইংরেজদেরকে সাহায্য করেছিল ইহুদী ধনকুবেরগণও। তারা ইংরেজদের সাথে গোপন চুক্তি সম্পাদন করেছিল। সে চুক্তি মোতাবিক তাদেরকে ফিলিস্তিনে পুনর্বাসিত করবে বলে ইংরেজরা তাদেরকে কথা দেয়। এ গোপন চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য বৃটিশ ফরেন সেক্রেটারী মিস্টার ব্যালফোর ২ নভেম্বর ১৯১৭ ইং সালে ইংরেজ ব্যালফোর ঘোষণা বলা হয়। দুঃখের বিষয়, এ ঘোষণার দ্বারা ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম হয়। (ঐতিহাসিক পেক্ষাপটে ইজ্জত কাবা ১৯৮৮ পৃঃ ১৩৯)।

পরিশিষ্ট-খ

পলাশী ষড়যন্ত্রের কয়েকজন কুশলী কে কিভাবে মরেছিলেনঃ

মীরণ ঃ বিনামেঘে বজ্রপাতে মৃত্যু অথবা ক্লাইভের চক্রান্তের করুণ মৃত্যু।

মুহম্মদী বেগ ঃ মাথার গড়বড় অবস্থায় বিনা কারণে কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু।

মীর জাফর ঃ দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে মৃত্যু। মৃত্যুর আগে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু মহারাজা নন্দকুমার দেবী কিরাটীশ্বরীর চরণামৃত আনিয়ে মীর জাফরের মুখে প্রদান করেছিলেন। এবং তাই ছিল নবাব মীর জাফরের শেষ জলপান।

মহারাজা নন্দকুমার ঃ তহবিল তছরূপ ও অন্যান্য অভিযোগের বিচারে ফাঁসীকাষ্ঠে মৃত্যু।

জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ এবং তারই পিতৃব্য পুত্র মহারাজা স্বরূপচাঁদ ঃ less নবাব মীর কাশেমের আদেশে নব নব বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি স্বরূপ less মুঙ্গের দুর্গ থেকে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপের ফলে ডুবন্ত অবস্থায় মৃত্যু।

ইয়ার লুতফ খান ঃ অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট অথবা গোপনে নিহত।

রাজা রাজবল্লভ ঃ রাজা রাজবল্লভের কীর্তি নাশ করেই পদ্মা হয় কীর্তিনাশা।

উমিচাঁদ ঃ ষড়যন্ত্র বাবদ অর্থপ্রাপ্তির ব্যাপারে প্রতারিত হয়ে স্মৃতিভ্রংশ উন্মাদ অবস্থায় পথে পথে ভ্রমণ ও মৃত্যু।

রবার্ট ক্লাইভ ঃ ইংরেজদের প্লাসি হিরো বিলাতে ধন সম্মানে আশাতিরিক্ত ভাবে ভূষিত হয়েও বিনা কারণে বাথরুমে ঢুকে নিজের গলায় নিজের হাতেই ক্ষুর চালিয়ে আত্মঘাতে মৃত্যু।

ওয়াটস ঃ কোম্পানীর কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে মনের দুঃখে ও অনুশোচনায় বিলাতেই অকস্মাৎ মৃত্যু।

ক্রাফটন ঃ বাংলায় কায় করবার করে বিলাতে যাওয়ার পথে জাহাজ ডুবিতে মৃত্যু।

ওয়াটসন ঃ ক্রমাগত ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে কোন ওষুধেই ফল না পেয়ে কলকাতাতেই করুণ মৃত্যু।

মীর কাশেম ঃ নবাব মীর জাফরের ভাই রাজমহলের ফৌজদার মীর দায়ুদের নির্দেশে মীর কাশেম নবাব সিরাজকে দানা শার আস্তানা থেকে বেঁধে এনেছিলেন মুর্শিদাবাদে। তারপর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নবাব হয়ে প্রকৃত নবাব হওয়ার চেষ্টা, দেশ থেকে বিদেশী প্রভাব বিদূরিত করার প্রানপণ প্রয়াস এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় নানা স্থানে ঘুরে বেড়ানো। অবশেষে অজ্ঞাতনামা হয়ে দিল্লীর পথে করুণ মৃত্যুবরণ। মৃতের শিয়রে পড়ে থাকা একটা পোটলায় পাওয়া যায় নবাব মীর কাশেম হিসাবে ব্যবহৃত চাপকান। তার থেকেই জানা যায়, মৃত ব্যক্তি বাংলার ভূতপূর্ব নবাব মীর কাশেম আলী খান।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেকালের মীর জাফরী নবাবী এবং--

পলাশীর কথকতা শেষ করে তার জের মেটানোর কথা না বলেই অনেক পরবর্তী কিছু কথা বলা হয়ে গেছে। এ পরিচ্ছেদে না বলা সেই জের মিটানোর কাহিনীই বিবৃত করছি। পলাশী যুদ্ধের অভিনয় শেষে ১৭৫৭ সালের ২৯ শে জুন সুবে বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হলেন মীর জাফর আলী খাঁ বাহাদুর। নতুন নবাবকে মসনদে হাতে ধরে বসিয়ে দিয়ে রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে সর্বপ্রথম নজর প্রদান করে তাকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নওয়াব সুবাদার বলে অভিবাদন করেন। নতুন নবাব অলংকৃত হন শুজাউল মুলক হাসামউদ্দৌলা মীর মুহাম্মদ জাফর আলী খাঁ মহবৎজঙ্গ বাহাদুর শব্দমালায়। অন্যান্য দরবারীদের নজর প্রদান ও যথারীতি অভিবাদন শেষে সমাপ্ত হয় নবাব মীর জাফরের অভিষেক অনুষ্ঠান।

অতঃপর কোম্পানীর সঙ্গে নতুন নবাবের দেনা-পাওনা মেটানোর পালা। ইংরেজ প্রধান রবার্ট ক্লাইভের নির্দেশক্রমে জগৎ শেঠের মন্ত্রণাভবনে ষড়যন্ত্র সংশ্লিষ্ট সুধীবৃন্দের সামনে খোলা হল কোম্পানীর সঙ্গে সম্পাদিত মীর জাফরের গুপ্ত সন্ধিপত্র। এ সেই সন্ধিপত্র যা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম আধিপত্য ধ্বংসের লক্ষ্যে বিশাজী স্বপ্নের সম্ভাব্য রূপকারদের সমর্থনে অনুপ্রেরণায় লেখা হয়েছিল। মীর জাফর তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন সুবে বাঙ্গালার মসনদ লাভের উদ্দেশ্যে। I swear by God, and the Prophet of God, to abide by the terms of this treaty whilst I have life (মীর জাফর খাঁর স্বাক্ষর)।

এরপর রয়েছে সন্ধিপত্রের বিভিন্ন আর্টিকল। .... রবার্ট ক্লাইভের কৃপালাভে ধন্য মীর জাফর আলী খাঁ লাভ করেছেন সেই মসনদ। এবার সন্ধিপত্রের শর্তানুসারে দাবি পূরণের পালা।

ইংরেজ ঐতিহাসিক ওর্মির বর্ণনানুসারে শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র কথায়, সেনাপতি ক্লাইভের অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ে মুর্শিদাবাদের নবাব দত্ত ধনরত্ন সাত শত সিন্ধুকে বোঝাই হইয়া, একশত সুসজ্জিত তরণী সংযোগে বৃটিশ বিজয় বৈজয়ন্তী সবিস্তৃত করিয়া, বৃটিশের রণবাদ্য নিনাদে ভাগীরথীর উভয় তীর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নবদ্বীপে উপনীত হইল; তথা হইতে ইংরাজবন্ধু রাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র ভূপবাহাদুরের সেনাদল পরিচালিত হইয়া, যথাকালে তাহা কলিকাতার ইংরেজ বন্দরে নিরাপদে তীর সংলগ্ন হইল। (মীর কাসিম, শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩১২ সন, পৃ ১৯)।

তাতেও প্রতিশ্রুত অর্থের অর্ধেকের মত পরিশোধিত হল মাত্র, বাকি অর্ধেক পরিশোধ করার জন্য সময় দেওয়া হল ৩ বছর। এদিকে অর্থের অভাবে নবাবী প্রশাসন চড়ায় আটকা পড়েছে, বকেয়া সমেত বেতনাদি না পেয়ে নবাবের সেনাদল বিদ্রোহন্মুখ ষড়যন্ত্রকালীন বন্ধুজনেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে আনুগত্যমূলক অবস্থান গ্রহণ করেছে ক্লাইভের চারপাশে। মোটা মাথার লোক হলেও অতি অল্পদিনেই মীর জাফর আলী খাঁ পলাশী ষড়যন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপটা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন। ষড়যন্ত্রের সময় যে পরিকল্পনায় তার বিশ্বাস জন্মেছিল, তাতে তো ক্লাইভসহ জগৎসেঠ রাজবল্লভ প্রমুখ বন্ধুজনেরা তাকে ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বরকম সহায়তা দানের কথা। কিন্তু বাস্তবে যে হচ্ছে তার বিপরীত।

তাহলে কি ইংরেজ কোম্পানী নবাব সিরাজের ধ্বংসের পর তারও ধ্বংস কামনা করছে? আর তারই সহায়ক হতে চলেছে তারই ষড়যন্ত্র সাথীরা? ষড়যন্ত্রের সে পরিকল্পনার মধ্যে কি গোপন ছিল আরও একটি পরিকল্পনা যার আভাসমাত্রও তিনি পান নাই? আর সেই অনাভাসিত পরিকল্পনা কি সুবে বাঙ্গালা থেকে মুসলিম আধিপত্যের অবসান? সুবে বাঙ্গালায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কি ক্লাইভ সাহেব তাকে নিঃসঙ্গ শক্তিহীন করে তারই ষড়যন্ত্র সাথীবৃন্দকে নিজের প্রভাব বলয়ে অন্তর্ভূক্ত করে নিচ্ছেন? মসনদে তিনি উপবেশন করেছেন ঠিকই, কিন্তু আজও সুবে বাঙ্গালার সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি তার কর্তৃত্ব? বিহার, পূর্ণিমায়, উড়িষ্যায় আজও তার কর্তৃত্ব উপেক্ষিত। অথচ ক্লাইভ সাহেবের দৃঢ় উপদেশ রাজকোষ যখন শুণ্য, তখন অতবড় সেনাদল পোষার প্রয়োজন কি? নতুন নবাবের রাজ্য রক্ষার জন্য তো ইংরেজ শক্তিই রয়েছে। তাই সেনাদলের অন্তত অর্ধেককে বরখাস্ত করা হোক। ক্লাইভ সাহেবের দৃঢ় উপদেশ মানতেই হল। কিন্তু নিজের যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য নেই- তাহলে নবাবের শক্তি বলতে আর থাকল কি? ছোটে নবাব মীরণের ব্যাখ্যাও তাই। এখন তাহলে কি করা যায়?

কি আর করা যাবে। মীর জাফরের তো পুরাপুরি জানার কথা নয় যে, গত হাজার বছরের প্রতীচ্য প্রাচ্যের ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় নিজেদের বাণিজ্য আধিপত্য পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে প্রতীচ্যের খৃস্টান শক্তি বিশ্বের মুসলিম শক্তিকে মোকাবিলা করে চলেছে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রান্তরে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংঘটিত নানা সংজ্ঞার ক্রুসেডই তার অন্যতম প্রমাণ। ভারতবর্ষের শিবাজী স্বপ্নকে বিদেশী বানিয়ারা সেই লক্ষ্যেই ব্যবহার করে চলেছে শুধু, প্রকৃত প্রস্তাবে শিবাজী স্বপ্ন রূপায়নের লক্ষ্যে নয়। মুসলিম স্বার্থকে তো বটেই, নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় এই বিদেশী বানিয়ারা হিন্দু স্বার্থকেও অম্লান বদনে জলাঞ্জলী দেবে।

মীর জাফর মীরনের চিন্তা ভাবনা সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরেছিলেন ধূর্ত ক্লাইভ। তাই পলাশী ষড়যন্ত্রের পরেও নতুন ষড়যন্ত্রের অবসান হল না। আরম্ভ হল মীর জাফরকে শক্তিহীন বন্ধুহীন ঠুটো জগন্নাথ করে রাখার ষড়যন্ত্রে।

মীর জাফর আর কি করবেন। ক্লাইভ নিয়ন্ত্রিত পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছু করণীয় থাকল না। তদুপরি, ইংরেজদের বাকি পাওনা পরিশোধের সময় মাত্র ৩ বছর। ইতোমধ্যেই একটা নতুন খেতাবও জুটেছে মীর জাফরের কপালে- ক্লাইভের গর্দভ খেতাব।

সকলের কাছেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, পলাশী বিপর্যয়ের পর সুবে বাঙ্গালার প্রকৃত মালিক হয়ে গেছে ইংরেজ কোম্পানীই, নতুন নবাব মীর জাফর তার আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। দেশের হোমরা চোমরাগণও যে যেভাবে পারে সুযোগ সুবিধা আদায়ে সক্রিয় হয়ে উঠল। শ্রী মৈত্রেয়র কথায়, হিন্দু অমাত্যবর্গ তাহার সন্ধান পাইয়া আত্মাধিকার রক্ষার্থে ক্লাইভের শরণাগত হইলেন। ইংরেজরা যখন সন্ধিসূত্রে কলিকাতার জমিদারী লিখাইয়া লইলেন, তখন মীর জাফরকে স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া সানন্দে লিখিয়া দিতে হইল যে, এতদ্বারা চাকলে হুগলীর জমীদারবর্গ চোধুরীবর্গ প্রভৃতি হরিয়েক ভূম্যধিকারিবর্গকে জানান যাইতেছে যে, তোমরা অদ্য হইতে কোম্পানীর শাসনাধীন হইলে- তাহারা ভাল মন্দ যেরূপ আচরণ করুন না কেন. তোমরা তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লইবে, ইহাই আমার বিশেষ রাজাজ্ঞা। জগৎ শেঠের লাভের পথে কন্টকরোপণ করিয়া ইংরাজদিগকে কলিকাতায় টাকশালা সংস্থাপন করিবার সনদ প্রদান করিতে হইল। খোজা বাজিদের লাভজনক সোরার

ব্যবসায় উৎখাত করিয়া, ইংরাজদিগকেই বেহারের সোরার ব্যবসায়ে একাধিপত্য প্রদান করিতে হইল। উপযুক্ত অবসরলাভ করিয়া, ইংরাজ বণিক সদর্পে বাণিজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইলেন। নানারূপে মীর জাফরের অর্থ শোষণ পূর্বক রাজকোষ শূণ্য করিয়াও তাহাদের ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ হইল না। লবঙ্গের ব্যবসায়, পান সুপারীর ব্যবসায় যাহাতে দেশের লোকের দুপয়সা উপার্জনের পথ দেখিতে পাইলেন, সেই ব্যবসায়মাত্রই ইংরাজদিগের অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল। .... দেশের দশা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। (প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫-২৬)।

ঐতিহাসিক ওর্মির স্বীকৃতি অনুসারে, ইংরেজরা সুবে বাঙ্গালার সর্বত্র প্রবল প্রতাপে স্বাধীন বাণিজ্য বিস্তারের নতুন নতুন পথ বের করে দেশবাসীর ক্ষুধার অন্নে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। নবাব মুর্শিদ কুলী খার সময়ে এই চেষ্টা সফল হয়নি। নবাব 'সিরাজের সময়েও এই চেষ্টা করতে গিয়ে ইংরেজদের লাঞ্ছনার একশেষ হয়েছিল। এখন সময় ও সুযোগ পেয়ে কোম্পানীর নিশান উড়িয়ে সকল ইংরেজই বিনা শুল্কে স্বাধীন বাণিজ্যে লেগে গেল। মীর জাফরও যথারীতি কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ জানালেন। কিন্তু সবই অরণ্যরোদনে পরিণত হল। আগে এমনি অন্তর্বাণিজ্য বিদেশীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই আগের দিন আর নেই তখন।

মুঘলদের শক্তি কেন্দ্র দিল্লীর অবস্থাও তখন সকরুণ হয়ে উঠেছে। মুঘল সম্রাট তখন এক শক্তিহীন পদবী মাত্র। কাগজেপত্রে না হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে মুঘল সাম্রাজ্য তখন বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত। শিবাজী স্বপ্নের রূপকার মারাঠা শক্তি গ্রাস করতে উদ্যত দিল্লীর মুঘল শাহীকে। একদা পরাক্রান্ত মুঘল শক্তি তখন বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন রাজ্যের সুবাদার ও অমাত্যবর্গের অযোগ্যতা অদূরদর্শী স্বার্থপরতা আর বিশ্বাসঘাতকতায় ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত।

সুবে বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ম্যালিসন ও বৃটিশদের বিভিন্ন রেকর্ডপত্রের উপর ভিত্তি করে শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন, মীর জাফরের পক্ষে আত্মভ্রম বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি গোপনে ইংরাজবন্ধুর স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিবারও আয়োজন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাগ্যদোষে সে চেষ্টা সফল হয় নাই। .... এই সময়ে যবদ্বীপের ওলন্দাজগণ ভাগীরথীবক্ষে যুদ্ধ জাহাজ লইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব সাধনের চেষ্টা করায় ইংরাজেরা বুঝিলেন ইহা বুঝি মীর জাফরের স্বাধীনতা লাভের কুটিল কৌশল। ওলন্দাজদিগের কলিকাতা আক্রমণের চেষ্টা সফল হইল না। মীর জাফর তাহার জন্য তিরস্কৃত হইয়া, এক হস্তে অশ্রু সংবরণ করিয়া অপর হস্তে ক্লাইভের নামে এক বহুমূল্য জায়গীরে দানপত্র লিখিয়া দিয়া কোনরূপে সিংহাসন রক্ষা করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই বজ্রাঘাতে প্রিয় পুত্র মীরণের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। (প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩)। সকলেরই সন্দেহ মীরণের মৃত্যু রবার্ট ক্লাইভের ষড়যন্ত্রের ফল।

অতঃপর ১৭৬০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী ক্লাইভ কিছুদিনের জন্য স্বদেশে রওনা হওয়ায় অন্ধকূপ রচয়িতা হলওয়েল হলেন কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের সভাপতি। এবং হলওয়েলের ষড়যন্ত্রে অযোগ্যতার অপবাদে সুবে বাঙ্গালার মসনদ হারালেন মীর জাফর। মসনদ আবার চড়া দামে বিক্রিত হল। কোম্পানীর সঙ্গে মীর জাফর জামাতা মীর কাশেম আলী খাঁর গোপন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল ১৭৬০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। সুবে বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করলেন নাসিরুল মুলক ইমতিয়াউদ্দৌলা মীর মুহাম্মদ কাশেম আলী খাঁ নসরৎজঙ্গ বাহাদুর।

নবাবীর এই হাত বদলে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট পেয়েছিলেন (প্রকাশিত হিসাব মতে)

৫৮, ৩৩৩ পাউন্ড, হলওয়েল ৩০,০০০ পাউন্ড, সেনাপতি কেলড ২২,৯১৬ পাউন্ড এবং সামনার ম্যাগুয়ার স্মিথ ও অন্যান্যরা মিলে একুনে ১,৯৯,৩৩২ পাউন্ড।

শ্বশুর মীর জাফরের ঘৃণ্য পদাঙ্ক অনুসরণ করে জামাতা মীর কাশেমও এহেন কাজটি করলেন কেন?

মীর কাশেম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতক ও অযোগ্য অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত মীর জাফরকে ক্রীড়নক নবাব বানিয়ে সুবে বাঙ্গালার প্রকৃত শাসক হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদেশী বানিয়ারা। তাছাড়া, সাম্রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে তখন সংযোজিত হয়েছে এক নতুন মাত্রা যা মীর কাশেমকে যেন তেন প্রকারে সুবার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

দিল্লীর শাহী মহলে চলছে তখন তুলকালাম কাণ্ড। মারাঠাদের তখনকার মিত্র স্বার্থান্ধ মন্ত্রী গাজীউদ্দিন অন্ধ করে দিয়েছে মুঘল বাদশাহ আহমদ শাহকে। তার মসনদ কেড়ে নিয়ে তাতে বসিয়েছে অন্য এক ক্রীড়নক বাদশাকে। অন্য বাদশাহর পুত্র শাহজাদা আলী গওহর (শাহ আলম) তখন প্রাণভয়ে পলাতক, এবং পিতৃ সিংহাসন পুনরুদ্ধারের আশা বুকে নিয়ে পাটনার পথে অগ্রসরমান। আমাদের পরবর্তী বক্তব্যটা খোলাসা করার লক্ষ্যে নীচে মুঘল বাদশাদের একটা চার্ট দেওয়া হল ঃ

জহিরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবর (১) ঃ (১৫২৬-১৫৩০)খৃঃ
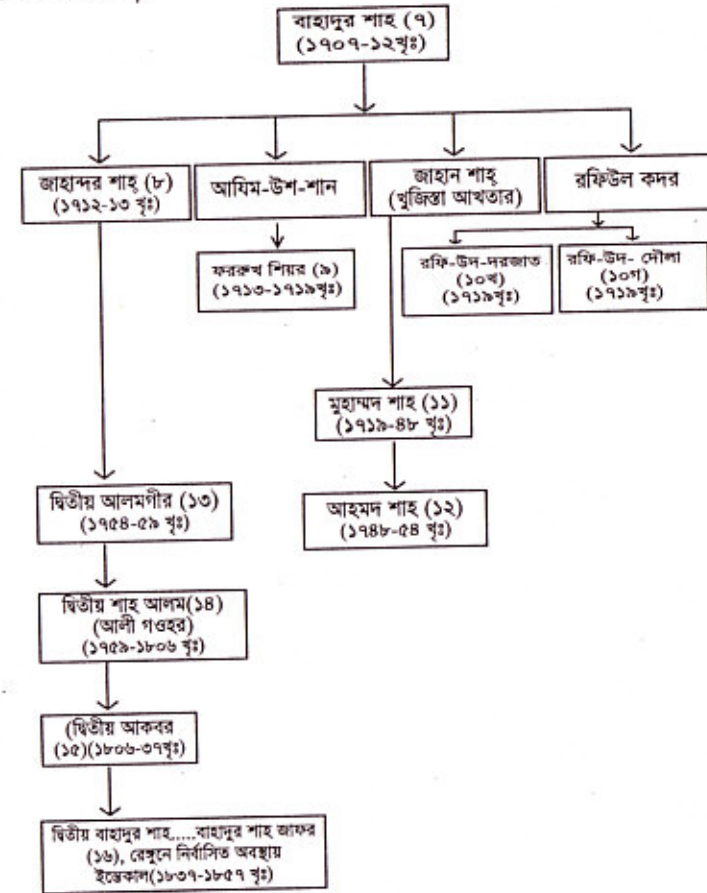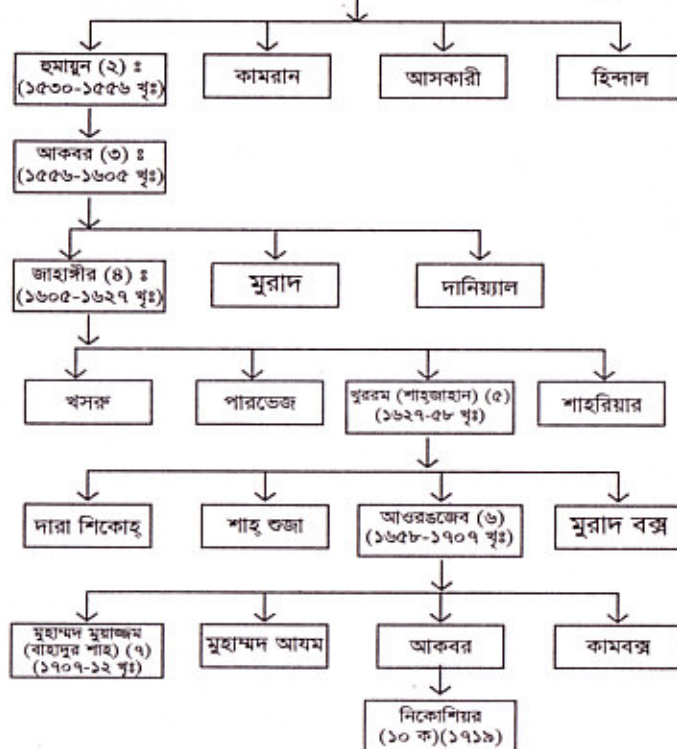
উপরিউক্ত চার্টে লক্ষণীয় যে, ১৭১৯ সালে কয়েক মাস করে ৩ জন শাহজাদাকে বাদশাহ করা হয়। বস্তুত এদেরকে স্বার্থান্ধ মন্ত্রী সেনাপতিদের নির্দেশে হেরেম থেকে ধরে এনে মসনদে বসানো হয় এবং কয়েক মাস যেতে না যেতেই হত্যা করা হয়। অতঃপর বাদশাহ হন মুহম্মদ শাহ এবং দীর্ঘদিন টিকে যান। তার রাজত্বকালেই নাদির শাহ দিল্লী আক্রমণ করে জান মাল ও মানের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে যান। মুহাম্মদ শাহর মৃত্যুর পর বাদশাহ হন আহমদ শাহ। এই আহমদ শাহকেই অন্ধ করে দেয় মারাঠা বন্ধু ধূর্ত মন্ত্রী গাজীউদ্দিন। এবং দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র শাহজাদা আলী গওহর (শাহ আলম) পলাতক অবস্থায় বেরিয়ে পড়েন পাটনার পথে।

নবাব মীর কাশেম জানতে পারেন যে ইংরেজরা দিল্লী মসনদের অভিলাষী এই শাহজাদা আলী গওহরকে হাত করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ ইংরেজরা দিল্লীর মসনদে বসাতে চাইছে নিজেদের অনুগত কোন বাদশাকে। আর তাই যদি হয় তাহলে

ইংরেজরা একদিন তাকেও সরিয়ে নিজেদের পছন্দমত অন্য কাউকে সুবে বাঙ্গালার নবাব বানিয়ে দেবে; প্রকৃত শাসক হবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ইতোমধ্যে রাজবল্লভ দুর্লভরামদের নতুন ষড়যন্ত্রও আরম্ভ হয়ে গেছে এবং সে ষড়যন্ত্র তাকেই (নবাব মীর কাশেমকেই) শক্তিহীন করার ষড়যন্ত্র। পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করে অধীর হয়ে উঠলেন নবাব মীর কাশেম। তাই শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্তেই দৃঢ়সংকল্প হলেন তিনি। মীর কাশেমের তখনও আশা মুঘলদের এই চরম বিপর্যয়েও সুবে বাঙ্গালার স্বাধীনতা তিনি রক্ষা করবেন।

মসনদে আরোহণ করেই নবাব মীর কাশেম অর্থ সঞ্চয়, রাজ্যের নানা স্থানের বিদ্রোহ ও অরাজকতা দমন, দিল্লীর শাহজাদার পূর্বাভিমুখে আগমনের প্রতিরোধ এবং দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। মসনদে বসে রাজকোষ থেকে পেয়েছিলেন মাত্র ৫০ হাজার টাকা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃচ্ছতার পথ অনুসরণ করলেন। তার হুকুমে রাজপ্রাসাদের বিলাস তরঙ্গ সহসাই তিরোহিত হল, নৃত্যগীত থেমে গেল, অপাসিত হল ঐশ্বর্যচ্ছটা। রাজপ্রাসাদের স্বর্ণ রৌপ্যাদির তৈজসপত্র অথবা মনিরকমতাদি বিক্রি করা হল। মীর জাফরী আমলের অযোগ্য সকল রাজ কর্মচারীদের বরখাস্ত করে সেসব পদে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হল এবং বরখাস্তকৃতদের অন্যায়ভাবে সঞ্চিত ধনরত্নাদিও বাজেয়াপ্ত করা হল।

মীর জাফরের অসঙ্গত বাৎসলবশতঃ কয়েকজন সামান্যপদস্থ রাজানুচর বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা মীর জাফরের দুর্দ্দশার দিনে সুবা বাংলা বিহার উড়িষ্যার অধিকাংশ রাজকর কুক্ষিগত করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কিনুরাম, মনুলাল এবং চিকনলালের নাম ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহারা সকলেই নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর ভৃত্যরূপে নবাব সরকারে প্রবেশ করে মীর জাফরের ভাগোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের এতদূর পদোন্নতি হইয়াছিল যে সে সময়ে মন্ত্রি মহাশয়দিগকেও এই সকল ভৃত্যের নিকট প্রসাদ ভিক্ষা করিতে হইল। স্বার্থসাধনই ইহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য, সুতরাং ইহারা মীর জাফরের অধঃপতন সময়ে ধনরত্ন কুক্ষিগত করিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িতেছিল। সুচতুর নবাব ইহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া, হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। (প্রাগুক্ত পৃঃ ৭১)

এরূপ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করে মসনদ লাভের একমাসের মধ্যে নবাব মীর কাশেম কলকাতার ইংরেজ কোম্পানীকে দিলেন আড়াই লাখ টাকা, পাটনাস্থ নবাব সেনার জন্য ২ লাখ টাকা দিলেন সেনাপতি কেলডকে। বকেয়া বেতনাদি পেয়ে দেশীয় এবং ইংরেজ সৈন্যরা শান্ত হল কোম্পানীও অর্থ কষ্ট থেকে রেহাই পেল।

কিন্তু কোম্পানীর পদস্থ সদস্যদের মধ্যে তখন আত্মকলহ আরম্ভ হল। এর কারণ মীর কাশেমের মসনদপ্রাপ্তি যখন সাব্যস্ত হয়, তখন কোম্পানী কাউন্সিলের সকল সদস্যই উপস্থিত ছিল না। মীর কাশেমের গোপনে প্রদত্ত টাকা শুধুমাত্র উপস্থিত সদস্যরাই পেয়েছিল। অনুপস্থিত সদস্যরা তাতে খুবই ক্ষুব্ধ হয়। তারাই এখন নতুন নবাবের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে গেল। কিন্তু সর্বাধিক পরিমান অর্থলাভকারী গভর্ণর ভ্যাসিটার্ট নবাবের পক্ষে থাকায় নবাবের তেমন কোন বিপদ হল না।

তখনও মীর জাফর প্রতিশ্রুত কোম্পানীর পাওনা অর্ধেকের মত অর্থ পরিশোধ

করা বাকি। নবাব মীর কাশেম তারও একটা সুরাহা করে ফেললেন। মীর জাফরের সময়েই নদীয়া, বর্ধমান প্রভৃতি গোলযোগপূর্ণ এলাকার রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হত ইংরেজদের উপর। মীর কাশেম ভেবে চিন্তে বিরাট ঋণের বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলসমূহ ইংরেজ কোম্পানীর কাছে এই শর্তে ইজারা দেওয়ার প্রস্তাব করলেন যে বাকি ঋণ এর থেকে পরিশোধ হবে এবং ওই অঞ্চল সমূহের অধিকারী থাকবে কোম্পানী। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ এতে রাজী হয়ে গেল এই ভেবে যে, এতদিন পর সুবে বাঙ্গালায় তাদের একটা জমিদারী হল। এদিকে নবাবের মনোভাব এই যে, বর্গীর হাঙ্গামায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত মেদিনীপুর বর্ধমান অঞ্চল এবং মগ ফিরিঙ্গি লাঞ্ছিত চট্টগ্রাম অঞ্চল ইজারা দিয়ে বাদবাকি দেশটাকে ইংরেজদের আধিপত্যমুক্ত করা গেল। সর্বোপরি বিরাট ঋণের চাপ থেকে মুক্তি পেলেন সুবে বাঙ্গালার নবাব।

এবার রাজ্যে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস। এ প্রয়াসেও অনেকটাই সফল হলেন নবাব মীর কাশেম। বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ইংরেজদের উন্নততর রণকৌশল এবং দেশীয়দের চারিত্রিক অধঃপতন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ইউরোপীয়দের সাহায্যে দেশীয় সৈন্যদের নিয়ে গড়ে তুলবেন এক সুশৃঙ্খল রণনিপুণ বাহিনী। স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতে হলে এমনি এক সেনাবাহিনীর খুবই প্রয়োজন। এ কাজেই হাত দিলেন নবাব মীর কাশেম। আর ঠিক তখনই দিল্লীর পলাতক শাহজাদা আলী গওহর সসৈন্যে পাটনায় এসে শিবির স্থাপন করলেন। এটা ১৭৬১ সালের কথা। এই সালেই সংঘটিত হয় তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ, যে যুদ্ধে চরমভাবে বিপর্যস্ত হয় হিন্দু মারাঠা শক্তি। কিন্তু হিন্দুস্থানের মুসলিম শক্তিও তখন হীনবল, আহমদ শাহ আবদালী যুদ্ধ জয় করে ফিরে গেছেন আফগানিস্তানে। দিল্লীশাহীও খুবই নড়বড়ে। এই উপমহাদেশে তাই একচ্ছত্র শক্তির বাস্তবতা নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ইংরেজ শক্তি। নবাব মীর কাশেম তাই চিন্তা ভারাক্রান্ত। পাটনায় ইংরেজদের সেনা ছাউনী আগে থেকেই ছিল। এবার নবাব মীর কাশেম সসৈন্যে এসে ছাউনী ফেললেন পাটনায়।

দিল্লী শাহজাদার প্রকৃত মিত্র ও সাহায্যকারীরূপে আবির্ভূত হবে কোন শক্তি? কোম্পানী শক্তি, অথবা মীর কাশেমের মুঘল শক্তি? এই নিয়ে আরম্ভ হল ইংরেজ সেনানায়ক মেজর কারনাকের সঙ্গে নবাব মীর কাশেমের প্রতিযোগিতা এবং অবশেষে মন কষাকষি। অবশেষে ১২ ই মার্চ পাটনার ইংরাজ কুঠিতে শাহজাদার সহিত মীর কাসিমের শুভসম্মিলন সম্পন্ন হইল। ..... ইংরাজদিগের অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই; তাহারা সিংহাসনের অভাবে দুইখানি খানার টেবিল পাতিয়া তাহার উপর লাল বনাত বিছাইয়া দিলেন এবং গৃহতল গালিচায় মন্ডিত করিয়া যথাসাধ্য সাজসজ্জা সুসম্পন্ন করিলেন। বাহিরে ইংরাজ সেনা সারি বাঁধিয়া দন্ডায়মান হইল। শাহজাদা তোরণদ্বারে উপনীত হইবামাত্র ইংরাজ সেনানায়কগণ পদব্রজে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাহাকে সসম্ভ্রমে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। শাহজাদা উপবেশন করিবামাত্র দরবার আরম্ভ হইল। ইংরাজ সেনাপতিগণ নজর প্রদান করিয়া ও যথারীতি কুর্নীশ করিয়া দরবারের মর্যাদা রক্ষা করিলেন। এক ঘন্টা পরে মীর কাসিম উপনীত হইলেন। তাহাকেও যথারীতি নজর প্রদান করিতে হইল। শাহাজাদা তাহাকে সিংহাসনের এক পার্শ্বে আসন দান করিয়া, যথাসাধ্য খেলাতসহ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবাদার পদে অভিষেক করিলেন।

মীর কাসিম বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা রাজকর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সুবাদারী গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে দরবার ভঙ্গ হল... মীর কাসেমের মুখ অবনত হইল। .... মীর কাসেমকে অধীনতা স্বীকার করিতে হইল। ইংরাজেরা শাহজাদাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া দিতে সম্মত না হওয়ায় শাহ আলমকে অল্পদিনের মধ্যেই ভগ্ন হৃদয়ে পাটনা পরিত্যাগ করিতে হইল। ... এই দরবারেই ইংরাজশক্তি বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যখন এই সমাচার ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন সকলেই চাহিয়া দেখিল ইংরাজ বণিকের ইচ্ছানুসারে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব কেন, ভারতবর্ষের অধীশ্বর পর্যন্ত পরিচালিত হইতেছেন। (প্রাগুক্ত ১০৪-১০৫)

চমৎকার এক নাটকের অভিনয় হয়ে গেল পাটনার ইংরেজ ছাউনীতে। এই নাটক থেকে ভবিষ্যতের দেয়াল লিখন অনেকটাই পড়ে নিলেন নবাব মীর কাশেম। দিন যেতে লাগল। শাসনকার্য চালাতে লাগলেন সুবে বাঙ্গালার নবাব। ইংরেজ ঐতিহাসিক ম্যালিসন লিখে গেছেন-১৭৬২ সালের মধ্যে নবাব মীর কাশেম দেশকে শুধুমাত্র ঋণমুক্তই করেন নি, ব্যয়ের চেয়ে রাজস্ব আদায়ও বাড়িয়ে তুলেছিলেন। রাজকোষে এই যে অর্থসঞ্চয় তার পেছনে প্রজাপীড়ন ছিল না ছিল মিতব্যয়ভিত্তিক দক্ষ শাসন কৌশল।

রাজকোষের এই সঞ্চিত অর্থ দিয়ে মীর কাশেম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার কাজ আরম্ভ করেন। কর্মকুশল দিশীয় কারিগর নিয়োগ করে গুলী গোলা বারুদ কামান বন্দুক প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। ইউরোপীয় প্রণালীতে সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। মুঙ্গের কেল্লা হয়ে ওঠে এক অভিনব শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। নবাব মীর কাশেম যেসব ইউরোপীয় যুদ্ধবিশারদের সাহায্যে নিজ সেনাবাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে গ্রেগরী, সমরু, মার্কার প্রমুখের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

নবাব মীর কাশেম যে নীরবে দক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছেন, এ খবর নবরূপী ক্রুসেডার ইংরেজদের অজ্ঞাত ছিল না। তারা এই বিচিত্র চরিত্র নবাবটির কার্যাবলী ও গতিবিধির উপর নজর রেখে অপেক্ষা করতে থাকল। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকলেন নবাব মীর কাশেমও। এর মধ্যেই নবাব বুঝে নিয়েছিলেন সরাসরি রাজ্যলাভে ইংরেজ আজও ততটা আগ্রহী নয়, যতটা আগ্রহী তারা এদেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠনে। আর সেই লুণ্ঠন দিনের পর দিন সংঘটিত হয়ে চলেছে ইংরেজ কর্তৃক কোম্পানীর নামের আড়ালে অন্যায়ের পথে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চালাতে লাগল বিনা শুল্কে এবং এদেশীয়রা শুল্ক দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই এ অসম প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে লাগল দেশীয় বণিকেরা। কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কাছে নবাব এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তাতে তেমন কোন ফল না হলেও গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করার দায়িত্ব দিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসকে। হেস্টিংস এবং পরে ভ্যান্সিটার্ট দেন-দরবার করে ইংরেজদের শতকরা নয় ভাগ শুল্ক দিতে হবে বলে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ পেশ করলেন। কিন্তু সকল ইংরেজের মতামতের তোড়ে এ সুপারিশ প্রত্যাখ্যাত হল।

এ প্রসঙ্গে ভ্যান্সিটার্ট তার গ্রন্থে (Vansittarts Narrative) লিখে গেছেন, 'দেশ একেবারে অরাজক হইয়া উঠিয়াছে, নবাবের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত

হইয়া গিয়াছে, জলে স্থলে বাঙ্গালীর আকুল আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিলে, ইংরাজ গোমস্তার সিপাহীসেনা তাহাকে দণ্ডদান করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছে না। কোন দেশের শাসনকর্তা এরূপ অরাজকতা সহ্য করিতে পারেন না, ইংরাজ গভর্ণরকে তাহা স্বীকার করিতে হইল। (উদ্ধৃত প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৫)

এমনি অবস্থায় নবাব মীর কাশেম নিজ কর্তব্য স্থির করলেন। ১৭৬৩ সালের ৫ ই মার্চ। নবাব এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য সকলের জন্যই শুল্ক রহিতের ঘোষণাপত্র। এ ঘোষণার বলে দেশীয় বণিকেরাও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়ে গেল। ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য জেনেও সুবে বাঙ্গালার নবাব এ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। ব্যস, প্রস্তুত হয়ে গেল সংঘর্ষের ক্ষেত্র। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট তার স্বদেশীদের পক্ষ গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। তাহাদের বিচারে মীর কাসিমের স্কন্ধেই সকল অপরাধ ন্যস্ত হইল। তিনি সহজে সম্মত না হইলে, তাহাকে বাহুবলে সিংহাসনচ্যুত করিবার সংকল্পও স্থির হইয়া গেল। (প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৯)

এই পরিস্থিতিতে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করল। এক, পাটনায় অবস্থিত সেনানায়ক এলিসকে যথাসময়ে পাটনা দুর্গ দখল করার আদেশ দেওয়া হল, দুই, আমিয়ট ও হে সাহেবকে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে মুঙ্গেরের নবাব দরবারে প্রেরণ করা হল। অর্থাৎ উপরে উপরে আলাপ আলোচনা এবং তলে তলে পাটনা আক্রমণের অভিসন্ধি।

এদিকে সব খবরই পেয়েছিলেন নবাব মীর কাশেম। তবুও যুদ্ধ এড়াবার লক্ষ্যে শুল্ক রহিতের যুক্তিগুলো কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে বুঝাবার জন্য নবাব নিজের দূতকে পাঠালেন কলকাতায়। বলা বাহুল্য, দুই পক্ষের দূতই দুই স্থানে আটকা পড়ল। তবে ইংরেজ দূতদের প্রতি যথাসময়ে মুঙ্গের থেকে গোপনে পলায়ন করারও নির্দেশ ছিল। কিন্তু তা কার্যে পরিণত হওয়ার আগেই নবাব আমিয়টকে কলকাতায় ফিরে যেতে অনুমতি দিলেন, মুঙ্গেরে থেকে গেল হে সাহেব। এর মধ্যে সেনানায়ক এলিস রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে বসে পাটনা দুর্গ ও পাটনা শহর। শহর লুণ্ঠিন হয়, প্রাণ দেয় অনেক নরনারী। কিন্তু অতর্কিতে পাটনা দুর্গ আক্রমণ করে প্রথমে বিজয়ী হলেও সেনানায়ক লালসিং ও মুহাম্মদ আমিনের বীরত্বপূর্ণ মোকাবিলায় ইংরেজদের বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। ওদিকে মুঙ্গের থেকে নবাব প্রেরিত এক বাহিনী নিয়ে পাটনায় এসে উপস্থিত হয় সেনানায়ক মার্কার। নদী পথে পালাতে গিয়েও বাহিনীসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেনানায়ক এলিস। আর এই কাপুরুষোচিত পাটনা আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় মুর্শিদাবাদের পথে ধাবমান আমিয়টও সসৈন্যে প্রাণ হারায় নবাব সৈন্যদের হাতে।

উত্তরকালের ইংরাজ লেখকগণ মীর কাসিমের প্রতি সুবিচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইংরাজদিগের দোষেই যে যুদ্ধ কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। (প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৯)। এর মধ্যে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতায় পত্র পাঠালেন নবাব মীর কাশেম। পাটনা লুণ্ঠনের জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। তদুপরি এর আগে ইজারা দেওয়া অঞ্চলাদিও তিনি প্রত্যর্পণ করতে বলেন। অবিশ্যি এ পত্রের কোন উত্তর দেয়নি কোম্পানী কর্তৃপক্ষ। তবে কোম্পানী তার কর্তব্যও স্থির করে ফেলে। কোম্পানীর

সিদ্ধান্ত হল সুবে বাঙ্গালার নবাবী মসনদে মীর কাশেমের বদলে আবার উপবিষ্ট হবেন রুগ্ন বৃদ্ধ সেই মীর জাফর আলী খা বাহাদুর।

এবার দেশের আর এক স্বাধীনতাব্রতী মীর কাশেম বাহিনী নিয়ে নবরূপী ক্রুসেডার ও তাদের ক্রীড়নক মীর জাফরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নিয়োজিত। মীর কাশেমের মনে তখনও আশা এখনও দিল্লীর নাম বিলুপ্ত হয়নি, এখনও অযোধ্যায় রয়েছেন স্বাধীন সত্তায় অধিষ্ঠিত শুজাউদ্দৌলা। দিল্লী ও অযোধ্যা কি তার পাশে এসে দাঁড়াবে না? কিন্তু অবস্থা বৈগুণ্যে মীর কাশেম ভুলে গিয়েছিলেন তার প্রত্যাশিত মিত্রদের চরিত্রের কথা, ভুলে গিয়েছিলেন দিল্লী ও অযোধ্যার বাস্তব পরিস্থিতির কথা। দিল্লীর বাদশাহতো তখন একটি পদবীর ধারক মাত্র, নিতান্ত অসহায়। আর অযোধ্যা? দিল্লীর কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তিকে চরম আঘাত হেনে অযোধ্যা রাজ্যে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শূজাউদ্দৌলা ব্যাকুল। তবুও মীর কাশেমের আশা.....

কিন্তু আশার পথে অগ্রসর হওয়ার আগেই তাকে বৈরী শক্তির মোকাবিলা করতে হল। তাকে কোম্পানী শক্তির মোকাবিলা করতে হল বিভিন্ন রণাঙ্গনে-কাটোয়ায়, গিরিয়ায়, উধুয়ানালায়। এবং সকল রণাঙ্গনেই পরাজিত হল মীর কাশেমের বাহিনী। এইরূপে উধুয়ানালা মীর কাশেমের সমস্ত সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পলাশী ও উধুয়ানালা এই দুই স্থানে বাঙ্গালার মুসলমান গৌরব চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়। দুঃখের বিষয় এই দুই স্থানেই বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুরীর সাহায্যে ইংরেজরা জয় লাভ করিয়াছিলেন। .... ইংরেজদিগের অসাধু ব্যবহারের জন্য যেমন পলাশীর যুদ্ধ ঘটে, উধুয়ানালা যুদ্ধের পুর্ব কারণও তাহাই। ইংরেজদিগের কৃত অবমাননায় ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া, মীর কাসেমকে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তিনি ইংরেজদিগের অসদ্ব্যবহারে এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, কোন দেশীয় গ্রন্থকার (রিয়াযুস সালাতিন পৃঃ ৩৮২) লিখিয়াছেনঃ মীর কাসেম কোন নির্দিষ্ট দিবসে যেখানে যত ইংরেজ ছিল, তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদ করিবার জন্য স্বীয় কর্মচারীদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে ভাগ্য ইংরেজদিগের যেরূপ সহায় ছিল তাহাতে মীর কাসেমের শত চেষ্টা কার্য্য পরিণত হইতে পারে নাই। তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে ইউরোপীয় রণকৌশলে সুশিক্ষিত করিয়াও ইংরেজদিগের ক্ষমতা গ্রাস করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার ইউরোপীয় কর্মচারীগণের যথেচ্ছ ব্যবহারে এবং তাহার দেশীয় কর্মচারীগণের সাহসাভাব ও বিলাসিতার জন্য তাহার অধিকাংশ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাহার কোন কোন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা তাহার অনেক কার্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। .... মীর কাশেম হইতে মুর্শিদাবাদ বা বাঙ্গালার মুসলমান স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য অন্তর্নিহিত হয়। (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, শ্রী নিখিলনাথ রায়, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৬ সাল, পৃঃ ২৭৯-২৮১)

উধুয়ানালার যুদ্ধেও পরাজিত হয়ে মীর কাশেম উন্মত্তবৎ হয়ে উঠলেন। চারদিকে এত বিশ্বাসঘাতক? আরাব আলি খাঁ নামক একজন বিশ্বাসী সেনানায়কের উপর মুঙ্গের দুর্গের শাসনভার সমর্পণ করিয়া, মীর কাসিম পাটনাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। ইংরেজরা ১ লা অক্টোবর মুঙ্গেরে উপনীত হইলে, নবম দিবস দুর্গাবরোধের পর, কেল্লাদার আরাব আলি খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজেরা কেল্লা জয় করিয়া, দুই সহস্র সিপাহী কারারুদ্ধ করিলেন। (Scotts History of Bengal pp. 428-429 উদ্ধৃত্ব মীর কাসিম, শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইত্যাদি, পৃঃ ১৮২)

"মুঙ্গেরের নবাব সেনা ইংরাজ পল্টনে প্রবেশ করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিতেও ত্রুটি করিল না। এই সকল সংবাদ যখন মীর কাসিমের কর্ণগোচর হইল, তখন আর কেহই সাহস করিয়া তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ হত্যাকাণ্ডের আদেশ প্রচার করিলেন"। (প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮২)

উপর্যুপরি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আগেই নিহত হয়েছিলেন রাজা রামনারায়ণ জগৎ শেঠ মহাতপ চাঁদ মাহারাজা স্বরূপ চাঁদ রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি ইংরেজ হিতৈষীবৃন্দ। এবার করায়ত্ত বাদবাকি বিশ্বাসঘাতকদের পালা।

কিন্তু দেশকে বিশ্বাসঘাতকমুক্ত করতে পারবেন কি মীর কাশেম? তিনি তার আশা পূরণের লক্ষ্যে শেষ চেষ্টা করবেন। তাই নিজের বাদবাকি সৈন্যদের নিয়ে তিনি সুবে বাঙ্গালার সীমানা অতিক্রম করলেন। অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলার বার্তা পেয়েছেন তিনি। মীর কাশেমকে অযোধ্যার আমন্ত্রণের বার্তা। তাতে ছিল মীর কাশেমকে নিরাপত্তা ও সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি। উপর্যুপরি বিপর্যস্ত হইয়া নদীস্রোতে ভাসমান অসহায় মনুষ্যের ন্যায়, মীর কাসিম সামান্য তৃণখন্ডের আশ্রয়কেও প্রবল আশ্রয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শুজাউদ্দৌলার ব্যবহারেই মীর কাসিমের আশা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল"। (প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৫)

তখনও ৩০ হাজারের মত এক সেনাবাহিনী মীর কাশেমের পৃষ্ঠরক্ষক হিসাবে উপস্থিতঃ সঙ্গে ধনরত্ন ও ৫ কোটি টাকার মত। শুজাউদ্দৌলার প্রধানমন্ত্রী বেণী বাহাদুরের চরিত্র সম্পর্কেও ওয়াকেবহাল ছিলেন মীর কাশেমের পাত্রমিত্রগণ। তারা অযোধ্যা প্রবেশ থেকে মীর কাশেমকে নিরস্ত্র করতে পারলেন না। পবিত্র আল কুরআনের আবরণ পৃষ্ঠায় শুজাউদ্দৌলার স্বহস্তলিখিত প্রতিশ্রুতিবহ পত্র যে তিনি পেয়েছেন। আল কুরআন স্পর্শ করে মীর জাফরের শপথ এবং তদসত্ত্বেও নবাব সিরাজের পরিণামের কথাও মীর কাশেমকে স্মরণ করিয়ে দিলেন পাত্রমিত্রগণ। তাতেও কাজ হল না। অযোধ্যা রাজ্যে প্রবেশ করলেন রাজ্যহারা নবাব মীর কাশেম।

তার পরবর্তী ইতিহাস নবাব শুজাউদ্দৌলার বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস, দিল্লীর শাহজাদার ইংরেজ আনুগত্যজনিত দুর্বলতার ইতিহাস। এদিকে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ মীর কাশেম শুজাউদ্দৌলা শাহ আলমের অগ্রসরমান মৈত্রীর ব্যাপারে আশঙ্কিত হয়ে যথাকর্তব্যে মনোযোগী হল। এমনি অবস্থায়ই কৌশলের প্রয়োজন। "কৌশল প্রয়োগে মীর জাফর সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তাহার মন্ত্রণাদাতা মহারাজা নন্দকুমার কুটিল কৌশলের উষ্ণ প্রস্রবণ বলিয়াই ইতিহাসে সুপরিচিত। সুতরাং কৌশল প্রয়োগের ত্রুটি হইল না। ...... মীর জাফর গোপনে শুজাউদ্দৌলার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। .... বেণী বাহাদুর বাদশাহের দরবারে নানা ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া, বাদশাকে মীর জাফরের পক্ষভুক্ত করিয়া তুলিলেন"। (প্রাগুক্ত পৃঃ ২০০)

সুতরাং মীর কাশেমের শেষ আশা আবার তিন শক্তির ত্রহস্পর্শ যোগে শূন্যে মিলিয়ে গেল। এতদিন মীর কাশেম দিল্লীর শাহ আলমকেও অযোধ্যার শুজাউদ্দৌলাকে এবং তাদের পাত্রমিত্রকে ধনরত্ন দিয়ে আসছিলেন। এখন মীর কাশেমের সে ক্ষমতায়ও টান পড়ল। সেনানায়ক সমরু তখনও মীর কাশেমের সঙ্গে । অর্থাভাবে মীর কাশেম সেনাদলসহ সমরুকে বিদায় দিলেন। সমরু সেনাদলসহ শুজাউদ্দৌলার

বাহিনীতে যোগ দিল। এবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলা।

"শুজাউদ্দৌলার আদেশে সেনাদল আসিয়া মীর কাসিমের পটমণ্ডপ অবরুদ্ধ করিল। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিল; কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। সকলে মিলিয়া মীর কাসিমকে বন্দী বেশে টানিয়া লইয়া গেল; পটমণ্ডপ লুণ্ঠিত হইল; মহিলাবর্গের বস্ত্রাভ্যন্তরেও তস্করের কঠোর হস্ত প্রসারিত হইল; দেখিতে না দেখিতে মীর কাসিমের সর্বস্ব অপহৃত হইয়া গেল"। (প্রাগুক্ত পৃঃ ২১১)। তখন মীর কাশেমের ভৃত্য, নাম তার মুহাম্মদ আসির,. কিছু ধনরত্ন নিয়ে গোপনে পালিয়ে গেল রোহিলাখণ্ডে। তার সঙ্গে ছিল মীর কাশেমের পরিবারবর্গ। সেখানে সেই পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থার করে শেখ মুহাম্মদ আসির তার নবাবের মুক্তি লাভের আশায় প্রতীক্ষা করতে লাগল।

আবার একটানা যুদ্ধ হয়েছিল; সেটা আরার নিকটে বকসারে, ১৭৬৪ সালের ২৩ অক্টোবর। মেজর মনরোর নেতৃত্বাধীন কোম্পানী বাহিনীর সঙ্গে শুজাউদ্দৌলার বাহিনীর যুদ্ধ। দিল্লীর শাহজাদা শাহ আলম যুদ্ধভূমির নিকটেই শিবির সংস্থাপিত করে নিরপেক্ষ দর্শকের মত যুদ্ধের ফলাফল লক্ষ্য করছিলেন। সেই যুদ্ধে বিজয়ী হতে হতেও পরাজিত হন অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলা। অগত্যা পলায়নে বাধ্য হন অযোধ্যার অভিনেতা নবাব। এ যুদ্ধের সেনাপতিরূপে বকসারে আসার আগে অবিশ্যি কি মনে করে "শুজাউদ্দৌলা মীর কাশেমকে এক খঞ্জ হাতীতে চড়িয়ে মুক্তি দিয়ে যান। মীর কাশেম শুজাউদ্দৌলার শিবির হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, অধিক দূর গমন করিবার পূর্বেই বকসার যুদ্ধের পলায়নপর সেনাদল চারদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ..... অগত্যা মীর কাশিম খঞ্জ হস্তী পরিত্যাগ করিয়া, দস্যু তস্করের ন্যায় লোকালয় ছাড়িয়া, অরণ্যপথে পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় পথশ্রমে ভাগ্য বিপর্য্যয়ে তাহার দশা এমন শোচনীয় হইয়া উঠিল যে, তাহাকে আর সহসা বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাব বলিয়া চিনিয়া লইবার উপায় রহিল না। (প্রাগুক্ত পৃঃ ২১৫)

তাতে করে অবিশ্যি মীর কাশেমের জীবন রক্ষার উপায় হল। কারণ ইংরেজদের ঘোষণা ছিলঃ যে নবাব মীর কাশেমকে ধরিয়ে দিতে পারবে, সেই লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। ... তাই বকসারে শুজাউদ্দৌলার পরাজয় বার্তা শুনে তিনি যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে, হিন্দুস্তানের ইংরেজ শক্তিই যখন সকল বাদশার ভাগ্যবিধাতা হিসাবে আবির্ভূত তখন তার নিরাপত্তার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। সুতরাং খঞ্জ হাতী থেকে নেমে ফকীর বেশে একদা নবাব মীর কাশেম ধরলেন রোহিলাখণ্ডের পথ।

আর এদিকে? বকসার যুদ্ধের নিরপেক্ষ দর্শক শাহ আলম বিজয়ী ইংরেজদের আশ্রয় লাভের জন্য লালায়িত হয়ে উঠলেন। অবশেষে তার এতদিনের মনোবাসনা পূর্ণ হল। ১৭৬৪ সালের ২৪ শে নবেম্বর ইংরেগ সেননায়কগণ শাহ আলমের সম্মুখে উপনীত হয়ে বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তাকে যথারীতি কর্নিশ করে নজর প্রদান করলেন। ইংরেজদের সঙ্গে বাদশার মৈত্রী এবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এখনও কোম্পানী কর্তৃপক্ষ সুবে বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ করতে ইতস্তত করছিল। এই ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে দিলেন ক্লাইভ সাহেব, ১৭৬৫ সালে দ্বিতীয়বারের মত গভর্নর হয়ে কলকাতায় ফিরে আসবার পর। তখন তিনি লর্ড ক্লাইভ।

এবং সুবে বাঙ্গালার মসনদে দ্বিতীয়বারের মত উপবিষ্ট মীর জাফর? ইংরেজদের হুকুম আহকাম পালন করতে করতে ৭৪ বছর বয়সে দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করেন ১৭৬৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। পলাশীর যুদ্ধটাও হয়েছিল এই বৃহস্পতিবারেই। "মৃত্যুকালে পাপস্খলনের জন্য মহারাজা নন্দকুমার শ্রীশ্রী কিরীটাশ্বরী দেবীর চরণামৃত আনাইয়া মীর জাফরের কণ্ঠশোষ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন"। (প্রাগুক্ত পৃঃ ২২০)। অর্থাৎ সারা দেহে মীর জাফরের তখন মৃত্যুজ্বালা আরম্ভ হয়েছে। কণ্ঠে তার অসীম পিপাসা। সেটাকেই বলা হয়েছে কণ্ঠশোষ। সেই পিপাসা নিবারণের জন্যই বন্ধু উপদেষ্টা নন্দকুমার প্রদত্ত দেবী কিরীটাশ্বরীর চরণামৃত পানের ব্যবস্থা। সেটাই ছিল মুমূর্ষু মীর জাফরের শেষ জল পান।

আর ওদিকে মীর কাশেমের অবস্থা? পলাশী বিপর্যয়কালে শ্বশুর মীর জাফরের একান্ত অনুগত যে মীর কাশেম কালিন্দী তীরবর্তী স্থান থেকে বন্দী সিরাজকে সেনা পরিবৃত অবস্থায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে এবং তার আগে বেগম লুৎফুন্নিসার কাছ থেকে অশালীনভাবে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ধনরত্নাদি, তার শেষ পরিণাম?

"জন্মভূমি হইতে দূর বিদেশে নির্বাসিত দুর্বহ জীবনভারে পীড়িত মীর কাসিম এখন সকল জ্বালা যন্ত্রণাহারী মৃত্যুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। রক্ত-মাংসের দেহে আর কত সয়? কিছু দিন হইতে তিনি উদরী রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন- এই কালব্যাধি তাহাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে অগ্রসর করিয়া দিল। ১৭৭৭ সালের ৭ই জুন তারিখে শাহজাহানবাদে (দিল্লীতে) তাহার আত্মা জীর্ণ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। ...

বাংলায় মুসলমান রাজত্বের শেষ তেজীয়ান পুরুষ অন্তর্দ্ধান করিলেন। প্রজার স্বার্থ রক্ষা করিতে আত্মসুখের প্রতি যিনি দৃষ্টিপাত মাত্র করেন নাই, সেই প্রজাহিতৈষী নবাব সুদূর প্রবাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। স্বদেশের শিল্পবাণিজ্য সংরক্ষণ করিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া তিনি দেশীয় বণিকগণকে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যবসায়ীর তুল্য অধিকার দিবার মানসে সকলেরই শুল্ক উঠাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। প্রজার মঙ্গল কামনা করিতে গিয়া অবশেষে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীর কাসিম ধন মান সকলই হারাইয়া পথের ভিখারী সাজিলেন। অদৃষ্ট অন্তিমকালেও তাহার প্রতি ক্রুর পরিহাস করিল। শেষ অঙ্গাবরনখানি বিক্রয় করিয়া তাহার শবাস্তরণ ক্রয় করা হইল।" (মীর কাসেমের শেষ জীবন শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র মীর কাসিম গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত পৃঃ ২৪৭-২৪৯)।

নবম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেডের এপিলগ

এপিলগ এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে গ্রন্থাদির উপসংহার বা শেষ পরিচ্ছেদ অভিনয়ান্তে শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করার জন্য কবিতা বা ভাষণ। এখানে আমরা ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত বর্ণনার পরেও কিছু কথা বলার আছে মনে হয়েছে বলেই এই এপিলগের সংযুক্তি। নাট্যশাস্ত্রে এপিলগ এর অর্থ উত্তর রঙ্গ। গ্রীক নাটকের আরম্ভে প্রোলগ বা পূর্ব রঙ্গ এবং শেষে এপিলগ বা উত্তর রঙ্গ থাকত। তারই অনুসরণে ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত এর শেষে সংযুক্ত হল এই এপিলগ। ক্রুসেডের ইতিবৃত্তের সার সংক্ষেপ হিসাবে বলা যায়ঃ ১০৯৫ সালের শেষ দিক থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে ১০৯৬ সালের প্রথম দিকে আরম্ভ করে ১২৯১ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই শ বছর ধরে সংঘটিত আফ্রো এশীয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় খৃস্টানদের যে দানবিক ধ্বংসোল্লাস অন্য কথায় প্রাচ্যের মুসলিমদের প্রতি প্রতীচ্যের খৃস্টানদের সীমাহীন ঘৃণা বিদ্বেষ ও ইসলাম অনুসারীদের নির্মূল করার উদগ্র বাসনার প্রকাশ রূপে যে উন্মুক্ত রক্ত খেলা, তাই ইতিহাসে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত। রোমীয় খৃস্টান ধর্মরাজ্যের অধিকর্তা মহামান্য পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বান ও নির্দেশে সাড়াদানকারী ইউরোপের তদানীন্তন রাজন্যবর্গ কর্তৃক সংঘটিত অর্বাচীন বর্বর অশিক্ষিত (গীবন ব্যবহৃত শব্দমালা) লোকদের বাহিনী দ্বারা আবদ্ধ এই ধর্মযুদ্ধের ছিল তিনটি পর্যায়ঃ প্রথম পর্যায়ের বিস্তৃত কাল ১০৯৬ থেকে আরম্ভ করে ১১৪৪ সাল পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়ের বিস্তৃতিকাল ১১৪৪ থেকে ১১৯৩ সাল পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায় ১১৯৩ থেকে আরম্ভ করে ১২৯১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম পর্যায়ের বিজয়ী পক্ষ ছিল খৃস্টানেরা কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের বিজয়ী পক্ষ ক্রমান্বয়ে ইমামুদ্দীন জঙ্গী, নুরুদ্দীন জঙ্গী ও গাজী সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম মুজাহিদরা। আর তৃতীয় পর্যায়ে নানা জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে খৃস্টান ক্রুসেডাররা বরণ করে পূর্ণ পরাজয়।

বাণিজ্যিক রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি ধর্মীয় মনস্তাত্ত্বিক কারণে সংঘটিত এই প্রায় দুই শ' বছরব্যাপী যে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ১২৯১ সালে তার আপাত ইতি ঘটলেও সেই রক্ত খেলার রেশ চলতে থাকে বহু শতাব্দী ধরে, এমন কি আমাদের মতে আজ পর্যন্তও। ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় আমরা পরবর্তী ক্রুসেড এবং আরও পরবর্তী ক্রুসেড পর্যায়ের কথাও বিবৃত করে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এসেছিলাম। দৈনিক ইনকিলাবে এই প্রবন্ধমালার নিয়মিত প্রকাশনা কালে কতিপয় পাঠকের মুখে প্রশংসাবাণী শুনলেও তারা এতে পণ্ডিতী বিশেষণটা জুড়ে দিয়েছেন। তাতে আমার উপলব্ধি হয়েছে যে, এই বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধগুলোর বক্তব্য বুঝাতে পারলেও তারা হয়তো আরও তেজোদীপ্ত ধরনের রচনাই আশা করেছিলেন। কিন্তু সমগ্র মানবতার মুক্তি দিশারী যে ইসলাম তার একজন অনুসারীর দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত এ প্রবন্ধগুলোর লক্ষ্য ছিল একথা বুঝানো যে আদর্শচ্যুতির মাধ্যমে দুর্বল ও দিকভ্রান্ত হল যখন মুসলিম উম্মা, তখনই অমুসলিমদের দিক থেকে এল ক্রুসেডের বিপর্যয় অর্থাৎ এমনি পরিস্থিতিটাই ছিল ক্রুসেড বিপর্যয়

ঘটাবার উপযুক্ত সময়। ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জেহাদের মাধ্যমে এ বিপর্যয় মুসলিম শক্তি কাটিয়ে উঠেছিল অনেক রক্তের বিনিময়ে। বিজয়ী হয়েছিল মুসলিম শক্তি। কিন্তু তার পরেও বিজয়ী সে শক্তি নতুন দিনের নব জীবনের পথে এগিয়ে গেল না। সে পথে এগিয়ে গেল বিজিত খৃস্টান শক্তি। ফলে, কালের এবং অযোগ্যতার বিধানেই যেন সেদিনের বিজয়ীরা পরবর্তীতে বিজিতের অবস্থান গ্রহণ করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তুর্কী সাম্রাজ্য। ১৯১৭ সালে ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত হল ইসরাইল রাষ্ট্র। বিশ্বযুদ্ধ হল প্রধানত খৃস্টানদের মধ্যে, কিন্তু খৃস্টান সেনাপতিরা বিজয়ের উন্মাদনায় ক্রুসেডের দ্বিতীয় পর্যায়ে জেরুযালেম বিজেতা সুলতান সালাহউদ্দীনের কবরে পদাঘাত করে বলে উঠল-"রে সালাহউদ্দীন! আমরা এসে পড়েছি। আমরা সিরিয়া জয় করেছি। উঠে দেখ।" প্রায় সোয়া ছয়শ' বছর আগে জেরুযালেম হারানোর যে অপমান জ্বালা তার প্রতিশোধ সোয়া ছয় শ' বছর পর। তাও পরম শ্রদ্ধেয় এক গাজীর কবরে পদাঘাত করে? হয়, দুর্বল পতিত অবস্থায় এমনটিই হয়। মুসলিম শক্তি যে তখন দুর্বল পতিত।

অথচ ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে ইসলামের কত না গৌরবময় অবদানের কথা। প্রাচীন গ্রীসীয় সভ্যতার সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার রোমান সাম্রাজ্যের বিষাদময় ধ্বংসের নীচে প্রায় কবরস্থ ও খৃস্টান কুসংস্কারে অন্ধকারে হারিয়ে গেল যখন, তখনই "The message of hope and salvation came from the caraven traders of Arabia who had stood outside the corrupting atmosphere of decomposed Roman world, and prospered by their advantageous position. The "Revolt of Islam" saved humanity. আশা ও মুক্তির বার্তা এল আরবের সেই মরু বাণিজ্যযাত্রীদের কাছ থেকেই যারা অবস্থান করছিল রোমক জগতের গলিত পুতিগন্ধময় দূষিত আবহাওয়ার বাইরে, আর সমৃদ্ধি অর্জন করছিল নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থানের সুযোগে। সেই ইসলামের বিপ্লবই বাঁচিয়ে দিল মানবতাকে।" (The Historical Role of Islam . M. N Roy 1938. PP 12-13)

অতঃপর কালক্রমে আদর্শচ্যুতির পথ পরিক্রমায় ইসলামের গৌরব সূর্য হল অস্তাচলগামী। এবং বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত যখন বিলাসে দুর্বল ও নড়বড়ে আর মুসলিম প্রাচ্যের শাসক শক্তি যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তখনই তার বিরুদ্ধে আরম্ভ হল খৃস্টান প্রতীচ্যের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। তার দীর্ঘকালীন ফলাফলের কথা আগেই বলা হয়েছে। অতঃপর পরবর্তী ক্রুসেড এবং আরও পরবর্তী ক্রুসেড এর কাল পেরিয়ে তুর্কী খেলাফত যখন মৃতপ্রায় তখনই এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সে বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী খেলাফত ছিল পরাজিতদের সঙ্গে জোটবদ্ধ এবং তাই পরাজিত। তার অবস্থা হল আরও পতিত। মুসলিম প্রাচ্যের সেই পতিত অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তার জোয়ার বইয়ে দিয়ে বিশ্বযুদ্ধজয়ীদের নির্দেশে গঠিত করা হল বিভিন্ন রাজ্য-শেখদের বাদশাদের। সেসব রাজ্য নিয়ে রাজনৈতিক খেলার ফলাফল সকলেরই জানা। ক্রমে মুসলিম উম্মা তলিয়ে গেল পতনের আরও অতলে। আজ পর্যন্ত জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকা মুসলিম সমাজ এখনও ক্রুসেড বিপর্যয়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। বরং সে বিপর্যয় আজ সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিচ্ছে বা দিয়েছে। এবং একাধিক শক্তিই এখন মুসলিম উম্মার বিরুদ্ধে এ বিপর্যয়ের সংঘটনকারী।

ক্রুসেডের ইতিবৃত্তে যে কথাটি স্পষ্টভাবে বলা হয়নি তা হচ্ছেঃ বাগাড়ম্বরপূর্ণ অর্থহীন তেজ প্রকাশের মধ্য দিয়ে নয়, ইসলামের মানবতাবাদকে ধ্রুব লক্ষ্যে রেখে তেজকে সংহত করে মুসলিম উম্মাকে আজ ঐক্যবদ্ধভাবে মেধা গুণ সমন্বিত উপযুক্ত শক্তি অর্জন করতে হবে যা দিয়ে অমুসলিমদের সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত ঘৃণা বিদ্বেষপুষ্ট অকল্যাণের সকল শক্তির মোকাবিলা করা যায়। বর্তমান দুনিয়ায় যা ঘটেছে তার থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসেও মানবতার দাবীদার অনেক অমুসলিম শক্তিই আজ ধর্মীয় কারণেই ইসলাম অনুসারীদের উপর খড়্গহস্ত। পরম সাম্প্রদায়িক মগজে তাদের ধূর্ত প্রখর চাণক্য বুদ্ধি, হাতে অর্থবিত্তের থলে, ঝুলিতে পারমাণবিক মারণাস্ত্র এবং মুখে গণতন্ত্রের হরিনাম কীর্তন।

এখানে স্মরণীয় "যে ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্মলাভ করিয়াছে।" (টয়েনবির বক্তব্য)। ক্রুসেডের ফলে প্রাচ্য প্রতীচ্যের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও শিক্ষাবিহীন ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার অনেক উপকরণ প্রবেশ লাভ করে। মুসলমানদের উন্নত মানের কৃষ্টি সংস্কৃতির অবদানের উপর ভিত্তি করেই ইউরোপে এসে যায় রেনেসাঁ বা নব জাগরণ। যে নব জাগরণের জোয়ারে নতুন দিনে প্রবেশ করতে পারত মুসলিম উম্মা সেই জোয়ারে স্নাত হয়ে ক্রুসেড বিজিত ইউরোপে উন্নত জীবনের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ল দিক থেকে দিগন্তরে। পনের শতকের শেষ দিকে তাদের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রাচুর্যপূর্ণ নতুন মহাদেশ আমেরিকা, আবিষ্কৃত হল নতুন নতুন বাণিজ্য পথ। ভাস্কো-ডা-গামার অস্ত্রসজ্জিত বাণিজ্যপোত স্পর্শ করল ভারতবর্ষের মাটি। হিংসায় উন্মত্ত ভাস্কো-ডা-গামা আলমিদা আলবুকার্ক শুধুমাত্র ভারত মহাসাগরে ক্রুসেড বিজিতদের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত করল না, মুসলিম মুঘলদের শক্তিকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে এ উপমহাদেশে "ততদিনে বিজিত ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিকেও" পেয়ে গেল তাদের সাহায্যকারী হিসাবে।

অতঃপর যথাসময়ে ভারতবর্ষের বুক থেকে উৎখাত হল মুসলিম মুঘল শক্তি। ক্রমে ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুপ্রাণিত শিবাজী স্বপ্ন বাস্তবতার পরশ পেল ভারতবর্ষের বুকে। প্রতিষ্ঠিত হল ভারত ও পাকিস্তান। তারপর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। তারও পরে সমাজতান্ত্রিক শক্তি সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয় এবং বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন নববিন্যাস লগ্নের ট্রানজিশন কাল। এই কালে মুসলিম বিশ্বের নানা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে যা যা ঘটেছে, তাতে একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও বিস্মিত ও শঙ্কিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি সেই মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার বর্বরতম সর্বনাশা প্রয়োগ। সে প্রয়োগ এতই স্পষ্ট ও প্রকট যে ঘটনাবলীর স্বরূপ যে কোন বিবেকবান ব্যক্তিকে চরম আতঙ্কের মধ্যে ঠেলে দেবেই। বসনিয়া ফিলিস্তিন কাশ্মীরসহ ভারতের অযোধ্যা, গুজরাট বোম্বাই এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের মাধ্যমে যা সংঘটিত হচ্ছে তাকে নবতম পর্যায়ের ক্রুসেড বলা ছাড়া আর কি বলা যায়? এবং ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধই যদি বলতে হয় তাহলে এ-ও বলতে হবে যে উপরিউক্ত রাষ্ট্রসমূহের মুসলমান অধিবাসীদের উপর প্রধানত ধর্মীয় কারণেই খড়্গহস্ত হয়েছে ইউরোপের খৃস্টান শক্তি, মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদী শক্তি এবং ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি। এমনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে স্বাভাবিক প্রশ্নঃ বর্তমানের এই অপ্রত্যাশিত বাস্তবতা বিশ্ব ব্যবস্থাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

আমাদের এই এপিলগে এই উভয়বিধ সম্ভাবনা নিয়েই কিছু বলার প্রয়াস পাব। এখানে এ-ও উল্লেখ্য যে সকল শক্তি বেষ্টনীতেই তমসাবিরোধী আলোকপ্রত্যাশী মানুষের খুব একটা অভাব নেই এবং এজন্যই আমরা আশাবাদী। পরবর্তী আলোচনায় বাস্তবতার কারণেই বাংলাদেশ তথা ভারতের ইতিহাসভুক্ত দৃষ্টান্তই অগ্রাধিকার পাবে।

২৮মে, ১৯৯৩, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ সন, শুক্রবার। দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত খবরঃ "ইউরোপের বুকে ইসলামী রাষ্ট্র সহ্য করা হবে না"- জন মেজর।

"ইউরোপের বুকে সম্ভাব্য কোনো ইসলামী রাষ্ট্র সহ্য করা হবে না। তাই বসনিয়া হারজেগোভিনা খণ্ড বিখণ্ড না হওয়া পর্যন্ত এবং ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে দেশটি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সে দেশের মুসলমানদের কোনো রকম সাহায্য প্রদান না করার নীতি বৃটেন অনুসরণ করে যাবে।

গত ২ মে বৃটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দফতরের প্রতিমন্ত্রী ডগলাস হগকে লেখা এক পত্রে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর একথা বলেন ।

তিনি বলেন, বসনিয়ার মুসলমানদেরকে এখন কিংবা ভবিষ্যতে সমরাস্ত্র দিয়ে অস্ত্র সজ্জিত কিংবা প্রশিক্ষণ প্রদান করতে বৃটেন কখনই রাজি হবে না। বৃটেন সে অঞ্চলে জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও কার্যকর করতে সাহায্য প্রদান অব্যাহত রাখবে। তবে তিনি বলেন, বৃটেন জানে গ্রীস, রাশিয়া ও বুলগেরিয়া সার্বীয়দেরকে অস্ত্র ও ট্রেনিং দিচ্ছে; জার্মানী অষ্ট্রিয়া স্লোভেনিয়া ও এমনকি ভ্যাটিকানও সে অঞ্চলে ক্রোশিয়া ও বসনিয়ার ক্রোট বাহিনীকে অনুরূপ সাহায্য দিচ্ছে। এ সত্ত্বেও বৃটেনকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে কোনো ইসলামী দেশ কিংবা গ্রুপ বসনিয়ার মুসলমানদেরকে এ ধরনের সাহায্য প্রদানের প্রচেষ্টায় সফল না হয়। এটা পশ্চিমাদের জন্য অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

জন মেজর তার পত্রে বলেন, সাবেক সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের ট্রেনিং প্রদান ও অস্ত্র সজ্জিত করা ভুল হয়েছে। এর ফলে সেখানে ইসলামী মুজাহিদ বাহিনী গড়ে উঠেছে। বসনিয়া-হারজেগোভিনার মুসলিম জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে সেই একই ভুল করা যায় না। এই ভুল করা হলে ইউরোপীয় সম্প্রদায় ও উত্তর আমেরিকায় বহিরাগত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভবিষ্যতে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব সম্ভাবনা ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে দেখা দেয়ার আশঙ্কার প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা দেশগুলোতে বিশেষ করে বৃটেনে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি পশ্চিমা নিরাপত্তা সার্ভিসের বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করতে হবে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, টেকসই রাষ্ট্র হিসাবে বসনিয়া-হারজেগোভিনার অস্তিত্ব লোপ না পাওয়া পর্যন্ত এবং তার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ উৎখাত না করা পর্যন্ত ভ্যান্সওয়েন শান্তি আলোচনার অভিনয় চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

এই নীতিকে কঠিন নীতি বলে আখ্যায়িত করে জন মেজর বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারকদের এবং সশস্ত্র বাহিনীকে অনুধাবন করতে চাপ দেন যে, এই নীতিই হচ্ছে সত্যিকার নীতি এবং ভবিষ্যতের স্থিতিশীল ইউরোপের স্বার্থে এই নীতি অপরিহার্য। ভবিষ্যত ইউরোপের মূল্যমান পদ্ধতি হবে ও অবশ্যই হতে হবে খৃস্টান সভ্যতাভিত্তিক

এবং নৈতিকতা ভিত্তিক। জন মেজর বলেন, তার এই অভিমত প্রতিটি ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার দেশেরও দৃঢ় মত। তাই পশ্চিমা দেশগুলো বসনিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য সেখানে হস্তক্ষেপ করবে না কিংবা তাদের উপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পদক্ষেপ নেবে না।

তিনি বলেন, পাশ্চাত্যের মুসলমানদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে দিতে হবে যে, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় তারা বিশ্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মতামতের বিরোধিতা করতে পারে না। তাদেরকে আরো অনুধাবন করতে দিতে হবে যে, বসনিয়া-হারজেগোভিনার মুসলমানদের ধ্বংস করে দেয়ার প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় বিশ্বের তথাকথিত মুসলিম সরকারগুলো নিষ্ক্রিয় রয়েছে এবং ১৫-১-৯৩ তারিখে ওআইসি সম্মেলন নাগাদ একটা কিছু করার তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিমের মুসলমানদেরকে আরো বুঝতে হবে যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যদি মুসলমানদের রক্ষা না করে তা হলে ইসলামী দেশগুলো কিছুই করতে পারে না। এসব দেশ পশ্চিমা দেশগুলোর বিরোধিতা করায় সম্পূর্ণ শক্তিহীন, কারণ পশ্চিমা দেশগুলোই সেসব ইসলামী দেশের সরকারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু কেন ইউরোপের বুকে ইসলামী রাষ্ট্র সহ্য করা হবে না? সহ্য করবে না ইউরোপ আমেরিকার খৃস্টজগৎ। এর উত্তরের খোজে স্মৃতির বলাকা আবার উড়ে চলল ক্রুসেড পূর্ব প্রাচ্য প্রতীচ্যে।

প্রথমেই মনে পড়ে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা। সুপ্রাচীন কাল থেকেই আরবদের ব্যবসা বাণিজ্যের কথা সকলের জানা। ইসলাম পূর্ব কালে মক্কা ছিল বহির্বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। উত্তর ও দক্ষিণ আরবের বাণিজ্য পথে অবস্থিত মক্কায় হত সিরিয়া পারশ্য মিশর ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক লেনদেন। তদুপরি, ভারতবর্ষ ছিল প্রতীচ্যের জন্য এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। "কোন পুরাকালে ভারতবর্ষ এই রূপে শিল্পদ্রব্য বিনিময়ে বিবিধ দূরদেশ হইতে অর্থলাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিহাসে তাহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন প্রাচ্যের তুলনায় অধিকাংশ প্রতীচ্য জনপদ নিরক্ষর জাতির আবাসভূমি বলিয়াই পরিচিত ছিল"। (ফিরিঙ্গি বণিক, শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৬১ সন, পৃঃ ১)

সেই রোমান যুগের কথা। হিন্দুস্থানে তখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমানা পাঞ্জাবের প্রান্ত থেকে রোমান রাজ্য ছয় সাত শ' মাইলের মত। গুপ্ত রাজাদের সঙ্গে রোমান রাজাদের সৌহার্দেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্তদের উজ্জয়িনী নগরী তখন বহির্বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। গুপ্ত রাজধানীর সঙ্গে রোমান রাজধানীর যোগাযোগ তখন এক স্বাভাবিক ব্যাপার। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষের গুপ্ত ও আগেকার সম্রাটগণ ছিলেন এই উপমহাদেশে বহিরাগত আর্যদেরই সম্পর্কিত উত্তর পুরুষ। এমন কি, গুপ্তদের আগে শুঙ্গ গ্রীক শক হুন কুষাণগণ অভিযানে এসে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেছে এবং কালক্রমে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। তারা সবাই আর্যদেরই জনগোষ্ঠীভুক্ত মধ্যএশিয়ার লোক। গুপ্তরাও তাই। সুতরাং গুপ্তদের তথা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে গ্রীক রোমানদের সম্পর্ক থাকার ব্যাপারটা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষের সঙ্গে বিশেষ করে দক্ষিণাত্যের সঙ্গে রোমানদের যে শুধুমাত্র বাণিজ্য সম্পর্কই ছিল তা নয়, দাক্ষিণাত্যের পান্ডিয়ান রাজাদের দেহরক্ষী হিসাবে এবং প্রাসাদ দ্বারের প্রহরী হিসাবে নিয়োজিত ছিল রোমান সৈন্যদের থেকে পাঠানো লোকেরা। আর ইংরেজ ঐতিহাসিক মাইকেল এওয়ার্ডিসের মতে আর্যদের অন্তর্ভুক্ত পান্ডিয়ান রাজাদের এই রোমান প্রীতিকে কটাক্ষ করে আর্যদের দ্বারা পর্যুদস্ত সিন্ধু সভ্যতার অধিকারী তামিল সাহিত্যিকরা ওই রোমান দেহরক্ষী ও প্রহরীদের অভিহিত করেছেন ম্লেচ্ছ (বিদেশী) বলে যাদের পরিধানে থাকত লম্বা কোট এবং যাদের অন্তর ছিল খুনীর অন্তর। এখানে স্মরণীয় যে, দাক্ষিণাত্যে আর্যরা কখনো তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি পুরাপুরি চাপিয়ে দিতে পারে নি।

প্রতীচ্যে রোমান প্রাধান্যের অবসানে সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এক বিপজ্জনক সংকটের সম্মুখীন হয়। ইউরোপে বিশেষ করে পশ্চিমা ইউরোপে চলছে তখন নতুন সমাজ বিন্যাস। রোমান শক্তির পতনের জনসাধারণের মাঝে এসেছে এক বিরাট শূন্যতা। রোমান প্রভাবিত জীবন ধারণাও গতপ্রায় এবং সংস্কৃতিবিহীন সামন্ততন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আর তারই পাশাপাশি খৃস্টীয় যাজকতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন খৃস্টীয় যাজকরা মানুষের অন্ধ বিশ্বাসকে উসকে দিয়ে প্রচার করছে যে, ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে অতিরিক্ত সুদ খাওয়ারই নামান্তর। ফলে, একেবারে নিষিদ্ধ না হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করা হল। এই অবস্থায় পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজ পুরাপুরি কৃষিভিত্তিক হয়ে দাঁড়াল। এমনি অবস্থায় এল দুর্ধর্ষ বর্বরদের আক্রমণাভিযান। একেবারেই পর্যুদস্ত হয়ে গেল পশ্চিম ইউরোপ। তার মাঝ থেকে সামন্ততন্ত্রের পরিণতি হিসাবে ক্রমে গড়ে উঠল বিভিন্ন দেশ ইংল্যাণ্ড পর্তুগাল ফ্রান্স জার্মানী ইত্যাদি। ক্রমে এসে গেল খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দী।

সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্যায়। এই যুগে ভূমধ্যসাগরকেন্দ্রিক বাণিজ্য প্রাধান্য এসে গেল আরব মুসলমানদের হাতে। আরবের মুসলিম সাম্রাজ্য তখন পারশ্য বাইজানটাইন সিরিয়া জেরুযালেমসহ জাযিরা ও উত্তর আফ্রিকাকে অন্তর্ভুক্ত করে ইউরোপের প্রান্তভূমি স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত। মুসলিমদের এই বিজয়ের ফলাফল হিসাবে যেমন রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক জীবনে, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অনুভূত হল। প্রাচ্য-প্রতীচ্য বাণিজ্যের জন্য যে তিনটি প্রধান পথ ছিল, তার সব ক'টি চলে গেল মুসলিম শক্তির নিয়ন্ত্রণে। তাতে ইউরোপীয়দের সামগ্রিক জীবনে এল মহাবিপর্যয়। তাই অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে খৃস্টান ইউরোপের চোখে মুসলিম শক্তি প্রতিভাত হল এক মহাশত্রু হিসাবে। এই শত্রুতা ধারণার পথ ধরে এল ক্রুসেড। প্রথমে বিজয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত হেরেই গেল খৃস্টশক্তি।

অতপর এল ইউরোপীয় রেনেসাঁ, জীবনের এক নব জাগরণ। সেই জাগরণকে কাজে লাগিয়ে ইউরোপ হল আধুনিক ইউরোপ, যার হাতে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হল প্রাচ্যের মুসলিম শক্তি। তারপরও সময় বয়ে যেতে লাগল। হালে প্রাচ্যের মুসলিমরা আবার মাথা তুলতে চাইছে যখন, মাথা তুলতে চাইছে যখন পাশ্চাত্যের বিচ্ছিন্ন জনপদসমূহ তখনই খৃস্টান শক্তির প্রতিভু হিসাবে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের এই আস্ফালন।

যুগে যুগে রাজা গণেশ

বাংলাদেশের মধ্য যুগের ইতিহাসে যাদের নাম ভাস্বর অক্ষরে লেখা রয়েছে রাজা গণেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। একক কৃতিত্বের দিক দিয়ে গণেশের সঙ্গে খুব কম লোকেরই তুলনা চলতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ছিল মুসলমানদের অধিকারে। এর মধ্যে কোন কোন সময় অঞ্চল বিশেষে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু সমগ্র বাংলার সিংহাসন অধিকার এই একটি মাত্র হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গণেশ বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মত আবির্ভূত হয়ে অসাধ্যসাধন করেছিলেন, প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির বাধাকে জয় করে বাংলায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গণেশের কীর্তির অসামান্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই।

অবশ্য এই হিন্দু অভ্যুদয় বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। গণেশের বংশধররা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা বাংলার সিংহাসন বেশিদিন নিজেদের অধিকারে রাখতে পারেন নি। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী হলেও গণেশ ও তার বংশের রাজত্ব বাংলার ইতিহাসের এক অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়। (বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল, শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০ পৃঃ ৯৮)

এই অসাধ্যসাধনকারী ও অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী গণেশজীকে ফার্সী গ্রন্থে কানস ঝনিস কানসি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারও কারও মতে তার মূল নাম ছিল কংস। তবে তিনি গণেশ নামেই সমধিক পরিচিত। দুখানি বাংলা বই (অদ্বৈত প্রকাশ ও প্রেম বিলাশ) এবং একখানি সংস্কৃত বইয়ে (বাল্যলীলা সূত্র) রাজা গণেশ নামের উল্লেখ রয়েছে। তিনখানি বইতেই বলা হয়েছে 'রাজা গণেশ' অদ্বৈতের পূর্বপুরুষ নরসিংহ নাড়িয়ালকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেছিলেন। অদ্বৈত প্রকাশ অনুযায়ীঃ

সেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভুবন

সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ ॥

যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রী গণেশ রাজা

গৌড়ের বাদশাহ মারি গৌড়ে হৈল রাজা ॥

গৌড়ের বাদশাহ মারি শ্রী গণেশ কি করে রাজা হলেন, তার বিবরণী উদ্ধৃত করছি ঐতিহাসিক ডক্টর আবদুল করিম রচিত বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল গ্রন্থ থেকেঃ "ইলিয়াস শাহী সুলতানদের সময় হইতে হিন্দুরা রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। ইলিয়াস শাহী সুলতানরা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দিল্লীর প্রবল সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, এই সময়ে তাঁহারা হিন্দুদের সহযোগিতা গ্রহণ করে এবং হিন্দু জমিদার ও সমর নায়কেরা বাংলার সুলতানদের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত দান করেন। ইহার প্রতিদানে ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। পরে যখন সুলতানদের দরবারে আমীর অমাত্যদের মধ্যে দলীয় রাজনীতি আরম্ভ হয় স্বভাবতই হিন্দুরাও এই দলীয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। .... আমরা দেখিতে পাই যে, গণেশের চক্রান্তে আজম শাহ নিজেই নিহত হন। আজম শাহের

হত্যার পরে রাজনৈতিক অবস্থা আরোও ঘোলা হইয়া যায়। আজম শাহের ছেলে সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তিনিও বেশিদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। .... হয়ত তিনিও গণেশকে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু গণেশের চাতুরীর সঙ্গে তিনি হারিয়া গেলেন এবং পিতার মত নিহত হলেন। এইবারে রাজা হইলেন নিত সুলতানের ক্রীতদাস বায়েজীদ শাহ। ... তিনি সিংহাসনে ঠিকই বসিলেন কিন্তু দেখা গেল সমস্ত ক্ষমতা গণেশের হাতে। তিনি সিংহাসন এবং ক্ষমতা উভয়ই দাবী করিলেন, ফলে গণেশ তাহাকেও সরাইয়া ফেলিলেন। ... রাজবংশের আর কেহই যখন অবশিষ্ট রহিল না, তখন গণেশ নিজ মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন এবং নিজেই সিংহাসনে বসিলেন"। (পৃঃ ২৮৩-২৮৫)। এহেন অসাধ্য সাধনকারী শ্রী গণেশ রাজা দুই কিস্তিতে প্রায় দুই বছর বাংলার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; প্রথম কিস্তিতে ছয় মাসের মত এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে তের চৌদ্দ মাস। এই স্বল্পকালীন রাজা হিসাবে তিনি বাংলায় হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে যা যা করেছিলেন শ্রী মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে তার কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ঃ

(এক) "সিংহাসনে বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান দরবেশদের সঙ্গে তার বিরোধ বেধে ওঠে। গণেশ তখন অনেক মুসলমান দরবেশকে বধ করেন। .... পাণ্ডুয়ার অন্যান্য দরবেশ এবং উলেমাকে তার আদেশে জলে ডুবিয়ে বধ করা হয়"।

(দুই) হিন্দুদের দ্বারা প্রণীত গ্রন্থ সঙ্গীত শিরোমণিতে রাজা গণেশকে আগুনের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে ঃ "এই আগুনে মুসলমানেরা পতঙ্গের মত পুড়ে মরেছিল"।

(তিন) শ্রী গণেশ রাজার অত্যাচার সম্বন্ধে পাণ্ডুয়া অঞ্চলে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। "প্রবাদটি এই যে, রাজা গণেশ ক্ষমতা লাভের পরে আদিনা মসজিদকে তার কাছারী বাড়ীতে পরিণত করেছিলেন। .... এই প্রবাদ সত্য হওয়া অসম্ভব নয়"।

এ সম্বন্ধে এইচ এস স্টেপলটন লিখেছিলেন, "It may also be added with reference to the supposed connection of Raja Kans with Eklakhi building that local tradition states that when the Raja objained supreme power over Bengal after the death of the short lived successors of Ghiasuddin, out of contempt of Muhammadanism he used the adjacent adina mosque as his Kacheri (Magistrate's Court or Zomindari Office). রাজা কংসের সঙ্গে একলাখি ভবনের কথিত সম্পর্কের সূত্র টেনে একথাও বলা যায় যে, রাজা যখন গিয়াসুদ্দিনের স্বল্পস্থায়ী উত্তরাধিকারীদের মৃত্যুর পর বাংলার ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন, তখন মুহাম্মদী ধর্মের প্রতি ঘৃণাবশতঃ তিনি পার্শ্ববর্তী আদিনা মসজিদটিকে তার কাছারী বাড়ী হিসাবে ব্যবহার করেন"। (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 126, f.n)

(চার) মুঘল দরবারের সভাসদ মুল্লা তকিয়ার লেখা একটি বয়াজ সংগ্রহ অনুসারেঃ "যখন হিন্দু জমিদার কানস সমগ্র বাংলা প্রদেশের উপর আধিপত্য অর্জন করলেন, তিনি মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প করলেন এবং তার রাজ্য থেকে ইসলামের মুলোচ্ছেদ করাই হয়ে দাঁড়ালো তার লক্ষ্য। এই সময়ে ত্রিহুতের জমিদার শিও সিংহ (শিব সিংহ) তার পিতা ত্রিহুতের রাজা দেব সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে

এবং রাজা কানসের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজে ত্রিহুত প্রদেশের স্বাধীন রাজা হয়ে বসেছিলেন। নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে তিনি রাজা কানসের প্ররোচনায় তার রাজ্যের মুসলমানদের উপরে লুটপাট চালাতে লাগলেন, দ্বারভাঙ্গার অধিকাংশ ধর্মপ্রচারক ও ইসলামের নায়কদের শহীদির পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করালেন এবং পবিত্রাত্মা মখদুম শাহ সুলতান হোসেনকে আঘাতের পরিকল্পনা করলেন....”।

এমনি পরিস্থিতিতে বাংলার স্বনামখ্যাত সূফী হযরত নূর কুতবে আলমের পত্র মারফত কাফের দমনের অনুরোধ পেয়ে জৌনপুরের স্বাধীন সুলতান ইবরাহীম শর্কী বাংলার পথে যুদ্ধাভিযানে রওনা দেন। পথে রাজা শিব সিংহ সুলতান বাহিনীর গতিরোধ করে। কিন্তু পরাজিত ও বন্দী হয়ে সুলতানের গতিপথ পরিস্কার করে দেয়। অতঃপর রাজা গণেশেরও ছয় মাসের রাজত্বের অবসান হয়। তার পরেও আছে রাজা গণেশের অত্যাচার কাহিনী যা আমাদের বক্ষ্যমান আলোচনায় বিবেচ্য নয়।

বিবেচ্য হল শ্রী গণেশ রাজার চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও ধূর্ত চাণক্য নীতির অনুসরণে মৃত্যুযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিংহাসন লাভের লক্ষ্য নির্ণয় এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার গৃহীত কর্মপন্থার উপর আলোকপাত। রাজা গণেশ এই মৃত্যুযজ্ঞ আরম্ভ করেন ১৪১০/১১ সালে, সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আযম শাহকে চক্রান্তের মাধ্যমে হত্যা করিয়ে। তারপর এক বছরের মাথায় ক্রীতদাস বায়েজীদের মাধ্যমে হত্যা করান আযম শাহর পুত্র সুলতান সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহকে। অতপর রাজা গণেশেরই চক্রান্তে ক্রীতদাস সুলতান বায়েজীদ শাহর মৃত্যু এবং রাজা শ্রী গণেশের সিংহাসনারোহণ। এর মধ্যে বায়েজীদ শাহর পুত্র আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ সিংহাসন রক্ষার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অর্থাৎ দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তিন/চার জন সুলতানকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে রাজা গণেশ বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

তারপর দেশ জুড়ে চলল বাংলার মুসলমান সমাজের চালক ও পথ নির্দেশক সুফী দরবেশ এবং উলেমা-মাশায়েখদের নির্মম নিধনযজ্ঞ। এ যেন ব্রাহ্মণ্যবাদী সেই পরশুরাম কর্তৃক ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করার কঠোর সংকল্প। শুধু মুলক এ বাঙ্গালায়ই নয়, পার্শ্ববর্তী ত্রিহুত রাজ শিব সিংহকেও প্ররোচিত করে সেখানেও মুসলিম নিধনযজ্ঞের ব্যবস্থা করেন রাজা গণেশ। ১৪১০/১১ সাল থেকে ১৪১৮ সাল। এর মধ্যে মুলক এ বাঙ্গালার শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে কত না প্রচণ্ড পাশবিক উত্থান পতন। জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীর যুদ্ধাভিযানের ফলে গণেশের সিংহাসনচ্যুতি, তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র যদুসেনের ধর্মান্তর, সুলতান শর্কীর চলে যাওয়ায় পুত্রকে সরিয়ে আবার গণেশের সিংহাসন অধিকার, আদিনা মসজিদকে কাছারী বাড়িতে পরিণত করা এবং অবশেষে ১৩/১৪ মাস রাজত্বের পর জালালুদ্দীনরূপী যদু কর্তৃক শ্রী গণেশ রাজার বিনাশ সাধন।

১২০৩/০৪ সালে ইখতিয়ার উদ-দীন-মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের হাতে ঘটেছিল সেনদের নদীয়ার পতন। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম লাখনৌত রাজ্য। ক্রমে ক্রমে এই জনপদ থেকে মুছে গিয়েছিল অত্যাচারী ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন শাসনের সকল চিহ্ন। আর তার দুশ বছরের কিছু বেশি সময় পর মুলক এ বাঙ্গালায় আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল হিংসায় উন্মুক্ত সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রত্যাশা। রাজা গণেশ ছিলেন সে পত্যাশারই মূর্ত প্রতীক।

কুশাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে আপামর জনসাধারণের কল্যাণ লক্ষ্যে সুশাসনের বাতাস বইয়ে দেবার ব্রত নিয়ে নেয়, মানুষের কল্যাণভিলাষী কোন ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে নয়, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিজাত এক দানবীয় প্রত্যাশা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সংঘটিত হয়েছিল এই নিধনযজ্ঞ যার হোতা ছিলেন রাজা গণেশ। বিবেচ্য নয় মূলক এ বাঙ্গালার আপামর জনসাধারণের কল্যাণ অকল্যাণ একমাত্র বিবেচ্য মুলক এ বাঙ্গালার বুক থেকে মুসলিম শাসনের অবসান এবং তারই সঙ্গে অবসান মুসলমান সমাজের চালক ও পথ নির্দেশকদেরও, এক কথায় ইসলামেরও। এ যেন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর হাতে সেই যেন রাজ্যের পতনের প্রতিশোধ।

গণেশগণের কর্মকাণ্ড

১৪১২ সাল থেকে ১৪১৮ সালের মধ্যে মুলক এ বাঙ্গালার সবচেয়ে কীর্তিমান পুরুষ ও এদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের পুনঃপ্রবর্তন প্রয়াসী রাজা গণেশের কীর্তিকথার একটা রূপরেখা আগেই দেওয়া হয়েছে। এই অসাধ্যসাধনকারী ও অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী রাজা গণেশের মত আরও আরও গণেশ তাদের কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস কালের মোড়ে মোড়ে, উপরিউক্ত কালটির আগেও, পরেও। আগের কতিপয় গণেশজীর উল্লেখ করেছেন শ্রী গৌতম রায় তার ১৯৯৩ সালের ৩ জানুয়ারীর দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত “হিন্দুত্ববাদী অজস্র মিথ্যা কথা বলেছেন”, শিরোনামের এক প্রবন্ধে। এই সুলিখিত প্রবন্ধে শ্রী রায় অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারীদের উকিলী যুক্তি হিসাবে উপস্থাপিত Collective racial memory কে একটি নিপাট বুজরুকি বলে মত প্রকাশ করেছেন। বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারীদের উপস্থাপিত যুক্তিটি হচ্ছে .... হিন্দুদের Collective racial memory-র মধ্যে মধ্যযুগে মুসলিম শাসকের হাতে অসংখ্য মন্দির ধ্বংসের স্মৃতি লুকিয়ে ছিল এবং সেই স্মৃতিপ্রসূত ক্ষোভই করসেবকদের এই ঐতিহাসিক প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করেছে”।

শ্রী রায় প্রবন্ধে তথ্যপূর্ণ যুক্তিসহ প্রমাণ করেছেন যে, হিন্দুদের Racial memory বলে কোন কিছু থাকার কথা নয়; কারণ তার কথায় “হিন্দুরা কোন Race নয়”। ভারতের কিরাত (মঙ্গোলয়েড) ও নিষাদ (অষ্ট্রেলয়েড) ভূমিপুত্রদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড়, নর্ডিক, আলপিনয়েড ও আর্মেনয়েডদের দ্রবণে উদ্ভুত এক মিশ্র জাতি। যে অর্থে ইহুদীরা একটি (জাতি) সে অর্থে হিন্দু কোনও জাতি নয়। জাতি হিসাবে হিন্দুরা যেমন অবিভাজ্য অখণ্ড নয়, হিন্দুর ধর্মও তেমনই কোন সুনির্দিষ্ট সুসংজ্ঞায়িত ধর্ম নয়। .... আর এ জন্যই ইহুদীদের মতো সেমিটিক জাতির মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত নিগ্রহের যে পুঞ্জীভূত স্মৃতি যুগান্তরে সযত্নে লালিত সঞ্চিত থাকে, হিন্দু মানসে তার অন্বেষণ নিস্ফল ও অনৈতিহাসিক”।

এখানে উল্লেখ্য যে, সিন্ধু শব্দগুচ্ছের সিন্ধু সূত্রে উদ্ভাবিত জনপদসূচক শব্দ হিন্দ এর অধিবাসীদেরই হিন্দু বলা হত। কাল পেরিয়ে জাতিবাচক শব্দ হিসাবে হিন্দু আজও প্রচলিত। তত্ত্বীয়ভাবে হিন্দু শব্দ দ্বারা চিহ্নিত কোন জাতি বা ধর্ম না থাকলেই বা কি, বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে বৈদিক যুগের পর ধারণাগতভাবেই এতদিন ধরে ভারতবর্ষে তথাকথিত হিন্দু নামের জাতি বা ধর্ম অস্তিত্ববান রয়েছে। আর সে জাতির

বা ধর্মের সর্বময় কর্তৃত্ব যাদের অধিকারে বরাবর ন্যস্ত, তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী বলেই অভিহিত। নর্ডিক আর্যদের বর্ণপ্রথার ফলশ্রুতি এই ব্রাহ্মণ্যবাদিতা। তারপর কালপ্রবাহে ব্রাহ্মণ্য শক্তির উত্থান পতনের প্রক্রিয়ায় সমাজ ও ধর্ম বিধানে ঘটেছে পরিবর্তন, বলা যায় প্রয়োজনের চাপে অনেক সংশোধনী। গ্রহণ বর্জনের প্রক্রিয়ায় একটা ঢিলেঢালা রূপ নিয়ে হিন্দু জাতি বর্তমান পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। সে জাতির এক দেহে পাঠান মুঘলেরা সত্যকার অর্থে লীন হয়ে না গেলেও শক হুন ও অন্যান্যরা অবশ্যই লীন হয়ে গেছে। এবং নৃতাত্ত্বিকভাবে না হলেও সাধারণ ধারণা মতে সেই হিন্দু জাতির হয়ে বরাবরই কর্তৃত্ব করে এসেছেন নর্ডিক আর্য জাতিসম্ভূত সেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরাই। আজও।

শ্রী রায় আরো বলেছেনঃ 'আর যদি ধর্মীয় নিগ্রহ বা মন্দির ধ্বংসের ঐতিহাসিক স্মৃতির কথাই ওঠে, তাহলে শুধু গজনির সুলতান মামুদ কেন, সেই স্মৃতিপটে আরও অনেক মুখ ও ঘটনা ভেসে ওঠা উচিত। ভেসে ওঠা উচিত কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে বর্ণিত কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হর্ষের কথা, একাদশ শতকে যিনি দেবোৎপাটন নায়ক নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীই নিয়োগ করেছিলেন, যাদের সরকারী কর্তব্যই ছিল মন্দির ধ্বংস ও লুঠ করে তার ধনরত্ন হাতিয়ে নিয়ে দেউলিয়া রাজকোষ পূর্ণ করা, ঠিক মামুদ যা করেছিলেন। দ্বাদশ শতকে পারমারের হিন্দু রাজা সুভাত বর্মন গুজরাত আক্রমণ করে দাভয় ও কাম্বে এলাকার অসংখ্য জৈন মন্দির ধ্বংস করেন। শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্র নৃশংসভাবে হত্যা করেন বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে, গৌড়রাজ শশাঙ্ক ধ্বংস করেন বৌদ্ধ স্তুপ, চৈত্য ও বিহার। আর খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে গোটা তথাকথিত হিন্দুযুগ ধরে হিন্দু শাসকরা উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতে এবং বীরশৈব ও লিঙ্গায়েতরা দক্ষিণ ভারতে অগণিত বৌদ্ধ ও জৈন মঠ মন্দির ধ্বংস করে গেছেন। গজনির বিধর্মী সুলতান যত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন তার চেয়ে অনেক বেশি বিষ্ণুমন্দির স্বধর্মী শৈবরা ধ্বংস করেছে"।

উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যে শ্রী রায় নিগ্রহের হোতা বলে যাদের চিহ্নিত করেছেন, সুলতান মাহমুদ ছাড়া তাদের সবাইকে বোধ হয় হিন্দু জাতির ব্রাহ্মণ্যবাদী বলা চলে। এ তালিকায় সম্রাট অশোকের নামটিও যোগ করা চলে যিনি খৃস্টপূর্ব ২৬১ অব্দে কলিঙ্গ বিজয়ের অভিযানে "In his capaign, Asoka tellss us , 125.000 people were taken captive and 100,000 killed; even Brahmins and ascetics were murdered". (A History of India, michael Edwardes, p. 40)

লক্ষ লোকের হত্যাকারী এই সম্রাট অশোক তার জন্য অভিহিত হন চন্ডাশোক বলে। পরবর্তীতে অবিশ্যি তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ ত্যাগ করে বৌদ্ধবাদ গ্রহণ করে অহিংসা পালনে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

উদ্দেশ্যের নিরিখে এই দানবিক নিগ্রহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক. ব্যক্তি অভিলাষভিত্তিক নিগ্রহ। দুই. জাতি বা গোষ্ঠী অভিলাষভিত্তিক নিগ্রহ। ব্যক্তি অভিলাষভিত্তিক নিগ্রহে নিহিত থাকে নিগ্রহকারীর ব্যক্তিস্বার্থে অন্য রাজ্যে ধনরত্ন লুন্ঠন বা সেখানে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অদম্য ইচ্ছা। কিন্তু জাতি বা গোষ্ঠী অভিলাষভিত্তিক নিগ্রহে নিহিত থাকে নিজ জাতি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে অন্য জাতি বা গোষ্ঠীর ধন জন মান ধ্বংস করে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনা। প্রথমোক্ত নিগ্রহকারী হতে পারে

মানবতাবর্জিত যে কোন ধর্মবর্ণের অভিযানকারী, আর দ্বিতীয়োক্ত নিগ্রহকারী নিশ্চিতভাবেই মানবতা ধ্বংসকারী সৃষ্টিবিরোধী এক ফ্র্যাঙ্কেনস্টেইন। মধ্যযুগে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের ক্রিয়াকাণ্ডে আমরা সেই ফ্র্যাঙ্কনস্টেইনের সাক্ষাৎ পাই, আধুনিক বিশ্বে সেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টেইনের সাক্ষাৎ পাই জার্মান বীর হিটলার ও তার সহযোগিদের মধ্যে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারীদের মধ্যে থেকে সেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টেইনরা কি আবার দেখা দিচ্ছে? দেখা দিচ্ছে কি সার্বীয়দের মধ্য থেকে, ইসরাইলীয়দের মধ্য থেকে? এদের মাঝ থেকে সেই রাজা গণেশ কি পরিচালনা করছে মানবতাবিরোধী ক্রিয়াকাণ্ড? নইলে বসনিয়ায় ফিলিস্তিনে ভারতে কি করে সংঘটিত হচ্ছে একই ধরনের মানবতাবিরোধী সৃষ্টিবিনাশী নিপীড়ন নির্যাতন? একই পদ্ধতিতে একই স্টাইলে একই ভয়ঙ্করতায় আর সদৃশ পরিকল্পনায়?

সাধারণ বিবেচনায়ও মধ্যযুগ তার বিভিন্ন জাতি ধর্মের সমস্ত অমানবিকতা আর ত্রুটি বিচ্যুতির অবসান ঘটিয়ে আধুনিক যুগ নির্মাণ করার কথা। কিন্তু এই অশনি সংকেতময় পরিকল্পনায় কি তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়? যায় না। বরং এই ইঙ্গিতই আজ স্পষ্ট যে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতিসম্পন্ন এই আধুনিক যুগের মানবতাবিহীন চোরাবালির নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে মধ্যযুগীয় ক্রুসেডের সেই উন্মুক্ত ধারা, যে ধারা আজ চরম বেগবতী হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে নানা স্থানে। এই আত্মপ্রকাশ ভয়ঙ্কর, এই আত্মপ্রকাশ মানবতাবিরোধী, সৃষ্টি বিরোধী। এই আত্মপ্রকাশ থেকে প্রতীয়মান হয় ওরা চাইছে প্রতিশোধ। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ। কিন্তু কিসের প্রতিশোধ?

প্রাথমিক যুগ পেরিয়ে সেই মধ্যযুগের কথা। সভ্যতা ও সম্পদদীপ্ত মুসলিম প্রাচ্যের তুলনায় অনেক অনুন্নত অশিক্ষিত দরিদ্র খৃস্টান প্রতীচ্যের আরম্ভ করা যে ক্রুসেড প্রায় দু'শ' বছরের রক্ত হোলির মধ্য দিয়ে ১২৯১ সালে ঘটে তার আপাত সমাপ্তি। মুসলিম শক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় খৃস্টান শক্তি। তারপরেও নব নব পর্যায়ের ক্রুসেড চলতে থাকে ১৩৯৬ সালে সংঘটিত নাইকোপোলিসের যুদ্ধ পর্যন্ত। তাতেও বিজয় করায়ত্ত হল না খৃস্টান শক্তির। অতপর কালক্রমে প্রতীচ্যে আসে রেনেসাঁ নবজীবনের আশায় উদ্দীপ্ত এক নবজাগরণ। সেখানে আরম্ভ হয় জীবনকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার জন্য দুর্বার সব অভিযাত্রা। আমেরিকার তীর স্পর্শ করে কলাম্বাসের জাহাজ, ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ ভিড়ে গিয়ে ভারতের মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দরে। আরম্ভ হয় প্রকৃত ইসলাম থেকে অনেকটাই বিচ্যুত এবং বিলাসব্যসনে ক্রম দুর্বল মুসলিম শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে নবজীবনের অধিকারী খৃস্টান প্রতীচ্যের প্রতিশোধমুখী ষড়যন্ত্রের পালা।

নিজেদের স্বভাবের জন্য আল্লাহর বিধানে অভিশপ্ত রাজ্যহারা নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ইহুদীরা একদা বিতাড়িত হয়েছিল আরব ভূমি থেকে। বিতাড়িত হয়েছিল ইসলাম অনুসারীদের দ্বারা। তারপর কেটে গেছে বহুদিন। বহুদিনের যাযাবর এই ইহুদীরা অবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরবেরই এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ড পেয়ে গেল খৃস্টান প্রতীচ্যের অনুকম্পায়। পেয়েই তারা রচনা করল এক মহাপরিকল্পনা। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রাংশ গ্রাস করে করে বৃহত্তর ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহা পরিকল্পনা। সেই লক্ষ্যে সর্পিল স্পৃহায় মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ় সংকল্প।

আর ভারতবর্ষে? স্বার্থভোগী ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংস্কারবাদী বৌদ্ধ (এবং জৈন) শক্তিকে হারিয়ে অবশেষে তারা তাদের উদ্ধত মাথা নত করতে বাধ্য হল ভারতবর্ষে নবাগত মুসলিম শক্তির কাছে। ক্রুসেড আরম্ভ হচ্ছে যখন তখন ভারতবর্ষে মুসলিম অধিকারের সূচনা হয়ে গেছে। এবং বাংলাদেশে চলছে তখন ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন শাসন। অতপর ওদিকে ইউরোপীয় ক্রুসেডার মুসলিমদের কাছে চরম পরাজয় বরণ করছে যখন, তখন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিও মুসলিম শক্তির হাতে পর্যুদস্ত হচ্ছে। এদিক থেকে ক্রুসেডার ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির পরাজয়ের মধ্যে একটা কৌতুকপ্রদ সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় শক্তিই পর্যুদস্ত হচ্ছে মুসলিম শক্তির হাতে। কিন্তু বৈসাদৃশ্য এখানে যে, পরাজয়ের পরবর্তীতে ক্রুসেডারগণ যখন রেনেসাঁর আলোকে নবজীবনের পথে অগ্রসরমান, ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তখন নৈরাশ্যের আঁধারে নিমজ্জমান। আর সে অবস্থায়ই ভাস্কো-ডা-গামার বাণিজ্য পোত ভিড়ল এসে কালিকট বন্দরে, যেখানে ইসলাম অনুসারী আরবী পারশিক বণিকরা হিন্দুদের সঙ্গে পূর্ণ সম্প্রীতিসহ বসবাস করত। কিন্তু মুসলিমদের হাতে মার খাওয়া ক্রুসেডার সন্তান ভাস্কো-ডা-গামার কালিকটে পদার্পণের পর, "যেখানে হিংসাদ্বেষ অপরিচিত ছিল, সেখানে হিংসাদ্বেষ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল"। (ফিরিঙ্গি বণিক, শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৬১ সন, পৃঃ ৮৩)

বাংলাদেশে রাজা গণেশের তিরোধান হয়েছে তার আশি বছরেরও আগে। কিন্তু নবরূপে সেই গণেশজীই যেন ভাস্কোরূপে আবির্ভূত হলেন ভারতবর্ষের উপকূলে। তারপর একের পর এক শুধু আগমন আর আগমন বিভিন্ন ইউরোপীয় বাণিজ্য পোতের আগমন, ক্রুসেডার ইউরোপীয়দের নানাবিধ মন্ত্রণাদাতাদের আগমন। ফলে, এতদিনের পরাজিত ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির মুমূর্ষু প্রাণে জাগল মুসলিম বিরোধী প্রতিহিংসার উন্মত্ত জোয়ার। প্রতিহিংসা থেকে জন্ম নিল প্রতিশোধ গ্রহণের জ্বলন্ত স্পৃহা। আরম্ভ হল নানা কৌশলভিত্তিক মুসলিম নিয়ন্ত্রণ ও দমন প্রক্রিয়া। তা সত্ত্বেও যখন মুক্তির লক্ষ্যে আড়মোড়া ভাঙতে আরম্ভ করেছে মুসলিম বিশ্ব, তখনই সে প্রক্রিয়া সর্পিল সহিংস রূপ নিয়ে ছোবল দিতে আরম্ভ করেছে। আজ এখন নিয়ন্ত্রণ ও দমন রূপ নিয়েছে প্রতিশোধের ভয়ঙ্কর রূপে বসনিয়ায়, ফিলিস্তিনে, কাশ্মীরে, অযোধ্যায় বোম্বাইয়ে।

তথ্যপঞ্জী

১। ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, মানবেন্দ্রনাথ রায় রচিত The Historical Role of Islam এর অনুবাদ, মুহম্মদ আবদুল হাই, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯

২। ইতিহাসের রূপরেখা, আব্দুল হালিম, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৬৯

৩। কালিকট থেকে পলাশী, শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯

৪। ফিরিঙ্গি বণিক, শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৬১ সন

৫। বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তফা, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৯৭৬

৬। The Crusades, Hans Eberhard Mayer, 1972

৭। Crusade, Commerce and Culture, Aziz S. Atiya, Oxford University Press, 1962

৮। Historia de Las Indias: B. de Las Cases, Madrid, 1875-76

৯। Portuguese Discoveries, Rev. Alex, J. D. D, Orsey, B. D

১০। History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, Dr. Muhammad Mohar Ali, Riyadh, 1985

১১। History of Bengali Language and Literature, Dr. Dinesh Chandra Sen

১২। A History of India, Michael Edwardes, NEL Mentor edition, 1976.

১৩। The Muslim Community of the indo Pakistan Subcontinent, Dr. I. H. Qureishi 1962

১৪। History of Bengal, Vol. II, Dr. Surendra Nath Sen-- edited, by Sir Jadunath Sarker, The University of Dacca, 1972.

১৫। মুর্শিদাবাদ কাহিনী, শ্রীনিখিল নাথ রায়, ৩য় সংস্করণ, ১৩১৬ সন

১৬। পলাশীর যুদ্ধ, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৩

১৭। The Decisive battles of India, Lt. Col. Malleson, 1885

১৮। মীর কাসিম, শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩১২ সন

১৯। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর-স্বাধীন সুলতানদের আমল, শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০

২০। বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, ডক্টর আবদুল করিম, বাংলা একাডেমী, ১৯৭০

২১। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুপ্রকাশ রায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭২

২২। বাঙ্গালীর ইতিহাস, সংক্ষেপে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এর বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিউ এজ সংস্করণ ১৯৬০

২৩। দৈনিক আনন্দ বাজার, ৩ জানুয়ারী ১৯৯৩।

২৪। সাপ্তাহিক দেশ, ১৮ মে ১৯৯১

২৫। দৈনিক ইনকিলাব ২৮ মে ১৯৯৩।

পরিশিষ্ট-খ
ইউরোপে পরবর্তী ক্রুসেড
ও
তুর্কীদের সাম্রাজ্য কথা

বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য ভূখণ্ডে বসবাসরত বাংলাভাষী হিসাবে বাঙ্গালী বলে পরিচিত ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠী বা জাতির মত তুর্কীভাষী লোকেরাও তুর্কম্যান, তুর্ক তাতার বা এক কথায় তুর্কী বলে পরিচিত। প্রায় অর্ধেক এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় প্রধানত ছিল তাদের বসবাস। এটা সেই প্রাচীন যুগের কথা। তাদের পূর্বাঞ্চলীয় জনগোষ্ঠীগুলো ছিল তুর্কী অথবা মোঙ্গলদের স্বজনভুক্ত এবং উত্তর এশিয়া ও আলতাই অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত। রুশীয়রা তাদেরকে অভিহিত করত তাতার নামে। এই তাতাররা ছিল তুব্বাত জাতির প্রতিষ্ঠাতা চীনা ঐতিহাসিকদের দ্বারা যারা চিহ্নিত হত তৌ কিউ নামে। এসব তুর্ক তাতাররা ছিল পশ্চিম এশিয়াস্থ তুর্কীদের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিকভাবে সম উৎসভুক্ত। এবং পরে তারা ইউরোপীয়দের সঙ্গেও নানা পার্থিব সূত্রে জড়িত হয়ে পড়ে।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ভূগোলবিদ ডোনাল্ড ইপিচার তুর্কীদের পরিচয় প্রসঙ্গে যা বলেন তা হচ্ছে-চীনা ঐতিহাসিকদের লেখায় সর্বপ্রথম তুর্কীদের কথা জানা যায়। সেখানে তাদের পরিচয় তৌ কিউ নামে। মধ্য ষষ্ঠ শতকে মোঙ্গলী স্তেপভূমির পশ্চিমাংশে অবস্থিত আলতাই অঞ্চলের ঢালে বসবাস করত তৌ কিউরা। ঐতিহাসিকেরা তুর্কীদের পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে আজও স্থির নিশ্চিত নয়। তাদের চিন্তায় আজও অমীমাংসিত প্রশ্ন ঃ তুর্কীদের সরাসরি পূর্বপুরুষ হিউংসুরা কি তুর্কী ছিল? অথবা মোঙ্গল মিশ্র মোঙ্গল কিংবা তুর্ক ও মোঙ্গলদের সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল হিউংসুরা?

যাযাবর প্রকৃতির এই তুর্কীরা আলতাই এর চারণভূমি থেকে ক্রমশ যে দক্ষিণ রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তুর্কীস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় বাস্য ভূমিতেও খাজার স্তেপ অঞ্চলে অথবা দক্ষিণ রাশিয়ার দাশত-ই-কিপচাক ভূমিতে এবং কাস্পিয়ানের উভয় তীরস্থ আজারবাইজান ও এশিয়া মাইনরের স্তেপাঞ্চলে। আলতাই এর পূর্বাঞ্চলে তারা মোঙ্গলদের তুর্কায়িত করতে ব্যর্থ হয় বরং মোঙ্গলরাই এককালের তুর্কী বংশোদ্ভূত নাইমান মেরকিত কেরাইত উপজাতিগুলোকে মোঙ্গলায়িত করে নেয়। ওখুম তুর্কীরা পরে এশিয়া মাইনরে আসে কয়েকবারেঃ প্রথমে সেলবুক নামক তুর্কীরা, পরে ওসমান বংশীয় তুর্কীরা।

সকল গোত্রের তুর্কীরাই ছিল সাম্রজ্যিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। সাম্রাজ্য গড়ে তোলাই ছিল যেন তাদের রক্তধারার বৈশিষ্ট্য। নীচে উল্লেখিত দশটি গোত্রের পরিচয় একথাই প্রমাণ করে।

(এক) তৌ কিউঃ ষষ্ঠ শতক থেকে মধ্য অষ্টম শতকের মধ্যে মোঙ্গলিয়া থেকে কাস্পিয়ান সাগরের তীর পর্যন্ত তারা গড়ে তুলেছিল বিশাল সাম্রাজ্য।

(দুই) খাজার ঃ ৩০০ থেকে ৯০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে খাজাররা আধিপত্য বিস্তার করে কৃষ্ণসাগরীয় ও কাস্পিয়ান স্তেপভূমিতে।

(তিন) উইখুর ঃ তৌ কিউ সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়ে উইখুররা মোঙ্গলিয়া শাসন করে ৭৪৪ থেকে ৮৪০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত।

(চার) কিরগীজ ঃ উইখুরদের পরে ৮৪০ থেকে ৯২০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে কিরগীজরা, তারপর কিতানদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ফিরে যায় তাদের আগেকার বাসস্থান উচ্চ ইয়েনিসিতে।

(পাঁচ) কারখানিদ ঃ ৯৫০ থেকে ১০০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে কারাখানিদরা ছড়িয়ে পড়ে কাশগরিয়া থেকে আমুদরিয়া ও সিরদরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং ১০৭৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম তুর্কীস্তানে ও ১১৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কাশগরিয়ায় ছিল তাদের গড়ে তোলা সাম্রাজ্য।

(ছয়) ওযুখ তুর্কম্যানদের এই শাখাটি তুর্কী শাসন চাপিয়ে দেয় অক্সাস থেকে ইরান ও মেসোপটেমিয়ায়। তারাই ১০৫৫ খৃস্টাব্দে দখল করে নেয় বাগদাদ। ১০৯২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সেলজুকরা বহাল রাখে তাদের শাসন ক্ষমতা। তারপরও তাদের বিভিন্ন শাখা খোরাসানে ১১৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, কিরমানে ১১৮৭ পর্যন্ত, ইরাকে ১১৯৪ পর্যন্ত, সিরিয়ায় ১১১৭ পর্যন্ত এবং এশিয়া মাইনরে ১৩০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে।

(সাত) খোয়ারিযম ঃ কতিপয় সেলজুক কর্মকর্তা আরল হ্রদের তীরে প্রতিষ্ঠিত তাদের ক্ষুদ্র রাজ্য থেকে গড়ে তোলে এক সাম্রাজ্য। সে সাম্রাজ্য ১১৫০ থেকে আরম্ভ করে ১২১৮ খৃস্টাব্দের আগে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(আট) তাইমুরীয় তুর্কী ঃ বার্লাসীয় শাখার নেতা তৈমুর লং প্রতিষ্ঠিত করেন তৈমুর রাজবংশ এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন (পুত্র শাহরুখসহ) ১৩৬৯ থেকে আরম্ভ করে ১৪৪৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত।

(নয়) কারাকোয়ুনলু ও আখুয়োনলু তুর্কী ঃ ১৪২০ থেকে ১৪৯০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তারা শাসন করে ইরাক আজারবাইজান ও পশ্চিম পারশ্যের অধিকাংশ অঞ্চল।

(দশ) ওসমানীয় তুর্কী ঃ সকল তুর্কী সাম্রাজ্যের চাইতে সর্বাধিক কাল স্থায়ী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিল এই ওসমানীয় বা ওসমানলি তুর্কীরা। ১২৮৮ খৃস্টাব্দের এক ক্ষুদ্র জায়গীর রান্য থেকে আরম্ভ করে কালক্রমে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয় তারা ১৩৮৯ খৃস্টাব্দে এবং পরে তার সীমানা আরও বৃদ্ধিপাত হয়। এই বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর।

এসব রাজ্য সাম্রাজ্য ছাড়াও আর কি ধরনের রাজ্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত নেতৃবর্গ; তবে সেগুলোর পেছনে ছিল না উপরিউক্ত কোন তুর্কীভাষী জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সমর্থন। এসব রাজ্য সাম্রোজ্যর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছেন-গযনী রাজ্যের নেতৃবর্গ, দাসবংশীয় সুলতানেরা, ভারতবর্ষের মুঘলেরা এবং মিশরের বাহরি মামলুকেরা। তাছাড়া ভারতবর্ষের একাধিক স্থানে রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারীরাও ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত। যেমন-বাংলায় লাখণৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইখতিয়ার উদদীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ও তার সঙ্গীরা এবং দিল্লী কেন্দ্রীক

সালতানাতের দাস বংশোদ্ভুত সুলতান কুতুব-উদ-দীন আইবক ও অন্যান্যরা। তদুপরি ভারতবর্ষের গ্রেট মুঘলরাও তাই।

একথাও এখানে উল্লেখ্য যে, বিশাল স্তেপভূমিতে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী চেঙ্গিস খানের রক্ত আজও সকল মোঙ্গলদের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। যদিও তখন সকল পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকায় মোঙ্গলদের সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না। বর্তমান মোঙ্গলীয়দের জাতীয় বীর হচ্ছেন চেঙ্গিস খান। চাঘাতের এবং গোল্ডেন হোর্ডের খানেরা ছিল নামে মাত্র তুর্কী। তেমনি নামে মাত্র তুর্কী হচ্ছে ক্রিমিয়নরা এবং কাজাল কাসিমত অস্ত্রাখান ও শায়বানিদরা এবং খিবা বুখারা ও খোকন্দের পরবর্তী খানেরা।

পশ্চিমা তুর্কীগ্রুপগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল পারশ্য রাশিয়া বা আফগান তুর্কীস্তানের লোকেশ ককেশাস পর্বত ও পারশ্যের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী তুর্কায়িত ইরানী ধারার আজারবাইজানীয়রা এবং পরবর্তীকালের ওসমানীয় তুর্কীরা। এই ওসমানীয় তুর্কীদের পরিচয় প্রসঙ্গে জানা যায় যে, প্রাচীন কালে চীনের গোবি মরুভূমির পশ্চিমে যে যাযাবর তুর্কীরা বসবাস করত, তাতারদের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে তারা চলে আসে মধ্যএশিয়ার দিকে এবং ক্রমে ভূমধ্যসাগর তীরস্থ জনপদ আনাতোলিয়ায় এসে স্থিত হয়। গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের বিজয়াভিযানের কালেই এমনটি ঘটেছিল।

আলেকজান্ডার আনাতোলিয়া দখল করে নেন খৃস্টপূর্ব ৩৩৪ অব্দে; তারপর রোমানরা তা দখল করে নেয় খৃস্টপূর্ব ১৯০ অব্দে। ৩৩০ খৃস্টাব্দে সম্রাট স্টান্টাইন বাইজানটিয়ানের প্রাচীন বাণিজ্য স্থলবর্তী স্থানে কনষ্টান্টিনোপলের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তা হয় পূর্বাঞ্চলীয় রোমানদের রাজধানী। পরবর্তীতে খৃস্টান বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয় এই কনষ্টান্টিনোপল নগরী। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমাঞ্চলীয় অভিজাত রোমান সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতে পূর্বাঞ্চলীয় রোমানরা ছিল অনভিজাত।

পশ্চিমা তুর্কীদের পার্শ্ববর্তী কিছুটা পূর্বাঞ্চলের লোকেরা বসবাস করত ইউরোপের সীমান্তবর্তী নানা এলাকায়; এবং তারাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে অভিযান চালিয়ে সেখানকার প্রভূত ক্ষতি সাধন করত। গোত্র ও পূর্বেকার বাসস্থানিক পরিচয়ে তারা সবাই ঠিক ছিল না। ইরতিশ নদী ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী সমতল অঞ্চলের লোকেরা গোত্র ও স্থানিক পরিচয়ে ছিল কিরগীজ কাসুক; তিয়েনশিয়েন পার্বত্যাঞ্চলের বাসিন্দারা কারা কিরগীজ; এবং রুশীয় তুর্কীস্তানের উজবেক ও সার্তিসরা অনেকটাই ইরানী ভাবাপন্ন। ভল্গা নদীর তীরে বসবাসকারীরা ছিল ইউরো রাশিয়ান তাতার। কিপচকদের বংশধর কাজালের তাতাররা পরবর্তীকালে ভল্গাতীরে এসে বুলগেরদের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। এই তাতাররা অস্ত্রাখানস্থ গোল্ডেন হোর্ডের তুর্ক মোঙ্গলদের বংশোদ্ভুত তাতারদের থেকে ভিন্ন পরিচয়বাহী। তুর্ক তাতারদের এমনি আরও জনগোষ্ঠী এশিয়া ইউরোপের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে বসবাস করে আসছিল। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, উপরিউক্ত তুর্ক তাতার মোঙ্গলদের নৃতাত্ত্বিক বা গোত্রভিত্তিক পরিচয় ধারার নিখাদ শুদ্ধতা নিরুপণ করা একেবারেই অসম্ভব। একদা যাযাবর আর্য জনগোষ্ঠীর বেলাতেও কি একথা সত্য নয়?

জনগোষ্ঠী পরিচিতির এই জটিল রূপরেখার ধরণ থেকে একথা বলা যায় যে, মানুষের গোত্র-গোষ্ঠী বা স্থানিক পরিচয় প্রায় সবার জন্যই সর্বকালেই পরিবর্তনশীল; এবং তার নৃতাত্ত্বিক জাতিগত বা গোষ্ঠীগত পরিচয়ের নিখাদ শুদ্ধতা ও নিয়মে আবদ্ধ না থেকে মিশ্রণের বাস্তবসম্মত ধারায় চির সঞ্চরণশীল। কোথায় কোন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য কোন জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটেছে, তার হিসাব রাখা কি সম্ভব? স্বস্তিময় বসবাসের লক্ষ্যে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মানুষের স্থানান্তরণ হচ্ছে তার চিরকালের বৈশিষ্ট্য। আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়া কি এর যথার্থ দৃষ্টান্ত নয়? আর জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ কথা? বর্তমান ইংরেজ জাতির পূর্বপুরুষ এ্যাঙ্গলো স্যাক্সনরা তো ইংল্যাণ্ডে ঔপনিবেশকারী অ্যাংগল স্যাকশন ও জুট জাতির মিলনের ফলে উৎপন্ন এক মিশ্র জাতিই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর এই বাস্তু পরিবর্তনের বা স্থানান্তরের পেছনে সর্বদাই এবং সর্বত্রই কার্যকর ছিল এবং থাকে তাদের জীবন ধারণের জন্য অধিকতর উপযোগী স্থানের লভ্যতা, নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য উপযোগী পরিবেশ লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং এমনি ধরণের আরও কারণ। আর এসব অর্জনের প্রক্রিয়ায় বরাবরই সংঘটিত হয়েছে সংঘর্ষ, অনেক সময়েই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী ও মরণপণ সংঘর্ষ। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত শক্তিই ছিল অধিকার প্রতিষ্ঠার অমোঘ হাতিয়ার ও স্বীকৃত রীতি। আজকের দুনিয়াতেও তার কি অবসান ঘটেছে?

অথচ মজার ব্যাপার হল, পুরনো বাস্তুপ্রতিষ্ঠাকারীরা পরবর্তী বাস্তু-প্রতিষ্ঠাকারীদেরকে বহিরাগত বলে বিতাড়নযোগ্য মনে করে বরাবরই নিজেদেরই হীনমন্যতার পরিচয় দিয়ে এসেছে এবং আসছে। এ জাতীয় অযৌক্তিক বিদ্বেষ যেন কোন কোন জাতির জন্য এক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বেলায় যেন এ বৈশিষ্ট্যটি বেশি স্পষ্ট।

সাধারণভাবে তুর্কী বলে অভিহিত জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে ইউরোপ ভূখণ্ডে অভিযান চালিয়ে বসতি স্থাপনের অধিকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। স্লাভ নামক জনগোষ্ঠী প্রথমে ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম দিকের বালটিক অভিমুখে এবং পরে দক্ষিণ দিকে দানিয়ুব উপত্যকা ও বলকান উপদ্বীপের পানে। এই স্থানান্তরণ ধারা জার্মানদেরকে পশ্চিম দিকে এবং কেল্টদেরকে আইবেরিয়া হয়ে স্পেন পর্যন্ত ধাবমান হতে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করে।

এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, আজকের ইউরোপ বলতে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত উন্নত জনপদের যে চিত্র আমাদের কল্পনায় ভেসে উঠে, আলোচ্য মধ্যযুগীয় ইউরোপের চিত্র মোটেই সেরকম ছিল না। অর্থবিত্ত শিক্ষা-সংস্কৃতি ধর্মীয় বিশ্বাস- সর্বদিক থেকেই ইউরোপ তখন প্রাচ্য ভূভাগের তুলনায় অনেক পশ্চাদপদ। শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র কথা, "তখন প্রাচ্যের তুলনায় অধিকাংশ প্রতীচ্য জনপদ নিরক্ষর জাতির আবাসভূমি বলিয়াই পরিচিত ছিল"। (ফিরিঙ্গি বণিক, শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৬১ সন, পৃঃ ১)। নিরক্ষরতার সঙ্গে দারিদ্র্য ও সংস্কৃতিহীনতার সম্পর্ক খুবই প্রত্যক্ষ। আর ধর্মীয় বিশ্বাস? খৃস্টীয় শতক পর্যন্ত ইউরোপ ছিল প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক শক্তির পূজক। খৃস্টধর্ম তখনও পর্যন্ত সেখানে শিকড় গেড়ে বসতে পারেনি। কোন কোন রোমক সম্রাটও তখন দেবতারূপে পূজিত হয়ে আসছেন।

খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের পর একদা প্রতাপশালী রোমান সাম্রাজ্যের পতনে ইউরোপীয়দের মাঝে নেমে এসেছে এক বিরাট শূন্যতা ও দুরবস্থা। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের অভাবে সেখানে উদ্ভব ঘটেছে সামন্ততন্ত্রের; তার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে খৃস্টীয় যাজকতন্ত্র। অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র শিক্ষাবিহীন অ-খৃস্টান ও খৃস্টানদের জনপদে সামন্ততন্ত্র ও ধর্মীয়ভাবে খৃস্টীয় যাজকতন্ত্র মিলে তৈরী হয়েছে এক নৈরাশ্যজনক অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য নেই বললেই চলে। ইউরোপীয় জন সমাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরাপুরি কৃষিভিত্তিক। তা-ও তো ইউরোপের জমিতে কৃষি।

এমনি অবস্থায় খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে ইউরোপে হল হুনদের আক্রমণাভিযান এবং ষষ্ঠ শতকে আভরদের। আক্রমণের লক্ষ্যস্থল তছনছ করে দিয়ে তারা বসতি স্থাপন করে সুবিধামত স্থানে, স্থায়ী হয়ে বসে হাঙ্গেরীতে। প্রায় একই সময়ে বুলগেররা ভল্গা নদীর তীরবর্তী স্থান থেকে সরে এসে বসবাস করতে লাগল দানিয়ুবের তীরবর্তী স্থানে। ওদিকে তথাকথিত বর্বর আক্রমণে ইউরোপের তদানীন্তন অনুন্নত অবস্থা আরও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। সর্বত্র সম্পন্ন হল সমূহ ধ্বংসলীলা। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়, রাস্তাঘাট সংস্কারের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ডাকাতি আর লুঠতরাজ বেড়ে যায়, বাণিজ্য চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। শহরের লোকসংখ্যা হ্রাস পায় এবং অনেকেই গ্রামে চলে যায়। (ইতিহাসের রূপরেখা, আবদুল হালিম, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৮৯)

সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয়দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে শ্রী মৈত্রেয় বলেন, "ইউরোপে কেবল সমরকাহিনীর আতিশয্য। ইউরোপের শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাসে কেবল হিংসার কথা, নরহত্যার কথা, পরস্পাপহরণের কথা, শয়তান যেন শোণিতের অক্ষরে দুর্দান্ত দস্যুর লুণ্ঠন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সে দেশের ধর্মান্ধ নরনারী ধর্মের নামে কত অধর্ম সঞ্চয় করিয়াছে। পূণ্যের নামে কত অপবিত্র আচারের অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইয়াছে, নিরন্তর বিদ্বেষ বিষে জর্জরিত হইয়া মানবের ললাটপটে কত দুরপনেয় কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কথা কোনও ইতিহাস পাঠকের অপরিজ্ঞাত নাই"। (প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৬)

এল সপ্তম শতক। আরব ভূমিতে উদ্ভব ঘটেছে ইসলামের এবং অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমান শুধুমাত্র আরবেই প্রতিষ্ঠিত করল না এক নব ভাবাদর্শভিত্তিক রাজ্য, অতিদ্রুত সে রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়ে এবং পারশ্য ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্য দুটির অহঙ্কার চূর্ণ করে গড়ে তুলল এক বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য। সপ্তম শতক থেকে এগার শতকের মধ্যে ইউরোপের মাটি স্পর্শ করে মুসলিম শক্তি ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক বাণিজ্যিক প্রাধান্যেরও অধিকারী হয়ে দাঁড়াল। সমগ্র ইউরোপ তখন এই মুসলিম শক্তির বিভীষিকায় শশগ্রস্ত।

সেনাপতি তারেক বিন যিয়াদ স্পেনের মাটিতে মুসলিম বিজয় প্রতিষ্ঠিত করলেন ৭১১ খৃস্টাব্দে; ৭১৭-১৮ খৃস্টাব্দে সিরীয় মুসলিমরা জয় করে নিল রোডস দ্বীপপুঞ্জ এবং ওই শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাইপ্রাসও। ৭৯৮ খৃস্টাব্দে বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে নিল স্পেনের উমাইয়াগণ। কার্সিকা ও সার্ডিনিয়া বিজিত হল ৯০৮ খৃস্টাব্দে এবং সিসিলি দ্বীপপুঞ্জ মুসলিম নিয়ন্ত্রণে এল ৮২৭ থেকে ৯০২ খৃস্টাব্দের মধ্যে। এই সিসিলি থেকেই মুসলমানরা ইতালীতে আক্রমণ চালিয়ে তার শাসকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

নবম শতকে স্লাভ জনগোষ্ঠীর বংশধরেরা অর্থাৎ তখনকার হাঙ্গেরীয়রা, পেচেনেগ ও পৌলটদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ রাশিয়ায় স্থানান্তরিত হল এবং সেখান থেকে কার্পাথিয়ান পর্বতমালা অতিক্রম করে তারা তিরযা পিত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করল। হাঙ্গেরীতে এসে স্থায়ী হল মাগয়ার তুর্কীরা আর কাজার তুর্কীরা অধিকার করে নিল ম্যাসিডোনিয়ার থেসালোনিকা উপত্যকা।

এর আগে সপ্তম শতক থেকে মধ্যএশীয় তুর্কীরা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের ধর্মবিশ্বাস ইসলামকে কবুল করে নেয়। এর ফলে তারা ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়। উমাইয়া খেলাফত তখন শক্তি শীর্ষে উপনীত।

নবম শতক থেকে দেখা যায়, তুর্কীরা আব্বাসীয় খেলাফতের অধীনে নানা চাকুরীতে বর্ধিত সংখ্যায় প্রবেশ করছে; অল্পকালের মধ্যেই সেনাবাহিনীতে তাদের সংখ্যা বিপুলাকার ধারণ করছে। সমাসীন হচ্ছে তারা সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদেও।

এরপর দশম শতক থেকে আরম্ভ হয় তুর্কীস্তান ও উত্তর চীনে বসবাসরত তুর্কীদের ইরান-ইরাক এবং পারশ্য ও এশিয়া মাইনরে স্থানান্তরণ ও বাস্তু পরিবর্তন। এগার শতকে তুর্কীদের সেলজুক গোত্রের নেতৃত্বে তারা খেলাফতের অধীনস্থ কতিপয় পূর্বাঞ্চলীয় জনপদ নিয়ে গড়ে তোলে রুম রাজ্য। এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিল কাই গোত্রের ওখুয শাখার অন্যতম এক শাখা।

তুর্কী গোত্রীয় ওখুয বংশোদ্ভূত এক শাখার নেতা ছিলেন সেলজুক। তার নামানুসারেই সে বংশীয়দের নাম হয় সেলজুক বংশ। ৯৫৬ খৃস্টাব্দের দিকে সেলজুকের তুর্কীস্তানের কিরগীজ উপত্যকা থেকে দক্ষিণ ট্রান্সঅক্সিয়ানার বুখারা অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে এবং ধীরে ধীরে গযনী রাজ্যের বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের আধিপত্য। তারপর গজনীর অধঃপতনে সেলজুকেরা ইলখান ও সামানী রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেয়। সেলজুকের পৌত্র তুগরীল বেগের নেতৃত্বেই অর্জিত হয় নিশাপুরে মার্ভ তাবারিস্তান হামাদান রাই ও ইস্পাহানের উপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ। ১০৫৫ খৃস্টাব্দে তুগরীল বেগ বুয়াইয়া আমীরের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা করেন দুর্বল বৃদ্ধ আব্বাসীয় খলিফার মর্যাদা। তারপর খলিফার প্রতিনিধিরূপে তুগরীল বেগ একের পর এক জনপদ দখল করে উপনীত হন বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের দ্বারপ্রান্তে এবং বাইজানটাইন সম্রাটকে নির্দেশ দেন কর প্রদানের জন্য।

তুগরীল বেগের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুস্পুত্র আলপ আরসালান ১০৭১ খৃস্টাব্দে সেলজুক প্রধানরূপে মানযিকার্দের যুদ্ধে বাইজানটাইন সম্রাট ডায়োজিনিস রোমানাসকে পরাস্ত করে আনাতোলিয়ার প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করে দেন। প্রতিদানে আব্বাসীয় খলিফার কাছ থেকে লাভ করেন সুলতান খেতাব। তার পুত্র সুলতান মালিক শাহ। মালিক শাহর পুত্র সুলায়মান কুলতুমাস পরে দখল করে নেন আনাতোলিয়ার উত্তর পশ্চিমাংশ। এরপর থেকেই আরম্ভ হয় আনাতোলিয়ার পথে তুর্কীদের জোরদার স্থানান্তরণ।

সেলজুকেরা ততদিনে আরও বড় রাজ্যের অধিকারী। সেলজুক প্রধান আলাউদ্দিন ছিলেন কুনিয়ার শাসনকর্তা। মোঙ্গলেরা আলাউদ্দিনের রাজ্য আক্রমণ করলে তাকে

সাহায্য করেন সুলায়মান। পুলতোমাসের পুত্র এর-তুগরল। এর প্রতিদানে সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ এর তুগরলকে প্রদান করেন তুমানিচ এলাকার গ্রীষ্ম চারণক্ষেত্রের অধিকার। তুমানিচ ছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী স্থান। এর তুগরল বংশধরেরা তুমানিচ এলাকাকে শক্তিকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন ও তার সীমানা আরও বাড়িয়ে রচনা করেন তুর্কী শক্তি বা অটোম্যান শক্তির প্রথম ভিত।

অতঃপর আরম্ভ হয় মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে ইউরোপীয় খৃস্টশক্তির ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। এই ক্রুসেডের ব্যাপ্তিকাল ১০৯৬ থেকে আরম্ভ করে ১২৯১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এই ক্রুসেডের ছিল তিনটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে খৃস্টশক্তি বিজয়ী হলেও পরবর্তী দুটি পর্যায়ে মিশরের ইমামুদ্দীন জঙ্গী ও তদীয় পুত্র নূরুদ্দীন জঙ্গী এবং আইয়ুবী বংশীয় চিরস্মরণীয় বীর মুজাহিদ গাজী সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম শক্তিই বিজয়ী হয়। এই ক্রুসেডকালেই বার শতকে জার্মানরা পশ্চিমাঞ্চলীয় স্লাভদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ভিস্টুলার তীর পর্যন্ত। তাতে করে বিপর্যস্ত হয় ফিনল্যাণ্ডীয় উপজাতিগুলো। তের শতকে তুর্ক মোঙ্গলরা আরম্ভ করে তাদের স্থানান্তরণ প্রক্রিয়া। অধিকার করে নেয় তারা রাশিয়ার অনেকাংশ; উত্তরে নোভগোরোদ পর্যন্ত গিয়ে তারা সাইলেসিয়ার লিগনিজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অচিরেই পশ্চিম ইউরোপ থেকে সরে এলেও পনের শতক পর্যন্ত তারা পূর্ব রাশিয়ায় বসবাস করতে থাকে এবং দেখা যায়, আঠার শতকেও তারা দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপভূমিতে ও ক্রিমিয়ায় থেকে যাচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে, এর তুগরল ও তার বংশধরেরা তুমানিক এলাকাকে শক্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলে রচনা করেছিলেন তুর্কী শক্তির প্রথম ভিত্তি। এই বংশটি ছিল ওযুখ গোত্রের ২৪টি শাখার অন্যতম শাখার লোক। এর তুগরলের পুত্রের নাম ছিল ওসমান। পিতার মৃত্যুর পর ১২৮৮ খৃস্টাব্দে ওসমান হন বংশীয় প্রধান। সেলজুক সুলতানের নিকট থেকে তিনি লাভ করেন কারাজি শহরের অধিকার। এরপরই সেলজুক বংশের পতনে তিনি স্বাধীন সুলতানরূপে আবির্ভূত হন এবং নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। সুলতান ওসমান গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে সে সাম্রাজ্যের কিয়দংশ দখল করেন। অতঃপর পুত্র ওরখানের নেতৃত্বে গ্রীক সাম্রাজ্যে প্রেরণ করেন এক যুদ্ধাভিযান। সেটা ১৩১২ খৃস্টাব্দে। গ্রীক বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে নগরীতে অবস্থান গ্রহণ করে। আর ওসমানীয় বাহিনী অবরোধ করে সেই নগরী। দীর্ঘ. ১৪ বছর ধরে চলে সেই অবরোধ। অবশেষে আত্মসমর্পণ করে গ্রীক বাহিনী। ১৩২৬ খৃস্টাব্দে গ্রীসের বিখ্যাত নগরী বুর্সার পতন ঘটে। বুর্সা বিজয়ের ফলে তুর্কীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং তা পরিণত হয় উদীয়মান তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানীতে। সুলতান ওসমানই ছিলেন তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। নিজ বুদ্ধি বলে একটি রাজ্যকে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। সাহসী সৈনিক সরল ও অনাড়ম্বর এই নেতা কোনদিন সুলতান উপাধি ব্যবহার করেননি। এই মহাপুরুষ সুলতানের নামানুসারেই তার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে বলা হয় ওসমানীয় বা অটোম্যান সাম্রাজ্য।

ইসলামের ইতিহাসে সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়েছে কয়েকবার। ওসমানীয় বা অটোম্যান সাম্রাজ্যের উল্লেখস্থলে এসব সাম্রাজ্যের কাল ও প্রকৃতি পরিচয় তুর্কী সাম্রাজ্যের পরিচয়কে অনুধাবন করতে সহায়ক হবে।

আমাদের মহানবী (সাঃ)-এর ওফাত তারিখ ৬৩২ খৃস্টাব্দের ৮ই জুন, ১১ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল। তারপর আরম্ভ হয় খোলাফায়ে রাশেদা বা সত্যপন্থী

খলিফাদের শাসনকাল। তার বিস্তৃতিকাল ৬৩২ থেকে ৬৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। অতঃপর ৬৬১ থেকে ৭৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত রাজতন্ত্রীয় উমাইয়া খেলাফত কাল। তার অবসানে আরম্ভ হয় আব্বাসী খেলাফত, বিস্তৃতিকাল ৭৫০ থেকে ১২৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত।

ফাতেমীয় বংশের উদ্যোগে মিশরে ইসলামের একমাত্র শিয়া খেলাফত ফাতেমীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় ৯০৯ খৃস্টাব্দে এবং তার অবসান ঘটে ১১৭১ খৃস্টাব্দে। এর পর আসে স্পেনের উমাইয়া খেলাফতের কথা। স্পেন বিজিত হয় ৭১১ খৃস্টাব্দে; ৯২৯ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তা ছিল বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফতের অনুগত। কিন্তু আব্বাসী খেলাফতের অধঃপতনের সময় বুয়াইয়াদের দৌরাত্ম্যে এবং মিশরের ফাতেমীয় খলিফা আল-মুইজ কর্তৃক মক্কা ও মদীনা দখলের পর বাগদাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে স্পেনের উমাইয়া সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান আমীরুল মুমেনীন উপাধি গ্রহণ করে নিজেকে ইসলামের খলিফা বলে ঘোষণা করেন। এই খেলাফতের অবসান ঘটে ১০৩১ খৃস্টাব্দে।

তারপর আসে তুর্কী খেলাফতের কথা, যার বিস্তৃতিকাল ১২৮৮ থেকে ১৯০৯ অথবা আইন মোতাবেক ১৯২২ খৃস্টাব্দ। এবার তুর্কী সাম্রাজ্যের কথা।

ক্রুসেডের শেষে পরবর্তী ক্রুসেডকালে বৌদ্ধ ও পনের শতকে ওসমানীয় তুর্কীরা বলকান অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে সেখানে তাদের কাজার টৌহিটক পোমক স্বজনদের সংস্পর্শে আসে। এই স্বজনেরা পরবর্তীতে ইসলাম কবুল করে নেয়; আর ওসমানীয় তুর্কীরা হাঙ্গেরী দখল করে নিম্ন অষ্ট্রিয়াতেও প্রবেশ করে।

অতঃপর আরম্ভ হয় নাইপারের উচ্চ উপত্যকায় লিটল রাশিয়ানদের স্থানান্তরণ প্রক্রিয়া। ষোল শতকে তারা চলে যায় দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপভূমির দিকে। আর গ্রেটরাশিয়ানরা ভল্গা পেরিয়ে উরাল পর্বতের দিকে আরম্ভ করে তাদের অগ্রগমন, গন্তব্য স্থল সাইবেরিয়া।

এসব স্থানান্তরণ প্রক্রিয়ায় তথাকথিত তুর্কী জাতি মিশ্রণজনিত নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে যথেষ্ট পরিমাণেই রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন মোঙ্গল ও তাতার জনগোষ্ঠী এশিয়া ইউরোপের তুর্কীরা এবং অন্যান্য ইন্দো আফগান জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটে বিভিন্ন সময়ে। ফলে, ওসমানীয় তুর্কীরা হয়ে ওঠে নৃতাত্ত্বিকভাবে পুরাপুরি এক মিশ্র জাতি। এখানে উল্লেখ্য যে, কিছুসংখ্যক বাদে সকল তুর্কীই বর্তমানে ইসলাম অনুসারী। ইউরোপে তুর্কী ও স্লাভদের পরবর্তী সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য এসব জাতি-ভিত্তিক বিবেচনা বিশেষ সহায়ক হবে, বিশেষ করে ইউরোপীয় সভ্যতার মূল্যায়নে।

এতক্ষণ ইউরোপে জটিল স্থানান্তর পরিস্থিতির যে বিবরণী দেওয়া হল তা থেকে এমন একটা ধারণা করা যায় যে, সমুদ্রের উথাল-পাতাল অবস্থায়. তাতে বিচরণশীল বিভিন্ন যানের আরোহী দল জীবন বাঁচাতে যেমন বিভিন্ন দিকে অবস্থান গ্রহণ করতে প্রাণান্ত চেষ্টা করে। ইউরোপের পরিবর্তন প্রশস্ত সেই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীও বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তার সন্ধানে উম্মাদপ্রায় চেষ্টা চালিয়েছিল। তাতে করে একের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ বেধেছে, রক্ত ঝরেছে অনেক। কিন্তু তা তো মানুষেরই নিরাপত্তা লাভের আকুল আশঙ্কায়ই। এ জাতীয় উম্মত্ততার জন্য কোন জাতিগোষ্ঠীকেই এককভাবে

দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। সমুদ্র যখন অনেকটাই শান্ত, পরিবর্তন প্রমত্ত পরিস্থিতি যখন অনেকটাই সুস্থিত, তখন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বা স্থানিক অবস্থানকে ন্যায্য বলে স্বীকার করে নেওয়াই তো যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইউরোপে তেমনটিই কি হয়েছিল? হয়নি। '....each section seems to have held the turks reoponsible for whatever wrong was done, and the Turk was charged with being the cause of all misfortunes.... the Turks have become, as it were the Scapegoat .. প্রতিটি জাতি শাখা যা কিছু সংঘটিত অন্যায়ের জন্য তুর্কীদেরকে দায়ী করেছে বলে মনে হয়, আর সকল দুর্ভাগ্যের কারণ হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছে তুর্কীদেরকে .... বলতে কি, তুর্কীরা হয়ে দাঁড়িয়েছে নন্দঘোষ'। (The Trurks and Europe, gaston gaillard, 1921, p. 7)

আগেই বলা হয়েছে, এর তুগরীল ও তার বংশধরেরা তুমানিচ এলাকাকে শক্তি কেন্দ্র করে রচনা করেছিল অটোম্যান শক্তির ভিত্তি। সেটা এগার শতকে। তের শতকের শেষদিকে ওসমান কারাহিসারে এসে বসতি স্থাপন করেন যখন, তখন মোঙ্গলদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে সেলজুকদের রাজ্য। কারাহিসারে স্থায়ী থেকে ওসমান কতিপয় পার্শ্ববর্তী জনপদ দখল করে নেন। অতঃপর এশিয়া মাইনরের বাদবাদি অংশ করায়ত্ত করে ১৩৫৫ খৃস্টাব্দে তিনি ইউরোপের মাটিতে পা রাখেন।

অটোম্যান শাসকদের কীর্তিগাথায় যাবার আগে সাম্প্রতিক বলে নেওয়া ভাল যে ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের পরিচিতিকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায় ১২৮৮ থেকে ১৫৬৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দ্বিতীয় পর্যায় ১৫৬৬ থেকে ১৯০৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম পর্যায় হচ্ছে এর উন্নতিকাল এবং দ্বিতীয় পর্যায় এর অবনতি কাল। প্রথম পর্যায়ের আরম্ভ আমীর ওসমানকে দিয়ে এবং অবসান সুলতান-খলিফা সুলায়মান দ্য ম্যাগ্নিফিসেন্ট বা মহামতি সুলায়মানের শাসন কালের শেষে। দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভে রয়েছেন সুলতান খলিফা দ্বিতীয় সেলিম এবং শেষে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ। নীচে দেওয়া হল অটোম্যান শাসকদের সংক্ষিপ্ত কর্মকাণ্ড ভিত্তিক এটা বিবরণী।

ওসমান (১২৮৮-১৩২৬ খৃঃ) অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গ্রীক সাম্রাজ্যের কিয়দংশ দখল করেন। তার রাজ্য বসফরাস থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাহসী সৈনিক ও যোগ্য নরপতি এই আমীর ওসমান ছিলেন দয়ালু ও উদার। জীবন যাপনে তিনি ছিলেন সরল ও অনাড়ম্বর। এসব কারণে তুর্কীরা তাকে তাদের প্রথম সুলতান হিসাবে গ্রহণ করে কিন্তু সুলতান উপাধি ব্যবহার না করে তিনি আমীর বলেই পরিচয় দিতেন। তার পরিচয় আগেও কিছুটা দেওয়া হয়েছে।

ওরখান (১৩২৬-১৩৫৯ খৃঃ) আমীর ওসমানের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান ওরখানের শাসন কাল থেকেই আরম্ভ হয় অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রকৃত কীর্তিগাথা। সেনাপতি থাকাকালেই ১৩২৬ খৃস্টাব্দে তিনি গ্রীক নগরী বুর্সা অধিকার করেন। এই বুর্সাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় তুর্কীদের নতুন রাজধানী। পিতার জীবিতাবস্থায় তিনি সেনাবাহিনী সংগঠিত করতে আরম্ভ করেন এবং তার রাজত্বকালে তা সম্পন্ন করেন। ইসলামে নবদীক্ষিত খৃস্টান তরুণদের দ্বারা গড়ে তোলেন জেনিসারি নামে এক অতিরিক্ত সেনাবাহিনী। এই বাহিনী ক্রমে পরিণত হয় এক দুর্ধর্ষ বাহিনীতে। ১৩২৯ খৃস্টাব্দে গ্রীক শহর নীসা ও ১৩৩৭ এ নিকোমেডিয়া দখল করেন। সুলতান ওরখানের

রাজত্বকালে তুর্কীদের দ্বারা প্রথম ইউরোপ ভূখণ্ড দখল করা একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। পরে তিনি অধিকার করে নেন এশিয়া মাইনর। গেলিপলি দখল করেন ১৩৫৬ খৃস্টাব্দে।

প্রথম মুরাদ (১৩৫৯-১৩৮৯ খৃঃ) নিরক্ষর এই সুলতান ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য এক তুর্কী নাগরিক। তার শাসনামলেই বিজিত হয় থ্রেস, আড্রিয়ানোপল, ম্যাসিডোনিয়া, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, এশিয়া মাইনরের আরও কতিপয় জনপদ এবং কসোভো।

প্রথম বায়েজিদ (১৩৮৯-১৪০৩ খৃঃ) ১৩৯৬ খৃস্টাব্দে নাইকোপোলিসের যুদ্ধে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদেরকে পরাস্ত করে বাইজানটাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অধিকারের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তুর্কী রাজ্যে তৈমুর লং এর আক্রমণাভিযানে সে পরিকল্পনা স্থগিত হয়ে যায়। তুর্কী সাম্রাজ্যে নেমে আসে বিপর্যয়।

প্রথম মুহম্মদ (১৪০৩-১৪২১ খৃঃ) তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও উদার শাসনের ফলে ইতোমধ্যে আপতিত সাম্রাজ্যের বিপর্যয় কেটে যায়।

দ্বিতীয় মুরাদ (১৪২১-১৪৫১ খৃঃ) স্বীয় ব্যক্তিত্ব অসামান্য সাহস ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা তিনি তুর্কী সাম্রাজ্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর বিরুদ্ধে খৃস্টান শক্তি জোটবদ্ধ হয়; কিন্তু ভার্নার যুদ্ধে খৃস্টান শক্তি পরাস্ত হয়। এ যুদ্ধকেও ক্রুসেড বলতে হয়।

দ্বিতীয় মুহম্মদ (১৪৫১-১৪৮১ খৃঃ) ইতিহাসে তিনি বিজেতা মুহাম্মদ বলে অভিহিত। তাঁর সময়েই বিজিত হয় বাইজানটাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল, ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে। ১৪৬১ খৃস্টাব্দে তুর্কী সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে কার্মানিয়া ও ট্রেবিযণ্ড রাজ্য এবং ১৪৬২ খৃস্টাব্দে বসনিয়া হারজেগোভিনা ও ওয়ালাচিয়া। ইতালীর অট্রান্টো অধিকার করেন ১৪৮০ খৃস্টাব্দে।

দ্বিতীয় বায়েজিদ (১৪৮১-১৫১২ খৃঃ) তাঁর শাসনামলে তুর্কী সাম্রাজ্যে আবার দুর্বল হয়ে পড়ে। মসনদের উত্তরাধিকার নিয়ে পুত্র সেলিমের সঙ্গে তাঁর বিরোধ আরম্ভ হয়। অবশেষে পুত্রের অনুকূলে তিনি মসনদ ত্যাগ করেন।

প্রথম সেলিম (১৫১২-১৫২০ খৃঃ) নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি ইতিহাসে 'সেলিম দ্য গ্রিস' বা নিষ্ঠুর সেলিম বলে পরিচিত। পারশ্য বিজয়ের লক্ষ্যে যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন তাতে পুরাপুরি সফলকাম না হয়ে পারশ্যের দিয়ারবেকার ও কুর্দিস্তান দখল করে রাজধানীতে ফিরে আসেন। ১৫১৬ খৃস্টাব্দে সিরিয়া জয় করে নেন এবং পরের বছর জয় করেন প্যালেস্টাইন ও মিশর, ১৫২০ খৃস্টাব্দে মস্কো ও আলজেরিয়া । মিশরে অবস্থান কালে আব্বাসীয় খলিফার কাছ থেকে অনুমোদনক্রমে সুলতান প্রথম সেলিম হন ইসলামী দুনিয়ার খলিফা। তখন থেকে তুর্কী সুলতানরা শুধুমাত্র বিশাল পার্থিব সাম্রাজ্যের প্রধানই নন, তখন থেকে তারা বিশ্ব মুসলিমের আধ্যাত্মিক প্রধান বলেও স্বীকৃত হন।

মহামতি সুলায়মান (১৫২০- ১৫৬৬ খৃঃ) পৃথিবীর ইতিহাসে ষোল শতক বিশেষ করে স্মরণীয় একারণে যে এ শতকে জন্মগ্রহণ করেছেন পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত কবি, শাসক ও রাজন্যবর্গ। এ শতক ছিল ইউরোপের জন্য সংস্কার আন্দোলন ও

পুনর্জাগরণের শতক, প্রাচীন সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ও নবনব আবিস্কারের শতক। এ শতকেরই ইতিহাসখ্যাত তুর্কী শাসক হচ্ছেন মহামতি সুলায়মান। তাঁর শাসনামলেই তুর্কী সাম্রাজ্য খ্যাতির শীর্ষে স্থান লাভ করে। মসনদে আরোহণ করেই তিনি অন্যায়ভাবে আটক সব বন্দীদের মুক্তি দেন, দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের দেন শাস্তি এবং সৎ কর্মকর্তাদের পুরস্কার। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ১৫২১ খৃস্টাব্দে অধিকৃত হয় বেলগ্রেড ও রোডস দ্বীপপুঞ্জ, ১৫২৬ এ হাজেরী, ১৫৩৪-এ তিউনিস এবং ১৫৫১ তে ত্রিপলি।

মহামতি সুলায়মানের রাজত্বকালে তুর্কীদের নৌশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এতে তিনি খায়রুদ্দীন বারবারোসা ও দ্রাগুত নামে দুজন বিখ্যাত নৌসেনাধ্যক্ষর সাহায্য লাভ করেন। তাতে করে মহামতি সুলায়মান ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর ও আরবসাগরে আধিপত্য লাভ করে এডেন ইয়েমেন ও ভূমধ্যসাগরের কতিপয় দ্বীপ অধিকার করে নেন। নৌসেনাধ্যক্ষ বারবারোসা ও দ্রাগুতের সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্য তুর্কী নৌবাহিনীকে স্থলবাহিনীর মতই অজেয় করে তোলেন।

শ্রেষ্ঠ বিজেতা ও সুশাসক মহামতি সুলায়মান ছিলেন শিক্ষা-সংস্কৃতির উৎসাহদাতা, ন্যায়বিচারের পথিকৃৎ ও ধর্মবর্ণনির্বিশেষে মানবকল্যাণকামী। তুর্কী সাম্রাজ্যকে কতিপয় বৃহদাকার প্রদেশে বিলয়েত প্রতি প্রদেশকে কতিপয় সানজাক এ প্রতি সানজাককে কতিপয় কাজাস এ বিভক্ত করে তিনি প্রশাসনকে সুবিন্যস্ত করেন। প্রতিটি কাজাস কাজী দ্বারা প্রতিটি সানজাক পাশার দ্বারা এবং প্রতিটি প্রদেশ গভর্ণর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। নিঃসন্দেহে মহামতি সুলায়মান ছিলেন তুর্কী খলিফাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

তুর্কী আইনের আমূল সংস্কারের জন্য তুর্কী ইতিহাসে তিনি আইনদাতা বলে পরিচিত। আজও যুক্তরাষ্ট্রীয় সিনেটের গ্যালারিতে রক্ষিত পৃথিবীর দশজন শ্রেষ্ঠ আইন প্রণেতার প্রতিকৃতির মধ্যে মহামতি সুলায়মানের প্রতিকৃতিও শোভা পাচ্ছে। এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপ এই তিনটি মহাদেশের বিশাল এলাকা জুড়ে তুর্কী সাম্রাজ্যের এই শাসকের আমল সুশাসন, শান্তি, ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে।

আমীর ওসমান থেকে আরম্ভ করে মহামতি সুলায়মান পর্যন্ত দশজন শাসকের মধ্যে একাধিক শাসকই ছিলেন বিখ্যাত বিজেতা। সুলতান প্রথম মুরাদ ও প্রথম বায়েজিদের রাজ্য বিজয়ের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ডোনাল্ড ইপিজার বলেন, (অনুবাদ "এ দুজনের রাজত্বকালে অটোম্যান রাজ্য বিস্তার ছিল বিস্ময়কর। উভয় শাসকই ছিলেন অসাধারণ বীরত্বের অধিকারী এবং তাঁরা পেয়েছিলেন সম সামর্থ্যের অধিকারী সেনাপতিদের সহায়তা। তাঁদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে মুরাদ ভূষিত ছিলেন সতর্কতার গুণ যার ফলে বিজয়কে সংহত করার জন্য তিনি পেয়েছিলেন যথেষ্ট সময়, আর বায়েজিদ বিভিন্ন ভূখণ্ড অযৌক্তিক দ্রুততায় গিলে ফেলেছিলেন যা তিনি হজম করতে পারেননি। এবং বার্লাসী তুর্কী নেতা তৈমুরের হাতে পরাজিত হওয়ার পর তাঁর হারানো সব ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে তদীয় বংশধরদের শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ সময় লেগেছিল। তৎসত্ত্বেও ১৪০২ খৃস্টাব্দে তুর্কী আধিপত্য ছিল ১৩২৬ খৃস্টাব্দে ওসমান কর্তৃক রেখে যাওয়া ক্ষুদ্র আমিরাতের প্রায় চল্লিশ গুণ আয়তনের ভূখণ্ড। নীচের তালিকা থেকেই (যাতে সামন্ত

রাজ্যগুলো বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষভাবে শাসিত ভূখণ্ডের আয়তনই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে) তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বিজিত ভূখণ্ডের আয়তন (হাজার বর্গ মাইলে)				
তুর্কী শাসক	খৃস্টাব্দ	ইউরোপ	এশিয়া	মোট
ওসমান	১৩২৬	--	৭.০	৭.০
ওরখান	১৩৬২	১.৫	২৭.৫	২৯.০
প্রথম মুরাদ	১৩৮৯	৫১.০	৫০.০	১০১.০
প্রথম বায়েজিদ	১৪০২	৮৬.০	১৮১.৫	২৬৭.৫

(দ্রষ্টব্যঃ An historical geography of the ottoman Empire, Donald edgar pitcher, 1972, p.41)

এখানে উল্লেখ্য যে, তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল (ক) প্রত্যক্ষভাবে শাসিত এলাকা (খ) সামন্ত রাজ্য এবং (গ) করদ রাজ্যসমূহ।

সুলতান খলিফা দ্বিতীয় মুহাম্মদের রাজত্বকালের প্রারম্ভে সার্বিয়া ছিল স্বাধীন রাজ্য এবং বসনিয়া-হারজেভোগিনাও তাই। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর সুলতান খলিফা দ্বিতীয় মুহম্মদ সার্বিয়ার উৎপীড়ক শাসককে কর প্রদানের নির্দেশ দেন এবং তা যথারীতি প্রত্যাখ্যাতও হয়। তারপরই আরম্ভ হয় সার্বিয়ার বিরুদ্ধে তুর্কীদের যুদ্ধাভিযান। ১৪৫৪, ১৪৫৫ এবং ১৪৫৬ খৃস্টাব্দে পরপর তিনটি অভিযানে বিজয় লাভের কালে বেলগ্রেড ছাড়া বাদবাকি সার্বিয়ার পতন ঘটে তুর্কীদের হাতে। পরে বসনিয়া-হারজেগোভিনার ভাগ্যেও নেমে আসে একই পরিণাম। বসনিয়া-হারজেগোভিনা পরিণত হয় সামন্ত রাজ্যে। অবশেষে তা বিভক্ত হয়ে তুরস্ক ও হাঙ্গেরীর নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ১৪৬৩ খৃস্টাব্দে বসনিয়া-হারজেগোভিনাকে পুরাপুরি নিজ অধিকারভুক্ত করে নেয় তুরস্ক।

সম্প্রতি এই জনপদগুলো স্বাধীনতার ব্যাপারে সমস্যাপীড়িত হয়ে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা যায়, মানবতাই আজ সেখানে বিপন্ন। এসব বিবেচনায় আমরা এখানে জনপদগুলো সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করছি।

বসনিয়া-হারজেগোভিয়া, ক্রোশিয়া, সার্বিয়া, মন্টিনেগ্রো, ম্যাসেডোনিয়া ও শ্লোভেনিয়া স্টেটসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়া। সম্প্রতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের বিপর্যয়ের ফলে যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন স্টেট যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন বসনিয়া-হারজেগোভিনাও অনুসরণ করে সে পদক্ষেপ এবং তা যথারীতি জাতিসঙ্ঘের অনুমোদনও লাভ করে। কিন্তু তাতে বাধ সাধে বসনিয়া-হারজেগোভিনায় বসবাসকারী সার্ব ও ক্রোটরা। তারা সদ্য স্বাধীন এই রাষ্ট্রটিতে মুসলমানদের আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকার করে। আরম্ভ হয় গৃহযুদ্ধ। এ গৃহযুদ্ধে সংঘটিত প্রাণঘাতী নিষ্ঠুর পাশবিকতা সম্বন্ধে সারা বিশ্ব আজ উৎকণ্ঠিত। আমরা এ সম্পর্কে আর কোন মন্তব্য না করে বসনিয়া-হারজেগোভিনার জনবিন্যাসের একটা

হিসাব এখানে তুলে ধরতে চাই। হিসাবটা ১৯৭১ খৃস্টাব্দের; কিন্তু শতকরা জনবিন্যাস হওয়ায় বর্তমানেও সেসব হার খুব একটা পরিবর্তিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি না।

১৯৭১ খৃস্টাব্দের বসনিয়া হারজেগোভিনার জনসংখ্যা ছিল ৩৬,৬৩,২৬৮ জন। তার মধ্যে ৭,৭২,৪৯১ জন ছিল ক্রোট; ১৪,৮২,৪৩০ জন মুসলমান; ১৩,৯৩, ১৪৮ জন সাবা; এবং ১৫,১৯৯জন অন্যান্য জাতিসত্তার লোক। শতকরা হিসাবে একশ' জন নাগরিকের মধ্যে তিনটি প্রধান জাতিভিত্তিক হার হচ্ছে; মুসলমান ৪০.৫%, সার্ব ৩৮.০%, ক্রোট ২১.১% এবং অন্যান্য ০.৪%।

(দ্রষ্টব্যঃ Nations and Nationalities of yogoslabia, Medjunawdra Politika, Beograd, 1974, p.393)

এবারে বিভিন্ন সময়ে তুর্কী শাসক এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকার যেসব সামন্ত রাজ্যকে কেন্দ্রীয় শাসনভুক্ত করে নেন, তার একটা তালিকা এখানে তুলে ধরছি।

কেন্দ্রীয় তুর্কী শাসনাধীন সামন্ত রাজ্যসমূহের আয়তন (বর্গ মাইলে)

তারিখ	এশিয়া	ইউরোপ	আফ্রিকা	মোট
১৩০০	৩৫০০	--	--	৩৫০০
১৩২৬	৭২০০	--	--	৭২০০
১৩৬২	২৮১০০	৪০০০	--	৩২১০০
১৩৮৯	৫০২০০	৫০৬০০	--	১০০৮০০
১৪০২	১৮১৪০০	৮৬০০০	--	২৬৭৪০০
১৪১৩	৭০৫০০	৬৬১০০	--	১৩৬৬০০
১৪২১	৭৯৭০০	৭৯৬০০	--	১৫৯৩০০
১৪৫১	১১৫১০০	১০২৯০০	--	২১৮০০০
১৪৮১	১৭৮৪০০	১৫৬৬০০	--	৩৩৫০০০
১৫১২	১৭৬২০০	১৬৪৯০০	--	৩৪১১০০
১৫২০	৩১০৫০০	১৬৪৯০০	১০১৫০০	৫৭৬৯০০
১৫৫৬	৪৬২৭০০	২২৪১০০	১৯১০০০	৮৭৭৮০০
১৫৭৪	৪৬৪৩০০	২৩১৯০০	২০৬০০০	৯০২২০০
১৫৯৫	৫৪৯৪০০	২৩৩৬০০	১৯৫৫০০	৯৭৪৫০০
১৬০৩	.৫১০৬০০	২৩২৪০০	১৯৫৫০০	৯৩৮৫০০
১৬০৬	৪২৩৪০০	২৩২৪০০	১৯৫৫০০	৯৫১৩০০

(দ্রষ্টব্যঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪)

এই তালিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তুর্কী শাসনাধীন সামন্ত রাজ্য সমূহের মোট আয়তন ১০১৩ থেকে ১৪২১ খৃস্টাব্দে কিছু কমেছে; তখন সুলতান প্রথম মুহাম্মদ সাম্রাজ্যের প্রধান। এর আগে প্রথম বায়েজীদের আমলে তৈমুর লং এর আক্রমণে সামাজ্যে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তা কাটছে মাত্র। তারপর তা আবার বেড়ে চলেছে। আরও দেখা যায় দ্বিতীয় মুহাম্মদের শাসনামলে ইউরোপে সামন্ত রাজ্যের আয়তন বেড়েছে, এই বৈশিষ্ট্য অতঃপর একই রকম থেকেছে। আরও লক্ষণীয় যে, এশিয়ায় তুর্কী আধিপত্য ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এই-ই হল তুর্কী সাম্রাজ্যের উন্নতি কালের রাজ্য বিস্তৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ। মহামতি সুলায়মানের মৃত্যুর পর তুর্কী সাম্রাজ্যের আরম্ভ হয় প্রদীপ্ত সূর্যের অস্তাচলের পানে পথপরিক্রমা। এ পরিক্রমায় তুর্কী শাসকরা হচ্ছেনঃ দ্বিতীয় সেলিম (১৫৬৬-১৫৭৪ খৃঃ); তৃতীয় মুরাদ (১৫৭৪-১৫৮৩ খৃঃ); প্রথম আহমদ ও আরও দু'জন শাসক (১৫৮৩-১৬২৩ খৃঃ); চতুর্থ মুরাদ (১৬২৩- ১৬৪০ খৃঃ); ইবরাহীম (১৬৪০-১৬৪৩ খৃঃ); চতুর্থ মুহাম্মদ (১৬৪৩-১৬৮৭ খৃঃ); দ্বিতীয় সুলায়মান (১৬৮৭-১৬৯১ খৃঃ); দ্বিতীয় আহমদ (১৬৯১-১৭৩০ খৃঃ); তৃতীয় মুহাম্মদ (১৭৩০-১৭৫৭ খৃঃ); তৃতীয় মুস্তফা (১৭৫৭-১৭৭৩ খৃঃ); প্রথম আবদুল হামিদ (১৭৭৩-১৭৮৯ খৃঃ); তৃতীয় সেলিম (১৭৮৯-১৮০৭ খৃঃ); মাহমুদ (১৮০৭-১৮৩৯ খৃঃ); আবদুল মজিদ (১৮৩৯-১৮৬১ খৃঃ); আবদুল আযীয (১৮৬১-১৮৭৬ খৃঃ); এবং দ্বিতীয় আবদুল হামিদ (১৮৭৬-১৯০৯ এবং বিশৃঙ্খলাসহ ১৯২২ খৃঃ)।

এই অধোগতি পরিক্রমার প্রাক্কালে সুলতান দ্বিতীয় সেলিম তাঁর শাসনারম্ভে দখল করেছিলেন ইয়েমেনের বাকি অংশ এবং ১৫৭১ খৃস্টাব্দে সাইপ্রাস। এই-ই ছিল শেষ বিজয়। তারপর থেকে আরম্ভ হয় পরাজয় ও রাজ্য হারানোর পালা। এই অধোগতির ধারায় ১৫৯৫ থেকে ১৬০৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কী খেলাফতের অধিকারচ্যুত হয় হাঙ্গেরী, যদিও অন্যদিকে চকসিমের যুদ্ধে তুর্কীরা অধিকার করে নেয় পোল্যাণ্ডের কিছু অংশ। তারপর থেকেই তুর্কী খেলাফতের অধোগতি হয় দ্রুততর, সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করে সাম্রাজ্যের বিশালত্ব। এই শেষ পর্যায়ের অধিকাংশ সুলতানই ছিলেন দুর্বল; তাদের দুর্বলতার সুযোগে প্রশাসনের কর্মকর্তারা হয়ে ওঠে দুর্নীতিপরায়ণ এবং সৈন্যেরাও অনেকটা স্বেচ্ছাচারী। এমনি অবস্থায় ১৬৪০ থেকে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করতে আরম্ভ করে মন্ত্রীদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার উপর। কারণ, তখন সাম্রাজ্যের হাল ধরা ছিল মন্ত্রীদের হাতে। সেনাপতিরাও হয়ে উঠেছিল যথেষ্ট প্রভাবশালী। এ সময় ও পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের অস্তিত্বই মন্ত্রী সেনাপতিদের সদিচ্ছা ও কর্মদক্ষতার উপর পুরাপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এ পর্যায়ে আলজেরিয়া, তিউনিস ও ত্রিপলি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনই হয়ে যায়। ১৬৮২ থেকে ১৬৯৯ এর মধ্যে যুদ্ধাবস্থায় কার্লোভিজের পতনের পর তুর্কী কর্তৃপক্ষ হারায় হাঙ্গেরী রাজ্যের আধিপত্য। এই অধোগতির কালটা ছিল পরাজয়জনিত কারণে অনেক কটা সন্ধিরও কাল। প্যাসারোভিজের সন্ধিবলে তেমেস্বার ও সার্বিয়ার অংশবিশেষ তুর্কীদের হাতছাড়া হয়ে যায়; তুর্কীদের চিরশত্রু রাশিয়া উদ্ধার করে নেয় বাকোভিনা ও লেসার টারটারি এবং বুকারেস্টের সন্ধিসূত্রে রাশিয়া ফেরত পায় নাইপার থেকে দানিয়ুব তীরের অঞ্চলসমূহ। ১৮০৯ খৃস্টাব্দে তুর্কীরা হারায়

আয়োনিয়া দ্বীপপুঞ্জ। ১৮২৭ এ গ্রীস স্বাধীন হয়ে যায়। তুর্কীরা রাশিয়াকে আর্মেনিয়া ফেরত দেয় ১৮২৯ খৃস্টাব্দে। তদুপরি রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে হয় ওয়ালচিয়া মোলদাভিয়া ও সার্বিয়ার আধিপত্য। ১৮৩১ খৃস্টাব্দে ফ্রান্স জয় করে নেয় আলজেরিয়া। দুর্বল তুর্কী সাম্রাজ্যের এমনি হেনস্তা অতীতে ইউরোপেও ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু রেনেসাঁ যুগে ইউরোপ তা কাটিয়ে ওঠে তার জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে। ইউরোপ তখন মহাশক্তিধর। কিন্তু তূর্কীরা?

তুর্কীরা যে নবজীবনের পথে অগ্রসর হতে চায় নি, তা নয়। সতের শতকের শেষ দিক থেকে আরম্ভ করে আঠার শতকের প্রথম দিকের কালটি ছিল অযোগ্য শাসকদের রাজত্বকাল। তখন থেকে রাজ্যের পর রাজ্য ইউরোপীয় শক্তির কবলে পড়ে এবং সে শক্তিগুলো অটোম্যান সাম্রাজ্যকে ধরার বুক থেকে মুছে ফেলার প্রয়াসে নিয়োজিত হয়। আঠার শতকের শেষের দিকে তুর্কীরা বুঝতে পারে যে, দেশকে বিশৃঙ্খলা ও বিদেশীদের হামলা থেকে রক্ষা করতে হলে ক্রমোন্নতিশীল ইউরোপীয়ানদের আদর্শে সামগ্রিক সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের উপলব্ধি থেকে উনিশ শতকে তুরস্কে আরম্ভ হয় সংস্কার বা তানজিমাত আন্দোলন এবং গৃহীত হয় নানা কার্যক্রম।

সুলতান তৃতীয় সেলিম (১৭৮৯-১৮০৭ খৃঃ) ফরাসী ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে প্রথম সংস্কার কাজ আরম্ভ করেন। শুধুমাত্র সংস্কার নয়, তিনি চাইলেন নতুন আদর্শে একটি রাষ্ট্র গঠন করতে। কিন্তু জেনিসারি সেনাবাহিনী ও আমীরদের বিরোধিতার জন্য তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়। সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের (১৮০৮-১৮৩৯ খৃঃ) সময়ে তুর্কী সাম্রাজ্যে আরম্ভ হয় দ্বিতীয়বারের মত তানজিমাত কার্যক্রম। এজন্য দ্বিতীয় মাহমুদকে তুরস্কের 'পিটার দ্য গ্রেট' বলা হয়। তিনি ইউরোপীয় আদর্শে শাসন ব্যবস্থা ও সামরিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। কিন্তু রাশিয়া ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির শত্রুতার জন্য তাঁর সকল প্রয়াসও পুরাপুরি সফল হতে পারে নি।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান আবদুল মজিদের সময়ে আবার আরম্ভ হয় সংস্কার কার্যক্রম। এই সংস্কার যুগ ইতিহাসে তানজিমাত যুগ নামে চিহ্নিত। সুলতান আবদুল মজিদ এ সময়ে যে কয়েকজন প্রগতিপন্থী রাজনীতিবিদের সাহায্য লাভ করেন, তারা হচ্ছেন রশীদ পাশা, আলী পাশা ও ফুয়াদ পাশা প্রমুখ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা। এঁরা সবাই ছিলেন প্রতীচ্য শিক্ষা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী রশীদ পাশার দ্বারা অনুপ্রানিত সুলতান আবদুল মজিদ কয়েকটি ফরমান জারী করেন। তুরস্ককে আধুনিক করে গড়ে তোলাই ছিল এই তানজিমাত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। রাজপ্রাসাদ থেকে গুলহানে হাত্তী হুমায়ুন নামক এক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় তুরস্কে নব যুগের সূচনা। তুরস্কের ইতিহাসে হাত্তী হুমায়ুনকে ম্যাগনাকার্টা বা আন্তর্জাতিক সনদ হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

এই ঘোষণা বলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জান-মান ও সম্পত্তির নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে বিরাট জনতা, কূটনীতিক ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী রশীদ পাশা এই রাজকীয় ফরমান পাঠ করেন। অতঃপর ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে ঘোষণা করা হয় আরও কয়েকটি রাজকীয় নির্দেশ।

হাত্তী হুমায়ুন এর ঘোষণায় আরও ছিল সকল ধর্ম মুক্তভাবে পালন করবার স্বাধীনতা এবং কোন ধর্মমত গ্রহণ ও বর্জন করায় কোন জোর জবরদস্তি না করার বিধানও তাতে সন্নিবেশিত ছিল। তৃতীয়তঃ ধর্মীয় ভাষা কিংবা জাতিত্ব প্রশ্নে সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নিষিদ্ধ করা হল। চতুর্থতঃ পূর্ববর্তী সুলতানগণ কর্তৃক অমুসলমান সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধার দাবী স্বীকার করে নেওয়া হল। পঞ্চমতঃ খৃস্টানগণ প্রয়োজনে তাদের গীর্জা, স্কুল, হাসপাতাল ও গোরস্তান মেরামত করার অধিকার লাভ করবে। ষষ্ঠতঃ অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য তানজিমাত গঠন করবে রাষ্ট্র পরিষদ, রচনা করবে দন্ডবিধি আইন এবং প্রতিষ্ঠিত করবে ব্যাংক। জেলখানার সংস্কার, পুলিশ বিভাগের পুনর্গঠন ও দাসপ্রথা বিলোপের বিধান এবং বিচার পদ্ধতিকে অধিকতর ন্যায়ভিত্তিক করার ব্যবস্থা তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হল। সপ্তমতঃ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপর করভার ন্যস্ত করা হল। সর্বোপরি, কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও সামরিক কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করে দিল। কিন্তু তানজিমাতের সুপরিকল্পিত এই বিরাট কর্মসূচীও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। এই ব্যর্থতার কারণ ছিল নানাবিধ। প্রথমতঃ সকলকে খুশী করার লক্ষ্যে প্রণীত এই তানজিমাত কর্মসূচী-মুসলিম অমুসলিম কাউকেই তেমন খুশী করতে পারে নি; কারণ, মুসলিম-অমুসলিম কেউই তখন সমানাধিকারের এই নীতির যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। অমুসলিমদের অখুশী হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল-ইউরোপীয় খৃস্ট শক্তিগুলোর প্ররোচনা। এদের মধ্যে রাশিয়া ছিল বিশেষভাবেই উস্কানিদাতা। দ্বিতীয়ত; রাষ্ট্রের সুবিধাভোগীরা এর বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তৃতীয়তঃ মুসলিম গোঁড়া সম্প্রদায়ও ছিল এসব সংস্কারের বিরোধী। তারা চাইত না দেশে প্রতীচ্য খৃস্টীয় ভাবধারা প্রচলিত হোক।

তানজিমাত আন্দোলন তার প্রত্যাশিত ফললাভে ব্যর্থ হলেও এর মধ্যে নিহিত ছিল নব্য তুরস্কের জন্ম বীজ। পরবর্তীতে তুরস্কের ইতিহাসে ইয়ং টার্কস বা নব্য তুর্কীগণ যে ভূমিকা পালন করে, তানজিমাতে ছিল তার আগমন বার্তা। তানজিমাতের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে প্রফেসার শ দল্লতী বলেনঃ "Reform in the Ottoman empire was a complex process each solution created new problem . The application of new laws and practions was slowed for a number of reasons. First of sall, the empire remained very large, with a heterogeneous society and relatively poor cimmunications. Second the inexperience of the reformers and the greed of the imperial powers of Europe for profits at the expense of the relafirely undeveloped empire and its people herpetuated and depened a series of economic problems inherited from the past. Third, demands for social and political reforms, themselves consequences of the Tanqimat, conflicted with the desire of its leaders to moderige .as rapidly and efficiently as possible, without the delays and compromises inherent in any democratic system. Fourth, nationalistic elements among the subjects minorities, nourshed and sustained by russia and to a lesser extent, the other western powers demanded autonomy or independence from the empire and dramatized their ambitions with sporatic leberration within the

ottoman dominious and with anti muslim hropaganda in Europe and america. Finally, the great powers, though held back from breaking up and partitioning the empire by their concern to preseve the European balance of power, intervened in internal ottoman affairs to secure palitical and economic advantages for themselves. While the ottoman reformers adjusted themselves and their programs as much as possible to meet these and other challenged, they lacked to knowledge, experience, and strength needed to solve them within the relatively short time left by their enemies. অটোম্যান সাম্রাজ্যে সংস্কার কাজ ছিল এক জটিল প্রক্রিয়া, প্রতিটি সমাধান সৃষ্টি করেছিল নতুন নতুন সমস্যা। কতিপয় কারণের জন্য শ্লথ হয়ে আসছিল নতুন আইন ও তার ব্যবহারের প্রয়োগ। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যটি ছিল বিশালাকার, তাতে ছিল বিভিন্নমুখী সমাজ এবং তুলনামূলকভাবে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ সংস্কারকারীদের অনভিজ্ঞতা এবং তুলনামূলকভাবে অনুন্নত সাম্রাজ্যের ও তার লোকজনদের স্বার্থের মূল্যে নিজ স্বার্থের অনুকূলে ইউরোপের রাজকীয় শক্তিসমূহের লোভ অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একরাশ অর্থনৈতিক সমস্যাকে স্থায়ী ও গভীর করে তুলেছিল। তৃতীয়তঃ তানজিমাতেরই পরিণতিতে উদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবী এবং যে কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অন্তর্নিহিত অবিলম্বিতা ও আপোসকামিতা ছাড়াই যথাসম্ভব দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে আধুনিকায়নের জন্য নেতৃবর্গের বাসনার মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছিল। চতুর্থত, রাশিয়াও কিছুটা কম পরিমাণে হলেও অন্যান্য পশ্চিমা শক্তিগুলো দ্বারা লালিত ও প্ররোচিত তুর্কী সংখ্যালঘিষ্ঠদের মধ্যেকার জাতীয়তাবাদী অংশগুলো সাম্রাজ্যে থেকে সশাসন অথবা স্বাধীনতার দাবী তুলেছিল এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ও ইউরোপ আমেরিকায় মুসলিমবিরোধী প্রচারণার নাটক করে যাচ্ছিল। শেষতঃ বৃহৎ শক্তিসমূহ ইউরোপীয় শক্তি সাম্য বজায় রাখার মানসে অটোম্যান সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে দেওয়া কিংবা বিভক্ত করা থেকে বিরত থাকলেও নিজেদেরই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে তুর্কী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে আসছিল। অটোম্যান সংস্কারবাদীরা যদিও এসব এবং অন্যান্য চ্যালেঞ্জের যথাসম্ভব মোকাবিলায় নিজেদের কার্যক্রমকে পুনর্বিন্যস্ত করে আসছিল, তবুও শত্রুপ্রদত্ত তুলনামূলকভাবে সামান্য সময়ের মধ্যে এসব সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যের অভাব ছিল তাদের। "(History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. II, S. g. Shaw and E. K. Shaw Combridge University press, 1977. p. vii)

তানজিমাত সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে যদিও উপ্ত ছিল জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বীজ তবুও ভাগ্যের পরিহাসেই যেন সে আন্দোলন গিয়ে মাথা ঠুকে পড়ল সুলতান খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদের (১৮৭৬-১৯০৯ খৃঃ) সার্বভৌম স্বেচ্ছাশাসনের পাষাণ দেয়ালে। এই রাজপুরুষটির পদচ্যুতির পর গণতন্ত্র কিছুদিনের জন্য চালু থাকলেও আবার তা স্বেচ্ছাতন্ত্রে পথ হারাল সুলতান বিন সুলতানদের দ্বারা না হলেও টার্কসদের দ্বারা ইয়ং পরিচালিত সরকারের মাধ্যমেই। সংস্কার কার্যক্রমের ডামাডোলের মধ্যেই ইয়ং টার্কসদেরই প্রভাবিত ভুল সিদ্ধান্তের মরীচিকায় আকৃষ্ট হয়ে তুর্কীরা জড়িয়ে পড়ল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোলকধাঁধায়।

পরাজিতদের পক্ষভুক্ত হওয়ায় যুদ্ধশেষে সাম্রাজ্যহারা হয়ে তুরস্ক কোনরকমে টিকে থাকল একটি স্বাধীন দেশ হয়ে মাত্র।

কিন্তু কেন এমনটি হল? এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে প্রখ্যাত সমাজবিদ ইবনে খালদুনের তত্ত্বকথায়। ইবনে খালদুনের তত্ত্বানুযায়ী ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে উন্নতি অবনতির যে তিনটি অপরিহার্য স্তর রয়েছে, তারই অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য খেলাফত বা বংশীয় শাসনের মত তুর্কী খেলাফতের বেলাতেও। এই তিনটি স্তর হচ্ছে উত্থান, ক্রমবিকাশের ধারায় উন্নতির শীর্ষে আরোহণ এবং শেষে অধঃপতন ও বিলুপ্তি। আব্বাসীয় খেলাফতের সঙ্গে তুর্কী খেলাফতের সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আব্বাসয়ীয় খেলাফতের ব্যাপ্তিকাল ৫০৮ বছর, ৭৫০ থেকে ১২৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। আর তুর্কী খেলাফতের ব্যাপ্তিকাল ৬৩৪ বছর, ১২৮৮ থেকে ১৯২২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। সর্বমোট ৩৭ জন আব্বাসীয় খলিফার মধ্যে প্রথম ৮ জন ছিলেন কার্যস্পৃহা বিচক্ষণতা, বিদ্যোৎসাহিতা, রণনৈপুণ্য ও দূরদর্শিতায় উপযুক্ত শাসনকর্তা, বাদবাকিরা ছিলেন এসব দিক থেকে অযোগ্য। তার সর্বমোট ২৮ জন তুর্কী খলিফার মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলীতে প্রথম ১০ জন ছিলেন যোগ্য শাসক, বাদ বাকি ১৮ জন উক্ত গুণাবলী থেকে অনেকটাই বঞ্চিত।

তদুপরি, আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের মত তুর্কী সাম্রাজ্যও ছিল আকারে বিশাল। অবনতির পর্যায়ে আব্বাসীয়দের মত তুর্কীদেরও পেয়ে বসেছিল সামরিক বিভাগের অনৈক্য অবহেলায় জাতিগত কোন্দলে দরবারীদের ঔদ্ধত্য এবং অমুসলিম শক্তির বিদ্বেষজাত চরম শত্রুতায়। তাছাড়া তুর্কী সাম্রাজ্য দেখা দিয়েছিল সামন্তরাল ও পাশাদের দৌরাত্ম্য। প্রাদেশিক গভর্ণর ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের আর একটি কারণ। এই সমস্যার পেছনে কার্যকর ছিল তুর্কীদের অনগ্রসরতা। রেনেসাঁর উৎসাহে ইউরোপীয় শক্তি যখন জীবনের জয়গানে মুখর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় দ্রুত অগ্রসরমান তুর্ক শক্তি তখন অগ্রগামিতার এই যুগ-ভাষা বুঝতে না পেরে রাজতন্ত্রীয় মোহে আচ্ছন্ন। ফলে তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত মানুষের চোখে লাগল না নতুন দিনের অগ্রগমন প্রত্যাশার আলোক। তুর্কীদের কুটির শিল্প খৃস্টানদের যান্ত্রিক শিল্পের হাতে মার খেয়ে খেয়ে অনেক পিছনে পড়ে গেল। বৈদেশিক বাণিজ্য হয়ে গেল খৃস্টানদের একচেটিয়া ব্যাপার। সব কিছু মিলিয়ে তুর্কী রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়াল ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি।

সর্বোপরি মুসলমান তুর্কীদের মহাশত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইউরোপীয় খৃস্ট-শক্তিসমূহ। ইউরোপ থেকে তুর্কীদেরকে উৎখাত করাই ছিল খৃস্ট-শক্তিসমূহের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য খৃস্ট-শক্তি তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরম্ভ করল প্রবল আন্দোলন। একাজে অগ্রণী ছিল রাশিয়া। রাশিয়া গ্রীকদের গির্জা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ স্বার্থের অনুকূলে গ্রীক ও স্লাভদেরকে তুর্কীদের বিদ্রোহের উস্কানি দিতে লাগল। তুরস্কের খৃস্টান প্রজাদের মধ্যে রাশিয়া জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে তাদেরকে স্বাধীনতার পথে উস্কাতে লাগল। অথচ তখনকার তুর্কী শাসকদের মধ্যে এমন যোগ্য ব্যক্তি কেউ ছিলেন না যিনি শত্রুপক্ষের এসব শত্রুতার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রের ঐক্য বজায় রাখতে পারতেন। ফলে, যা হবার তাই হল। ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি ক্রমেই রুগ্নতর হতে লাগল।

এমনি অবস্থায় তুরস্ক যখন দুর্বল ও বহু, বিচ্ছিন্নধা বলকান জোটের সঙ্গে যুদ্ধ শেষে যখন তুরস্ক ভেঙ্গে পড়ার অবস্থায় উনীত তখনই ১৯১৪ খৃস্টাব্দে আরম্ভ হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থচিন্তা তখন প্রবল আকার ধারণ করেছে। এই স্বার্থচিন্তা থেকে জন্ম নেয় জাতীয়তাবোধ। আর জার্মানীতে এই জাতীয়তাবোধের তীব্রতা ছিল সমধিক। ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করে জার্মানী হয়ে ওঠে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি। বিশ শতকে পৃথিবী যখন কয়েকটি বৃহৎ শক্তির আধিপত্যের অঞ্চল হিসেবে বিভক্ত, তখন জার্মানী ইউরোপের বাইরে আধিপত্যস্থল পেল সামান্যই। তাই সে চাইল পৃথিবীর সম্ভাব্য বৃহত্তম আধিপত্য এলাকা। সেই লক্ষ্যে সে কর্মপন্থাও গ্রহণ করল। তদনুযায়ী জার্মানী তুর্কীদের মিত্ররূপে নিজেকে প্রতিভাত করতে চাইল। নির্মাণ করে দিল বাগদাদ রেলওয়ে এবং তুর্কী সেনাবাহিনীতে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও তুরস্কের উন্নয়ন লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে সে মিত্রতার প্রমাণ রাখল। অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিও তখন মনোনিবেশ করল যথাকর্তব্য। ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্য পারস্পরিক বিরোধ ভুলে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হল। এই মৈত্রী ত্রিপলি আঁতাত বলে খ্যাত।

বলকান অঞ্চলে সার্ভিয়া চাইছিল একটি শক্তিশালী স্লাভ রাষ্ট্র। তাই প্যান স্লাভিজমের জিকির তুলে স্লাভদেরকে সে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতে থাকে। অষ্ট্রিয়াও সার্ভিয়াকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে দৃঢ়সকল্প হয়। বলকানে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার রোধকল্পে রাশিয়া সার্ভিয়ার নেতৃত্বে স্লাভিজমকে সমর্থন দেয়। অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়ার এই বিরোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইন্ধন যোগায়।

এমনি পরিস্থিতিতে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায়। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ২৮শে জুন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে প্রকাশ্য দিবালোকে নিহত হন অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফ্রাসিস। আততায়ী ছিল অষ্ট্রিয়ায় বসবাসরত জাতিতে স্লাভ এক লোক। এ কারণে অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়াকে দায়ী করে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কতগুলো শর্ত মেনে নেওয়ার দাবী জানায়; এবং তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় সার্ভিয়া। ব্যস, সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অষ্ট্রিয়া। আর পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দেয় ইতালী, জাপান, চীন ও আমেরিকা। তাদেরকে অভিহিত করা হয় মিত্রপক্ষ বলে। সার্ভিয়াকে সমর্থন করে জার্মানীর নেতৃত্বে যুদ্ধে যোগ দেয় তুরস্ক ও বুলগেরিয়া। আরম্ভ হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

তুরস্ক এ যুদ্ধে যোগ দেয় পুরাপুরি বাধ্য হয়ে। নইলে ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে এত বড় যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্নই ওঠে না। বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে তুরস্ক গ্রহণ করে নিরপেক্ষ নীতি। নিরপেক্ষ থাকাটাই ছিল অধিকাংশ প্রধানদের উপদেশ; আর যদি কোন পক্ষ নিতেই হয়, তাহলে মিত্রপক্ষের সঙ্গে থাকাই তাদের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু চরমপন্থী তরুণ গ্রুপের নেতা আনোয়ার পাশা জার্মানীর পক্ষে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তদুপরি, তুরস্কের প্রতি ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরূপ মনোভাব এবং জার্মানীর মিত্রভাব শেষ পর্যন্ত তাকে জার্মানী পক্ষেই টেনে নেয়।

তুর্কীরা কিন্তু প্রথমদিকে যুদ্ধে ভালই করে। অদ্ভুত সাহস ও সমরকৌশলের পরিচয় দেয় তারা। তুরস্কের সঙ্গে দার্দানেলিসের যুদ্ধে মিত্রপক্ষ পরাস্ত হয়। গেলিপলির যুদ্ধেও বৃটিশদের বিরুদ্ধে কৃতিত্ব দেখায় তুর্কী বাহিনী। কুত অল আমারও যুদ্ধেও বৃটিশ বাহিনী তুর্কীদের নিকট পরাজয়বরণ করে। কিন্তু দেখা গেল- জার্মানী তাদের পর্যাপ্ত সাহায্য দিচ্ছে না! এমনি অবস্থায় আরম্ভ হয় মিত্রপক্ষের হয়ে

বৃটিশদের কূটনৈতিক খেলা। বিভিন্ন আরব জনপদের লোকদেরকে স্বাধীনতার টোপ গিলিয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত করা হয়। শরীফ হোসেন সমগ্র আরবের বাদশা হওয়ার আশায় বৃটিশকে পূর্ণ সমর্থন জানান। ইহুদীদেরকে প্যালেস্টাইনে স্বতন্ত্র আবাসভূমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেদের দিকে টেনে নেয়।

তিন বছর নৈপুণ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তুর্কী বাহিনী ইরাক ও সিরিয়া থেকে পশ্চাদসরণ করে। মিত্রপক্ষ অধিকার করে নেয় বাগদাদ, দামেস্ক, আলেপ্পো ও জেরুযালেম। এভাবে এশিয়া ও আফ্রিকায় তুরস্কের ক্ষমতা ও সম্মান লোপ পায়। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে মাদরোসের সন্ধি দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে।

কিন্তু এই বিশ্বযুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তুরস্ক। যুদ্ধের সময় তুর্কী সাম্রাজ্যকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য মিত্রশক্তির মধ্যে যে চারটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যুদ্ধশেষে সেগুলি কার্যকর করে তুরস্ককে অনেক রাজ্য হারাতে বাধ্য করা হয়। তুরস্ক হারায় সিরিয়া, ইরাক, আরব ও এশিয়া মাইনরের অংশবিশেষ ও মিশরের কর্তৃত্ব। তাদের তখনকার রাজধানী কনস্টান্টিনোপল মিত্রপক্ষের সামরিক কর্তৃত্বে চলে যায়। তুর্কী সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে শুধুমাত্র তুরস্কে সীমাবদ্ধ হয়।

পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে এখানে কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনার কালপঞ্জী তুলে ধরছি যাতে আমাদের আলোচ্য কালটির আগে পরের ঘটনা সম্পর্কে পাঠকের কিছুটা ধারণা আসে।

১৩৯৮ খৃস্টাব্দ : তৈমুর লং এর ভারত আক্রমণ
১৪৫৩ খৃস্টাব্দ : তুর্কীশক্তির হাতে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন
১৪৯২ খৃস্টাব্দ : কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার
১৪৯৮ খৃস্টাব্দ : ভাস্কো-ডা-গামার ভারত উপকূলের কালিকট বন্দরে আগমন
১৬৯০ খৃস্টাব্দ : কলিকাতার ভিত্তি স্থাপন
১৭৫৭ খৃস্টাব্দ : পলাশীর যুদ্ধ
১৭৭৬ খৃস্টাব্দ : আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা
১৭৭৮ খৃস্টাব্দ : প্রথম বাংলা পুস্তকের মুদ্রণ
১৭৮৯ খৃস্টাব্দ : ফরাসী বিপ্লব
১৮০৭ খৃস্টাব্দ : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর দাস ব্যবসায় রদ
১৮৩০ খৃস্টাব্দ : ইংল্যাণ্ডে প্রথম রেলপথের প্রতিষ্ঠা
১৮৩৫ খৃস্টাব্দ : টেলিগ্রাফের উদ্ভাবন
১৮৫৩ খৃস্টাব্দ : ভারতবর্ষে প্রথম রেলপথ নির্মাণ
১৮৫৭ খৃস্টাব্দ : ভারতবর্ষে সিপাহী অভ্যুত্থান
১৮৭৬ খৃস্টাব্দ : টেলিফোনের আবিষ্কার
১৯০৯ খৃস্টাব্দ : উত্তরমেরু আবিষ্কার
১৯১১ খৃস্টাব্দ : দক্ষিণমেরু আবিষ্কার
১৯১৪ খৃস্টাব্দ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ
১৯১৭ খৃস্টাব্দ : রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব
১৯১৮ খৃস্টাব্দ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান

উপরের আলোচনায় আমরা ১৮৩১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি। আমরা এ-ও উল্লেখ করেছি যে, তুর্কী শক্তির হাতে ১৩৯৬ খৃস্টাব্দে নাইকোপোলিসের ক্রুসেডে খৃস্টশক্তি পর্যুদস্ত হয়েছে। প্রকাশ্যে ঘোষিত পরবর্তী ক্রুসেডের এখানেই সমাপ্তি। অতঃপর রণক্ষেত্রে তুর্কী সাফল্য যখন উর্ধগতি, তখনই ক্রুসেডে বিজিত ইউরোপীয় প্রত্যাশা রেনেসা বা নবজাগরণের পথে নবউদ্যমে ধাবমান। ঐতিহাসিক হিট্টির মতে, "প্রাচ্য অপেক্ষা প্রতীচ্যের জন্য ক্রুসেড ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ"। কারণ পতিত অবস্থা থেকে প্রথমে মেরে ও পরে মার খেয়ে খেয়েই বাঁচার লক্ষ্যই জেগে উঠেছিল ইউরোপ। খৃস্টানদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্য প্রতীচ্যের মধ্যে যে পারস্পরিক জানাজানির পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়, তার ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পতিত ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার অনেক উপকরণের বিস্তৃতি ঘটে। সে সময়কার মুসলমানদের উন্নত জীবন চর্চার সঙ্গে পরিচিত না হলে খৃস্টান ইউরোপে রেনেসা বা নবজাগরণের সূচনা হত কিনা সন্দেহ। ঐতিহাসিক চিন্তাবিদ টয়েনবির মতে, "ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্মলাভ করেছে"। নবজাগ্রত ইউরোপীয়রা তখন উন্নত জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় অধীর। অধীর আগ্রহে আরম্ভ হয়েছে তাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, জীবন চর্চা। তারা তখন জীবনের তরী ভাসিয়েছে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথে। দুঃসাহসী জীবন সন্ধানীদের সামনে তরঙ্গায়িত সমুদ্র উন্মুক্ত করে দিয়েছে অশেষ সম্ভাবনার দ্বার। কলাম্বাসের জাহাজ পৌঁছেছে নতুন মহাদেশ আমেরিকার তীরভূমিতে। আর ভাস্কো-ডা-গামার অস্ত্রসজ্জিত বাণিজ্য পোত ভিড়েছে এসে ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে।

আর এদিকে ক্রুসেডে বিজয়ী মুসলিম শক্তি? পরবর্তী ক্রুসেড এ বিজয়ী মুসলিম তুর্কী শক্তি? শক্তিকে সংহত করে বিজয়কে অগ্রগতির পথে চালিত করার পরিবর্তে তারা রাজতন্ত্রীয় আবহে তন্ময় হয়ে থাকলেন। ফলে, মুসলিম উম্মার ভাগ্য যেখানে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সেখানেই সেভাবে রয়ে গেল। আর তারই পরিণামে যা ঘটবার, তাই ঘটল মুসলিম রাজতন্ত্রীদের অহমিকা লালিত সাম্রাজ্যে।

আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। তুর্কী সাম্রাজ্যের দুর্দশার দিনে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে আরম্ভ হল মুসলিম বিতাড়নের পালা। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের কথা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক এলিসি রেকলাস বলেনঃ "For many years has the cry 'Out of Europe' been ultered not only against the osmanli leaders, but also against the turks as a whole, and it is well known that this cruel wish has partly been fulfilled hundreds of thousands of muslim emigrants from greek thessaly Macedonia thrace and bulgria have sought refuge in Asia minor and these fugitives are only the remnants of the wretched people who had to leave their anceotral abodes; the exodus is still going one, and most likely, will not leave off till the whole of lower Rumelia has become European in language and customs. But now the Turks are being threatened even in Asia. A new cry arises, 'Into the Steppen' and to our dismay we wonder whether this wish will not be carried out too. Is no conciliation possible between the hostile races, and must the unity of civilisation be

obtained by the cacrifice of whole peoples especially those that are the most conspicuous for the noblest qualities uprightness, self repect, courage, and tobrance? অনেক বছর ধরেই 'ইউরোপ থেকে বেরোও' ধ্বনি ওসমানীয় নেতাদের বিরুদ্ধেই উচ্চারিত হচ্ছে না, উচ্চারিত হচ্ছে সামগ্রিকভাবে তুর্কীদের বিরুদ্ধেও এবং এটা সুবিদিত যে এই নির্মম বাসনা আংশিকভাবে কার্যকরও করা হয়েছে, শত শত হাজার মুসলিম দেশান্তরী গ্রীক থেসালি, ম্যাসিডোনিয়া, থ্রেস এবং বুলগেরিয়া থেকে এশিয়া মাইনরে আশ্রয় নিয়েছে আর এই পলাতকেরা হচ্ছে বিপুলসংখ্যক হতভাগ্যদের সামান্য অংশ মাত্র, যাদেরকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে পূর্বপুরুষের ভিটা-উদ্বাস্তুদের এই বহির্গমন এখনও চলছে, এবং নিম্ন রুমেলিয়া ভাষা ও রীতিনীতিতে ইউরোপীয় না হওয়া পর্যন্ত চলবার সম্ভাবনাই বেশি। আবার তুর্কীদেরকে এখন এশিয়াতেও ভয় দেখানো হচ্ছে। সেখানে উঠছে এক নতুন জিগির, 'স্তেপভূমিতে ফিরে যাও' এবং আতঙ্কের সঙ্গেই ভাবছি এ বাসনাও না পূরণ হয়ে যায়। শত্রুভাবাপন্ন জাতিগুলোর মধ্যে কি কোন সৌহার্দ স্থাপন কি সম্ভব নয় এবং সভ্যতার একত্ব (অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতার শুদ্ধতা) কি কোন সমগ্র জনগোষ্ঠীর বলিদানের বদলে অর্জন করতে হবে, বিশেষ করে সেসব জনগোষ্ঠীর ন্যায়পরতা, আত্মসম্মান, সাহস ও সহিষ্ণুতার মত মহত্তম গুণাবলী যাদের খুবই বিশিষ্ট"। (উধৃত প্রাগুক্ত পৃঃ ৫-৬)

ঐতিহাসিক গ্যাস্টন গেইলার্ডের মতে, এমনি পরিস্থিতি ইউরোপে বহুদিন ধরে চলে এলেও মধ্যযুগের আলোচ্য সময়টিতে তা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ঐতিহাসিক সমাজবিদ এলিসি রেকলাসের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বসফরাস প্রণালীর উভয় তীরে বহুদিন ধরে বসবাস করে আসছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে বহুবিধ মিশ্রণ। আনাতোলিয়ার দক্ষিণাংশে বসবাসকারীরা ছিল সেমেটিক জাতির লোক-যারা জাতিত্বে কথ্য ভাষায় এবং নামকরণে রক্ষা করে আসছিল নিজ বৈশিষ্ট্য। পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারীরা ছিল পারশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাদের মুখের ভাষাতেও ছিল পারশ্যে ব্যবহৃত প্রভাব। অন্যরা পরিচিত ছিল তুরাণীয় বলে। পশ্চিমাঞ্চলে ঘটেছিল আর্মেনীয় উচ্চভূমির লোকদের স্থানান্তরন আর থ্রেসীয়রা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সভ্যতার দিক দিয়ে সম্পর্কিত ছিল ইউরোপীয় লোকদের সঙ্গে। এই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা পরবর্তীতে গ্রহণ করেছিল ইসলাম। আর এই ধর্মীয় কারণেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সবাইকে ঢালাওভাবে তুর্ক বলে অভিহিত করা হল। "Thus the common name of Turks is wrongly given to some mostem elements of widely different origin, who are to be found in Rumelia and Turkey in ----, such as the Albanians, who are akin to greeks throghs their common anecstors the Pelasgians, the Bosnians, and the Moslem Bulgars, the offspring of the georgian and Circassian women who filled the harems, and the descendants of Arabs of even of African megroes. এভাবে রুমেলিয়া ও এশীয় তুরস্কে বসবাসকারী ব্যাপকভাবে বিসদৃশ বিভিন্ন উৎসের লোকদেরকে মুসলিম পরিচয়ের কারণে অন্যায়ভাবে 'তুর্ক' নামে দেওয়া হল। যেমন- আলবানীয়রা তারা একই পূর্বপুরুষের মাধ্যমে গ্রীকদের সমগোত্রীয় লোক; যেমন

পেলাসজীয়রা, বসনীয়রা এবং মুসলিম বুলগাররা হচ্ছে আরব, এমন কি আফ্রিকীয় নিগ্রোদের হারেমে গৃহীত জর্জীয় ও সারকাসীয় মহিলাদের সন্তান"। (প্রাগুক্ত পৃঃ ৬-৭)

প্রকৃত প্রস্তাবে, ষষ্ঠ শতকে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে পুরা মধ্যযুগব্যাপী খৃস্টধর্মী ইউরোপ যে জীবনাদর্শকে ভয় ও তারই সঙ্গে প্রচণ্ড ঘৃণা করে এসেছে, তা হচ্ছে ইসলামী জীবনাদর্শ। তা সেই ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে সর্বমানবের মুক্তিদিশারী ইসলামের বিপ্লবী রূপ থাকুক আর নাই থাকুক। (আজও কি এই মনোবৃত্তি আরও নগ্ন ও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত নয়? নিয়ম নীতি, মহত্ত্ব, মানবতা সব কিছু নির্লজ্জভাবে বিসর্জন দিয়ে খৃস্ট ইউরোপ ও তার মিত্ররা কি খোলাখুলিই বসনিয়া-হারজেগোভিনাকে দানবীয় উল্লাসে ধ্বংস করতে চাইছে না? তার পরবর্তী লক্ষ্যে কি বৃহত্তর ইউরোপ অন্যান্য মুসলিম জনপদ ও রাষ্ট্রের উপর নিপতিত নয়?) মুসলিমদের প্রতি তার তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহার কারণ হয়তো নিহিত রয়েছে অটোম্যান শক্তির হাতে, সেই মধ্যযুগে হেনস্তা হওয়ার মধ্যেই।

অথচ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এলিসি রেকলাসের কথায়ঃ "Turkish domination is merely outward, and does not reach, so to say, the inner soul, so in many respects, various ethnic groups in Turkey enjoy a fuller automony than in the most advanced countries of Western Europe. তুর্কী কর্তৃত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র বাহ্যিক এবং তা বলতে গেলে, (মানুষের) অন্তরাত্মায় পৌছায় না, তাই অনেক দিক থেকেই তুরস্কে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ উন্নত দেশের তুলনায় পূর্ণতর স্বশাসনাধিকার ভোগ করছে"। (প্রাগুক্তঃ পৃ-৭)

ঐতিহাসিক উবিসিনি ও স্যার এইচ বুলওয়ারের বরাত দিয়ে ঐতিহাসিক গ্যাস্টন গেইলার্ড বলেনঃ "As to freedom of faith and conscience, the prevailing religion in Turkey grants the other religions a tobrance that is seldom met with in Christian countries. ধর্মবিশ্বাস ও চেতনার স্বাধীনতা বিষয়ে তুরস্কে কর্তৃত্বকর ধর্ম অন্যান্য ধর্মকে এত সহনশীলতা দান করে যা খৃস্টীয় দেশগুলোতে বড় একটা দেখাই যায় না"। (প্রাগুক্ত পৃঃ ৭) (এসব বক্তব্য কিন্তু আজকের তুরস্কের সম্বন্ধে নয়, বক্তব্যগুলো সেদিনকার তুরস্ক সম্বন্ধে)। অথচ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনপদ থেকে আগত অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী লোকদেরকে বিতাড়িত করার কোন স্পৃহা জাগল না ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের মনে, জাগল শুধুমাত্র ইসলাম অনুসারীদের বিতাড়নের বেলায়। ইউরোপ তো তার পতিত অবস্থায় চরমভাবে মার খেয়েছিল তথাকথিত বর্বরদের হাতেও।

এখানে যুদ্ধকালীন গোপন চুক্তিগুলোর উপর কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। "As early as 1916 the Allies seen to have come to an agreement over the principle of the partition of the Ottoman Empire. In their answer to president wilson they mentioned among their war aims to enfranchise the populations enslaved to the sanguinary turks, and to drive out of Europe the Ottoman empire, which is ducidedly alien to western civilation.

According to the conventions about the impending partition of turkey concluded between the allies in april and may, 1916, and August 1917, Russia was to take possession of the whole of Armenia and eastern anatolia, constantinople and the straits. In virtue of the treaty sugned in london on may 16, 1916 fixing the boundaries of two zones of british influence and two zones of french influence, france and england were to share Mesopotomia and Syria, France getting the mordern part with Alexandertha and mosul and England the southern part with haifa and Baghdad. According to the treaty of august 21, 1917. Italy was to have western Asia Minor with Smyrna and Adalia. Palestine was to be internationalised and Arabia raised to the rank of an independent kingdom. ১৯১৬ খৃস্টাব্দেই মিত্রপক্ষ অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিভক্তির নীতিতে একটা মতৈক্য এসেছিল বলে মনে হয়। প্রেসিডেন্ট উইলসনকে দেওয়া তাদের উত্তরে যুদ্ধের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে তারা উল্লেখ করেছিলেন রক্তলোলুপ তুর্কীদের কাছে ক্রীতদাসে পরিণত জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করতে এবং অটোম্যানদেরকে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করতে. যারা ছিল নিশ্চিতভাবেই পশ্চিমা সভ্যতার বিরোধী।

১৯১৬' র এপ্রিল ও মে তে এবং ১৯১৭' র আগস্টে মিত্রদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়ার পাওয়ার কথা ছিল সমগ্র আর্মেনিয়া এবং পূর্ব আনাতোলিয়া, কনস্টান্টিনোপল ও প্রণালীপুঞ্জ। ১৯১৬ খৃস্টাব্দের মে ১৬ তারিখে লন্ডনে সম্পাদিত চুক্তি বলে যাতে বৃটিশ প্রভাবিত দুটি অঞ্চল এবং ফরাসী প্রভাবিত দুটি অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা হয়, তাতে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের ভাগ করে পাওয়ার কথা ছিল মেসোপোটেমিয়া ও সিরিয়া, ফ্রান্স পাবে উত্তরাংশ ও তার সঙ্গে আলেকজান্দ্রেতা ও মসুরের উত্তরাংশ এবং ইংল্যান্ড পাবে দক্ষিণাংশ ও তার সঙ্গে হাইফা ও বাগদাদ। ১৯১৭' র আগষ্ট ২১ এর চুক্তি অনুযায়ী ইতালীর পাওয়ার কথা স্মার্ণা ও আদালিয়াসহ পশ্চিমাঞ্চলীয় এশিয়া মাইনর।

প্যালেস্টাইনকে বিভিন্ন জাতির অধীনে আন্তর্জাতিকতায়ন করা হবে এবং আরবকে উন্নীত করা হবে স্বাধীন রাজ্যের পর্যায়ে"। (প্রাগুক্ত পৃ- ৪৩)

কিন্তু তুর্কীদের ভাগ্যই বলতে হবে, রাশিয়ায় পরিবর্তনের ফলে এবং বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণে ১৯১৬ ও ১৯১৭ খৃস্টাব্দের চুক্তিতে পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। প্রেসিডেন্ট উইলসনের ঘোষণা অনুসারে-"The Turkish parts of the present Ottoman Empire should be assured of secure Sovereignty but the other nations now under Turkish rule should be assured security of life and autonomous development. বর্তমান অটোম্যান সাম্রাজ্যের তুর্কী অংশগুলোর নিরাপদ সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দেওয়া উচিত হবে। কিন্তু বর্তমানে তুর্কী শাসনভুক্ত অন্যান্য জাতিগুলোর জন্য থাকা উচিত হবে জীবনের নিরাপত্তা ও শাসনিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা"। প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৩-৪৪) এর ফলে তুর্কীস্তানের ভাগাভাগিতেও আসে কিছু পরিবর্তন। আর তুর্কী সাম্রাজ্য পরিণত

হয় সাদামাটা তুরস্কে।

তুর্কী সাম্রাজ্যকে ভাঙ্গতে গিয়ে মিত্রপক্ষকে অনেকদিন ধরে অনেক কিছুই ভাবতে হয়েছিল। "The Turks retained the fighting qualities which had terrified christendom four centuries earlier. Ultimately these were no match for the overwholing technical and ovganisational susperiority of the Allies- Although they did ensure that the Turkish heartland of Anatolia was preserved from dismemberment when the war was over. But the weakness of the Ottoman Empire as a whole was the animonity between turks and the majority of its subjects, the Arabs. It was this weakness that the Allies were ready and eager to exploit. তুর্কীরা তাদের সেই রণনৈপুণ্য ধরে রেখেছিল যা চার শতাব্দী আগে খৃষ্টীয় জগতকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। চূড়ান্তভাবে এসব গুণ মিত্রপক্ষের অপরিমেয় প্রযুক্তি ও সাংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্বের কোন সমকক্ষ ছিল না- যদিও মিত্রপক্ষ নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে যুদ্ধ শেষে আনাতোলিয়ায় তুর্কী মর্মভূমিকে বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করা হবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তুর্কী এবং তাদের অধিকাংশ প্রজা আরবদের মধ্যেকার শত্রুতাই ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের মূল দুর্বলতা। এই দুর্বলতাকেই মিত্রপক্ষ কাজে লাগাতে তৈরী ছিল। "(The Ottoman Empire and its seccessors, peter mansfield the making of the 20th country series, 1976, p.35) । এবং কাজে লাগিয়েছিল তারা। সাম্রাজ্যের অধিকারী তুর্কী এবং আরবদের মধ্যে শত্রুতাবোধ অবশ্যই ছিল কিন্তু সেই শত্রুতাবোধটুকুকেই শুধুমাত্র কাজে লাগানো হয়েছিল অথবা আরবদের জাতীয়তাবোধকে প্রবলভাবে উসকে দিয়ে তারপর তা কাজে লাগানো হয়েছিল? দুর্বল হলেও মুসলিম উম্মার খেলাফতরূপী এই ভয়ঙ্কর শত্রুকে যেভাবেই হোক খৃস্ট জগৎ ধ্বংস করতেই চেয়েছিল, তা কি অস্বীকার করা যায়? এই লক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কনফারেন্স তো ছিল প্যাঁচালো যুক্তি ও কথামালার আসর মাত্র।

এই সত্যতা হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন ইয়ং টার্কদের উদীয়মান নেতা মুস্তফা কামাল পাশা। তাই ভারতীয় খেলাফত সংগ্রাম কমিটির নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী যখন কনফারেন্সগুলোর ফাঁকে তাঁকে মুসলিম জগতের খলিফা পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান, তখন কামাল পাশা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে যে- 'খেলাফত ইতোমধ্যে একটি মৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে; তবে সময় ও সুযোগ এলে বিভিন্ন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র নিয়ে লীগ অব মুসলিম নেশানস করা যেতে পারে'।

মোদ্দা কথা, পরবর্তী ক্রুসেড এ শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হল ইউরোপীয় খৃস্ট শক্তিই এবং আরও পরবর্তী ক্রুসেড এর ফলাফলও এর থেকে ভিন্ন নয়।

স্বাগত ভাষণ

ইসলামের মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনায় পৃথিবীর প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন ৬২৪ খৃস্টাব্দে। ওই সময়ে পৌত্তলিক ইহুদী খৃস্টান ও মুসলমান সকলের সম্মতি ক্রমে প্রণীত মদীনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত রাষ্ট্রীয় সংবিধান। ঐতিহাসিক মূইর এর মতে, তা ছিল হযরতের অসামান্য মাহাত্ম্য ও অপূর্ব মননশীলতার স্বাক্ষরবাহী এবং শুধু তখনকার যুড়েই নয়, বরং সর্বযুগে মানবতাকে মর্যাদা দানের এক দলিল। এ দলিল যখন প্রণীত ও স্বাক্ষরিত হয় তখনকার আরবের অবস্থা কেমন ছিল?

ইসলামের অভ্যুদয় যুগের পূর্ব যুগকে বলা হয় আইয়ামে জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ। এর ব্যাপ্তিকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। নিকলসন অজ্ঞতার যুগকে ইসলামের আবির্ভাব পর্বের এক শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ । হিট্টি তাহার অভিমত সমর্থন করিয়া বলেন যে, নবী ঐশী কেতাব ধর্মীয় চেতনার অবর্তমানে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নুবয়ত প্রাপ্তির এক শতাব্দী পূর্বে (৫১০-৬১০ খৃঃ) আরব জাতির যে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনেতিক অধঃপতন ঘটে উহাকেই 'অজ্ঞতার যুগ' বলা হয়। ----ঐতিহাসিক সীবনের মতে অজ্ঞতার যুগে আরবে প্রায় ১৭০০ যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়। প্রাক ইসলামিক যুগে আরবের সামাজিক জীবন পাপাচার, দুর্নীতি, কুসংস্কার, ঘৃণ্য আচার, অনুষ্ঠান ও নিন্দনীয় কার্যকলাপে কলুষিত ও অভিশপ্ত হইয়া পড়ে। .... অরাজকতাপূর্ণ আরব দেশে নারীর কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না, তাহারা অস্থাবর ও ভোগবিলাসের সামগ্রীরূপে গণ্য হইত। বৈবাহিক বন্ধনের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করিয়া পুরুষগণ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারিত এবং অবৈধ প্রণয়ের মত বিবেকবর্জিত কার্যেও তাহারা লিপ্ত হইত---। ব্যভিচার সমাজ জীবনকে পাপ পঙ্কিলতার শেষস্তরে এরূপ নিমজ্জিত করে যে স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রী-পুত্র-সন্তান লাভের আশায় পর পুরুষের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইত। .... স্মরণাতীত কাল হইতে আরব সমাজে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। ...... পণ্যদ্রব্যের মত দাস-দাসীদের হাটে-বাজারে বিক্রি করা হইত। ..... দাসকে নির্মমভাবে নির্যাতন এবং দাসীকে উপপত্নী হিসাবে ব্যবহার করা হইত। দাস-দাসীদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। .....প্রাক ইসলামী সমাজ জীবনের সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য প্রথা ছিল নবজাত কন্যা সন্তানকে নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত কবর দেওয়া----- অনাচার, নৈতিক অবনতি, ব্যভিচার আরব সমাজকে কলুষিত করে। লম্পট ও দুশ্চরিত্র পুত্র পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিত। ..... মদ্যপান, জুয়াখেলা, লুণ্ঠতরাজ, নারীহরণ, কুসিদ প্রথা প্রভৃতি চরম নৈতিক অধঃপতনের স্বাক্ষর তাহাদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। ..... কুসিদ প্রথা এরূপ চরম পর্যায়ে পৌছায় যে স্বর্ণকারী অর্থ পরিশোধ করিতে সক্ষম না হইলে মহাজন তাহার স্ত্রী এবং সন্তানদের হস্তগত করিয়া দাস-দাসীরূপে বিক্রয় করিত। ..... অজ্ঞতার যুগে আরবে চার ধর্মাবলম্বী লোক বসবাস করিত পৌত্তলিক জড়পূজা ও অংশীবাদী গোষ্ঠী ইহুদী-খৃস্টান ও হানিফ। আরবের অধিকাংশ লোকই ছিল ধর্মহীনতা, ঘৃণ্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, জড়-পুজা, সৌর-

পূজায় লিপ্ত ছিল। .... (ইসলামের ইতিহাস, ডাঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬, পৃঃ ৩৭-৫০)

এমনি একটা নৈতিকতা বিহীন অমানুষিক সাংস্কৃতিক পেক্ষাপটে ইসলামের মহানবী (সাঃ) সংঘটিত করেন অভূতপূর্ব এক বিপ্লব-যার ফলে তিনি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন সকল মুসলমানকে, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন সকল ধর্মানুসারীর মধ্যে রক্ত বা কৌলীন্যের পরিবর্তে ধর্মীয়ভিত্তিতে গঠন করেন এক জাতি যার অন্তর্ভুক্ত সকল মানুষই সমান এবং যার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে বিবেচিত হলেন তারাই যারা আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত এবং ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকামী, যাতে নারী পুরুষের সমানাধিকার স্পষ্টরূপে স্বীকৃত, নিষিদ্ধ যাতে সর্বরকম শোষণ ও কুসিদ ব্যবস্থা এবং দাসপ্রথার উচ্ছেদে যা বদ্ধপরিকর। সর্বোপরি সকল মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি যার লক্ষ্যের আকাশে ধ্রুবতারা।

নবীজি (সাঃ) এর ওফাতের পর এল খোলাফায়ে রাশেদা বা সত্যপন্থীদের খেলাফত কাল, যে কালে রাজ্য ও সমাজ পরিচালনায় সত্যপন্থী চার খলিফা সমুন্নত রাখলেন ইসলামী আদর্শের পতাকা। কিন্তু ৬৬১ খৃস্টাব্দে সেই ইসলামী আদর্শের খেলাফত বংশভিত্তিক রাজতন্ত্রীয় আকাঙ্ক্ষার চোরাবালিতে পথ হারাল। প্রতিষ্ঠিত হল উমাইয়া খেলাফত। ফেলাফত শব্দটা অপরিবর্তিতই থাকল; কিন্তু ইসলামী প্রজাতন্ত্রে নির্বাচিত খলিফার পরিবর্তে মসনদে আসীন হলেন বংশীয়ভাবে মনোনীত খলিফা। রাজতন্ত্রীয় ধারায় চলতে থাকল এই বংশীয় খেলাফতের পথপরিক্রমা। প্রথমে দামেস্ককে রাজধানী করে ৬৬১ থেকে ৭৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত উমাইয়া খেলাফত, পরে বাগদাদের রাজধানী করে ৭৫০ থেকে ১২৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত আব্বাসীয় খেলাফত কাল।

উমাইয়া খেলাফতের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি ছিল ইসলামকে পার্থিবকরণ যার ফলে ইসলামী আদর্শের খলিফা বা জনপ্রতিনিধি রূপান্তরিত হলেন মালিক অথবা রাজায়। অন্য বৈশিষ্ট্যটি ছিল ইসলামী আদর্শানুযায়ী সাম্য-মৈত্রী ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবর্তে রক্ত ও গোত্রীয় স্বার্থের পথ ধরে আরব জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি। এসবের পরিণামে শিয়া, খারিজী এবং পরে মাওয়ালী ও আব্বাসীয় উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

যে আদর্শের ধ্রুবতারা লক্ষ্যে নিয়ে অভ্যুদয় ঘটেছিল ইসলামের, যে আদর্শের প্রয়োগ-রূপ দেখিয়ে গিয়েছিলেন রহমতুল্লিল আলামীন বা সারাবিশ্বের জন্য রহমতরূপী ইসলামি মহানবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারী সত্যপন্থী চার খলিফা তার উপর আপতিত হল স্বার্থ ও অহমিকাবোধের কালো মেঘ। ফলে, সকল মানুষের কল্যাণকামী খেলাফতের স্থলে প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রীয় খলিফাদের চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন করে রাখল রাজ্য-রাজা রাজধানীর জৌলুষময় বাস্তবতা। পৃথিবীর ইতহাস সাক্ষ্য দেয় যাদের চিন্তা-চেতনা থেকে মানবকল্যাণ ও মানব-মুক্তির ধ্যান-ধারণা দূরীভূত হয়ে যায় তাদের রাজ্য রাজধানী অদৃশ্য হয়ে যায় কালের অতল গহবরে, বজায় থাকতেও পারে শুধুমাত্র রাজা খেতাবের করুণ স্মৃতি। তথাকথিত ইসলাম অনুসারী

শক্তিমানেরাও যখন রাজ্য-রাজা রাজধানীর এই মরীচিকাময় পথে পা বাড়ালেন, তখন তাদের ভবিষ্যৎও হয়ে উঠল পৃথিবীর সর্বকালীন অন্যান্য রাজ্য-রাজা রাজধানীর অনুগামী। এসব রাজ্য-রাজা রাজধানী সম্বন্ধেই প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ইবনে খালদূনের পর্যবেক্ষণী সিদ্ধান্ত হলঃ ব্যক্তি ও জাতির জীবনে যে তিনটি অপরিহার্য স্তর রয়েছে তা হল (ক) উত্থান, (খ) ক্রমবিকাশ ও উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ এবং (গ) অধঃপতন ও বিলুপ্তি। তাঁর মতে, সাধারণত কোন রাজবংশের গৌরবজনক স্থিতিকাল মোটামুটি একশ' বছর।

ইবনে খালদূনের এ তত্ত্বটি উমাইয়া খেলাফতের বেলায় যেমন, তেমনি আব্বাসীয় খেলাফতের বেলাতেও প্রযোজ্য হয়েছে বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। প্রায় ৯০ বছর খেলাফতী করে উমাইয়ারা তো সে তত্ত্বকে সত্য বলে প্রমাণ করেছেনই, আব্বাসীয়দের পাঁচ শতাধিক বছরের বেলায় সন্দেহের উদয় হলে স্মরণ করতে হবে যে, ৭৫০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় খেলাফত ৮৪৭ খৃস্টাব্দের পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তঃসারশুন্য হয়ে পড়ে। কারণ, ৮৪৭ থেকে ১২৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আব্বাসীয় খলিফাগণ ক্রমে ক্রমে প্রকৃত ক্ষমতা হারিয়ে আমীর উজীরদের ক্রীড়নকে পরিণত হতে থাকেন। ঐতিহাসিক বার্ণার্ড লুইসের মতে-"খলিফাগণ বহুদিন পূর্বেই প্রকৃত ক্ষমতা হারান। সুলতানগণ রাজধানীতে ও প্রদেশসমূহে প্রকৃত ক্ষমতাধিকারী ছিলেন; সুলতানগণ খলিফাদের ধর্মীয় সুযোগ সুবিধাগুলিও অন্যায়পূর্বক ভোগ করতে থাকেন। মোঙ্গলগণ একটি মৃত প্রতিষ্ঠানের ভূতকে ধ্বংস করে"। বার্ণার্ড লুইসের এই মতামত ছিল ১২৫৮ খৃস্টাব্দে হালাকু খানের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংসের পর। ঐতিহাসিক পিটার ম্যানফিল্ড বলেনঃ "The Abbasid caliphs retained their title as overlords, but the middle of the ninth century they had already lost most of their power to provincial governors who were frequently Turkish mercenasiso. It was the Turks, as central Asian converts to Islam, who ultimately provided the strong political frameword which the Islamic Empire established by the Arabs had preriously lacked. আব্বাসীয় খলিফাগণ অধিরাজ হিসাবে তাঁদের উপাধি সংরক্ষণ করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নবম শতকের মাঝামাঝি থেকে তাঁরা সেসব প্রাদেশিক শাসকদের হাতে তাঁদের অধিকাংশ ক্ষমতাই হারিয়ে বসেন যাদের অনেকেই ছিলেন ভাড়াটে সৈনিকপুরুষ। মধ্যএশিয়া থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত এসব তুর্কীই শেষ পর্যন্ত খেলাফতের যোগান দিল জোরালো রাজনৈতিক কাঠামো, আগে আরবদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সাম্রাজ্যে যার ছিল (একান্ত) অভাব"। (The Ottoman Empire and its Successors peter mansfield the making of the 20th country, 1976 p.4)

ইসলামী দুনিয়ায় এই তুর্কীরা প্রথমে প্রবেশ করে যুদ্ধবন্দী দাস হিসাবে এবং পরে ভাড়াটে অভিযানকারী সৈনিকপুরুষ হিসাবে। ১২৫৮ খৃস্টাব্দের মোঙ্গল আক্রমণ আব্বাসীয় খেলাফতের অবসানই রচনা করলা না শুধু, এশিয়া মাইনর থেকে সেলজুক সালতানাতকেও ধ্বংস করে দিল। কিন্তু এই ধ্বংসস্তুপের উপর ইসলামে ধর্মান্তরিত অন্য এক তুর্কী প্রধান ওসমান প্রতিষ্ঠিত করলেন ভবিষ্যৎ তুর্কী সাম্রাজ্যের ভিত।

তিনি ও তাঁর বংশধরেরা কালক্রমে সমগ্র এশিয়া মাইনরেই শুধু স্বীয় কর্তৃত্বের বিকাশ ঘটালেন না, নিজেদের আধিপত্য চাপিয়ে ছিলেন বলকান অঞ্চলেও। তারপর একদিন ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে বিজেতা বলে অভিহিত তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ ইউরোপীয় বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে অধিকার করে নিলেন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল।

তুর্কীদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটি আরম্ভ করেন তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ। ১৫১৫ খৃস্টাব্দে পারশ্য আক্রমণ করে তিনি তা দখল করে নেন। "While he was in Cairo a deputation from the sharif of Mecca came to offer him the keys of the Holy city and the title of calph of islam, although this was of lesser importance at the time, and it was not until the eighteenth century that his successors made use of the claim to universal leadership of the Muslim world. কায়রোতে অবস্থান কালে মক্কার শরীফ এর কাছ থেকে এক প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রদান করে পবিত্র নগরীর চাবি এবং পবিত্র স্থানসমূহের হেফাজতকারী উপাধি। তিনি ইসলামের খলিফা উপধিত্ব গ্রহণ করেন, যদিও সে সময়ে তার গুরুত্ব ছিল কম; কেবলমাত্র আঠার শতকেই তাঁর বংশধরেরা মুসলিম দুনিয়ার বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের দাবীকে কাজে লাগান।

তুর্কীদের সুলতান খলিফা প্রথম সেলিমের উত্তরাধিকারী সুলায়মান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ভূমধ্য সাগরে গড়ে তোলেন সর্বোৎকৃষ্ট এক নৌবহর। তাঁর শাসনাধিপত্য বর্ধিত করেন উত্তর আফ্রিকার আলজেরিয়া, তিউনিস, ত্রিপলি এবং ওরানে। এই মহামতি সুলতানের মৃত্যুর পর তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় মরক্কো ছাড়া প্রায় সমগ্র আরব ভূখণ্ড। বাস্তবিকপক্ষে, ভারতবর্ষের মুঘল রাষ্ট্র ছাড়া ওই সময়কার সকল সুন্নী মুসলিম রাষ্ট্রই তখন তুর্কী সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রাধীন; ষোল শতকের প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠিত সাফাভী শাসনাধীন শিয়া মুসলিম রাষ্ট্র পারশ্যই তাদের একমাত্র বিরোধী পক্ষ। অতঃপর মেসোপোটেমিয়া (ইরাক) কর্তৃত্ব নিয়ে দুই শতক ধরে চলতে থাকে তুর্কী ও সাফাভী শক্তির বিরোধ ও সংঘর্ষ। অবশেষে বিজয়ী হয় তুর্কী শক্তি।

আরবরা ছাড়া আরবের বাইরের ইসলাম অনুসারী তুর্কী শক্তি কর্তৃক মুসলিম উম্মার নেতৃত্ব গ্রহণে আরবদের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, কি হয়েছিল তার পরিণাম?

এখানে মনে জাগে আরব বহির্ভূত জনপদে আরবায়ন Arabisation ও ইসলামায়নের (Islamisation) কথা। সেই আরবায়নের পেছনে কার্যকর ছিল দুটি উপাদান। একটি ভাষাগত, অন্যটি জাতিগত। আর ইসলামায়নের পেছনে কার্যকর ছিল ইসলামী আদর্শ ও তদুসারী জীবন বিধান। এই আরবায়ন ও ইসলামায়ন যথেষ্ঠ রকমে সম্পর্কিত থাকলেও ইসলামায়নের প্রভাব ক্ষেত্র ছিল বিশাল। আরব ভূখণ্ড ছাড়িয়ে ইসলাম পারশ্য, তুরস্ক, পূর্ব-মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা, চীন, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এই বিস্তৃতিতেও আরবায়ন ও ইসলামায়নের সম্পর্ক বজায় থাকল। "Because of the back of racial barriers in Islam there was consideraly racial intermingling especially in Persia, Turkey and parts of black Africa. The Turkish and Persian languages (especially Persion) contain many Arabic loan words, and Persian is still within in Arabic, and the twin holy cities of Islam Mecca and Medina are in Arabic. It is one of the duties of a Muslim believer to make to pilgrimage (hojj) to them at least once in his life time. ইসলামে জাতিগত বাধা না থাকার কারণে (বিভিন্ন জাতির) মুসলমানদের মধ্যে হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ সংমিশ্রণ- বিশেষ করে পারশ্য তুরস্ক ও কৃষ্ণ আফ্রিকার লোকদের মধ্যে। তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় (বিশেষ করে ফার্সী ভাষায়) রয়েছে অনেক ধার করা আরবী শব্দ এবং ফার্সী ভাষা আজও লেখা হয় আরবী লিপিতে এবং ইসলামের দুটি পবিত্র জোড়া নগরী মক্কা ও মদীনা রয়েছে আরবে। একজন মুসলিম ধর্মবিশ্বাসীদের অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে জীবদ্দশায় অন্তত একবার ওই নগরীদ্বয়ে তীর্থযাত্রা বা হজ্ব করা" । (ibid, pp, 3-4) তদুপরি রয়েছে মুসলমানদের প্রাত্যহিক ধর্মীয় আবশ্যিক কর্তব্য পালনে আরবী ভাষায় দোয়া কালামের বহুল ব্যবহার। এসব কারণে পৃথিবীর সর্বত্র সকল জাতির মুসলমানরা বেশ কিছুটা আরবায়িত তো বটেই। আর সেটা ভাষা ও আদর্শগতভাবে। অর্থাৎ আরবায়ন ও ইসলামায়ন এক্ষেত্রে পাশাপাশি প্রভাবশীল হয়ে আছে।

খোলাফায়ে রাশেদা পর্যন্ত আরবের বাইরে রাজ্যজয়ের মাধ্যমে ইসলামের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ইসলামায়নের প্রশ্নটাই ছিল মুখ্য। একটি আদর্শভিত্তিক মানব মুক্তির লক্ষ্যাভিসারী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠাই ছিল সেসব বিজয়ের লক্ষ্য। কিন্তু পরবর্তীতে বংশগত রাজতন্ত্রীয় খেলাফত কালে?

ঐতিহাসিক বার্ণার্ড লুইসের মতে, উমাইয়া খেলাফত ছিল আরবী খেলাফত বা সাম্রাজ্য আর আব্বাসীয় খেলাফত ছিল অনেকটাই ইসলামী খেলাফত বা সাম্রাজ্য। এবং ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, আব্বাসীয় খেলাফত ইসলামী খেলাফত বা সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল মধ্য নবম শতকের পরে প্রধানত প্রশাসনিক বাস্তবতার জন্য। এতদসঙ্গে এ-ও ভাবা যায় যে, এ বাস্তবতাকে হৃষ্টচিত্তে আরব অনারব সকল মুসলমানেরই মেনে নেওয়া উচিত ছিল, তেমনি উচিত ছিল আরব রাজ্যগুলোর প্রতি অনারব খলিফাদের আগ্রাসী সাম্রাজ্যিক ব্যবহারকে সংযত করা। ইসলামকে সব কিছুর উপরে স্থান দিয়ে আরব-অনারব কেউই এ উচিত কাজটি সজ্ঞানভাবে করেন নি; এবং করেননি বলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম উম্মা হারাল তার খেলাফত বা সাম্রাজ্য। এ ছিল গণতান্ত্রিক ইসলামী আদর্শ ছেড়ে বংশগত রাজতন্ত্রীয় পথে চলবার পরিণাম।

ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রীট দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের মাধ্যমে ইউরোপে তুর্কী আধিপত্য তাঁর শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছে যায়। তখন তার অধিকারভুক্ত হয়েছে আজকের

রোমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া, আলবানিয়া ও সাইপ্রাস এবং হাঙ্গেরীর অংশবিশেষ পোল্যান্ড ও রাশিয়ার ক্রিমীয় উপকূল। আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত ইউরোপে তুর্কী অধিকারের সীমানা অপরিবর্তিত থাকলেও তার ভেতরকার শক্তিতে ইতোমধ্যেই ধরেছিল ক্ষয়িষ্ণুতার ঘুন। কারণ ছিল পরবর্তী তুর্কী শাসকদের চরম অযোগ্যতা। আর তুর্কী শাসকদের এই অধঃপতনের পাশাপাশি তাদের ইউরোপীয় প্রতিপক্ষ হয়ে চলছিল ক্রমবর্ধিত শক্তির অধিকারী। এবং "While the Ottoman Empire decayed from within the pressuress upon it from outside were becoming more powerful and insistent. A new phase in the long struggle between Islam and western christendom was beginning. The first which had started with the Arab conquests, had lasted for about one thousand years and had generally been to Islams advantage. Although the tide began to turn in spain and sicily in the eleventh century Islam was the more powerful around the southern and eastern shores of the mediterranean. The medieval christian for the recovery of the holy land ended in failure, and for at least the first half of the thousand year period Islam was the superior civilisation. Abbasid Baghdad was a great centry of civilisation at a time when western Europe was in the Dark Ages. The final loss of spain to the Catholic kings at the end of the fifteenth century was offset by the Turkish conquest of Constantinople in 1453 and the ottoman expansion into Christian south eastern Europe. অটোম্যান সাম্রাজ্য যখন ভেতর থেকে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছিল, তখন বাইরে থেকে তার উপর চাপ হয়ে উঠছিল আরও শক্তিমন্ত ও দৃঢ়চেতা। আরম্ভ হতে যাচ্ছিল ইসলাম ও প্রতীচ্য খৃস্টানদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের এক নতুন পর্যায়। প্রথম পর্যায়টি আরব বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছিল যার ব্যাপ্তিকাল ছিল প্রায় হাজার বছর, আর ফলাফল গিয়েছিল ইসলামেরই সপক্ষে। একাদশ শতকে সেই (বিজয়ের) জোয়ার স্পেন ও সিসিলিতো আরম্ভ করেছিল তার মোড় পরিবর্তন, তবুও ভূমধ্যসাগরীয় দক্ষিণপূর্ব তীরের চারপাশে ইসলামই ছিল অধিক শক্তিধর। পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য মধ্যযুগীয় খৃস্টান শক্তির ক্রুসেড ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং সেই হাজার বছরের প্রথমার্ধে অন্ততঃ ইসলামই ছিল উন্নততর সভ্যতার অধিকারী। প্রতীচ্য-ইউরোপ যখন অন্ধকার যুগে অবস্থিত তখন আব্বাসীয় বাগদাদ ছিল সভ্যতার মহান কেন্দ্রভূমি। পনের শতকের শেষে ক্যাথলিক রাজাদের হাতে স্পেনের পতনের সমতা সাধন করা হয়েছিল ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে তুর্কীদের কনষ্টান্টিনোপল বিজয় এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় খৃস্ট ইউরোপে অটোম্যান সম্প্রসারণের মাধ্যমে। (ibid, p.6)

বাণিজ্য শক্তি হিসাবে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের অধিকতর সাফল্যে উত্তরণ ছিল তুর্কীদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ষোল শতকে উত্তমাশা অন্তরীণ ঘুরে প্রাচ্যের নতুন বাণিজ্য পথ আবিষ্কার ছিল পর্তুগীজদের এক অনন্য কৃতিত্ব, এবং সতের শতকে ওলন্দাজ ও বৃটিশ ফরাসী শক্তির এশিয়া আগমনও

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ইউরোপের খৃস্টীয় শক্তিসমূহের এমনি বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক কথায়, ইউরোপীয় শক্তিসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন রেনেসাঁ জনিত ক্রমোন্নতির পথে দ্রুতগতি লাভ করেছে, তুর্কী সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ বিপর্যয়ের কারণগুলোর মধ্যে ক্যাপিবুলেনান প্রথা ছিল অন্যতম। এ প্রথার মাধ্যমে তুর্কী সাম্রাজ্যে ইউরোপীয় খৃস্টান-ইহুদী ব্যবসায়ীরা ট্যাক্স সংক্রান্ত সুবিধা বা রেয়াত লাভ করত। তুর্কী সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিরকালে এ প্রথায় উপকৃত হত উভয় পক্ষই। কিন্তু তুর্কী সাম্রাজ্যের দুর্দিনে প্রতিটি যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইউরোপীয়রা আরও সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে নতুন শর্ত আরোপ করত। ফলে, ক্যাপিচুলেশন প্রথা তুর্কী সাম্রাজ্যের জন্য অভিশাপে পরিণত হল। ঠিক এমনটিই ঘটেছিল ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যেও। সম্রাট আওরঙজেবের মৃত্যুর পর অযোগ্য মুঘল সম্রাটদের আমলে ইউরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীগুলো বাণিজ্য করে রেয়াতের এমনি সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল যার ফলে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল দেশীয় ব্যবসায়ীরা; কারণ দেশীয় ব্যবসায়ীদের বেলায় এই কর রেয়াতের বিধান ছিল না ক্যাপিচুলেশন প্রথায় যেমন ছিল না তুর্কী ব্যবসায়ীদের কর রেয়াতের বিধান।

ইউরোপীয়দের মত রাষ্ট্র পরিচালনার বিধি-বিধানকে আধুনিকায়নের জন্য তানজিমাত নামে গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনাও নানা কারণে সাফল্য লাভ করতে পারে নি। তার ফলে তুর্কী সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের আশা ও নিরাশার অন্ধকারেই ডুবে থাকল। এমনি অবস্থায় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই দেখা দিল নানাবিধ বিদ্রোহাত্মক সমস্যা। সেনাবাহিনীতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছিল পুরনো ধাঁচের। অথচ ততদিনে ইউরোপীয়রা তাদের সেনাবাহিনীকে নতুন ব্যবস্থায় সাজিয়ে নিয়েছে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত তাদের বাহিনী হয়ে উঠেছে সময়োপযোগী । পরবর্তী কয়েকজন সুলতান খলিফা সেনাবাহিনীতে ফরাসী প্রথার প্রবর্তন চেয়েছিলেন, কিন্তু জোনসারিদের বিরোধিতার ফলে তা সম্ভব হল না। উল্লেখ্য যে, এই অতিরিক্ত সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছিল ধর্মান্তরিত খৃস্টান তরুণদের দিয়ে এবং ততদিনে তারা সাম্রাজ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তেমন মাথা না ঘামিয়ে ইচ্ছামত শাসক তৈরিতে তারা ব্যস্ত থাকত বেশি। পরিণতিতে তা সাম্রাজ্যর জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

ইউরোপীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণে তুর্কীরা এর আগেই সামন্ত প্রথার প্রবর্তন করে। আর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্য তার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল। এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের বহু বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গঠিত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ ছিল রাজধানী ইস্তাবুল (কনষ্টান্টিনোপলের নতুন নাম) থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত। তাছাড়াও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ফলে, প্রদেশগুলোকে প্রাদেশিক শাসক ও পাশাদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না। কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে এই সামন্ত শক্তি স্বাভাবিকভাবেই মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করল। ফলে প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ক্রমে দেখা দিল অসদ্ভাব।

অভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়াও ইউরোপীয় খৃস্টশক্তির পরিকল্পিত শত্রুতা তুর্কী সাম্রাজ্যের চলমান বিপর্যয়কে আরও বাড়িয়ে দিল। তাদের পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল ইউরোপের বুক থেকে তুর্কী আধিপত্যের অবসান ঘটানো তো বটেই, তদুপরি মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দানকারী এই তুর্কী শক্তিকে একেবারেই নিঃশেষ করে দেওয়া। তুর্কী শক্তির বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের মধ্যে রাশিয়াই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। রাশিয়াই অগ্রণী হয়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে নানা স্থানে প্রবল আন্দোলনের প্ররোচনা দিতে থাকে। রাশিয়া গ্রীকদের গির্জা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গ্রীক ও স্লাভদের উস্কানি দিতে থাকে। তুর্কী সাম্রাজ্যের খৃস্টান অধিবাসীদের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করতে থাকে বিদ্রোহের আগুন। রাশিয়ার প্ররোচনা ও আর্থিক সাহায্যে সে কাজে তারা অনেকটাই এগিয়ে যেতে থাকে।

এমনি পরিস্থিতিতে কালক্রমে এগিয়ে আসে ১৯১৪ খৃস্টাব্দ। এর মধ্যেই তুর্কীরা ইউরোপীয়দের কাছে হারিয়েছে তাদের অনেক বিজিত রাজ্য। এশিয়া আফ্রিকার অধিকাংশ মুসলিম প্রদেশেও তুর্কীবিরোধী ভাবধারা ও কার্যকলাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এসবের পেছনেও কার্যকর রয়েছে খৃস্ট জগত। "By 1900 the Christian countres of the West had decisively gained the upperhand in their prolonged political and military struggle with the Islamic world ১৯০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে প্রতীচ্যের খৃস্টান দেশগুলো ইসলামিক বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের দীর্ঘকাল প্রসারিত রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রামে চূড়ান্তভাবেই কর্তৃত্ব লাভ করেছে"। (ibid, p.12) কিন্তু সেসব দেশগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য বিরাজমান প্রতিযোগিতা তুর্কীদের বিরুদ্ধে শেষ পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা হয়ে দেখা দিয়েছিল। তুর্কীদের ধ্বংসের পর ইউরোপে নেতৃত্বের অধিকারী হবে কোন দেশ? তদুপরি ছিল সাধারণভাবে মুসলিম উম্মার সমর্থন। "The Peoples of the western half of the Islamic world- and even to some extent the Muslims of the Indian sub-continent after the decline of the Mogul Emperors- could look upon the Sultan Caliph in Constantinople as the protector and preserver of the intersets of the Muslim Umma of malion. ইসলামী বিশ্বের পশ্চিম অর্ধাংশ -- এবং মুঘল সম্রাটদের পতনের পর কিয়ৎ পরিমাণে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরাও কনস্টান্টিনোপলের সুলতান খলিফাকে মুসলিম উম্মা বা জাতির রক্ষক ও স্বার্থ সংরক্ষণকারী হিসাবে মনে করত। "উধৃতাংশে কিছুটা সংশোধনী এনে বলতে পারি, কিয়ৎ পরিমাণে নয়, বহুল পরিমাণেই ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা তুর্কী সুলতান খলিফাকে মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতীক বলে মনে করত; এবং এমনি মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছিল তাদের সংগঠিত খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে।

কিন্তু মনে করলে কি হবে; দুর্বল অসহায় মুসলিম উম্মা যে ততোধিক দুর্বল রক্ষক ও স্বার্থ সংরক্ষণকারীকে তার মৃত্যুশয্যা থেকে খাড়া করতেই অসমর্থ। অথচ ইউরোপীয় খৃস্টশক্তির প্ররোচনা ও উৎসাহে আরব জনপদগুলো ইসলামায়নের উর্ধ্বে আরবায়নের দুর্বলতাকে মোক্ষম ঔষধ বলে ধরে নিয়েছে। আরব জাতীয়তাবাদের

আন্দোলন এগিয়ে চলেছে তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে। "The revolt succeeded in that Turkish domination of these Arab heartlando was ended, but it also failed because it did not give the Arabs the freedom and independence they sought. On the contrary, it enabled the western powers to consolidate their hegemony over most of the rest of the islamic lands which had so far scaped their control. বিদ্রোহ সফল হয়েছিল ওসব আরব অঞ্চলের উপর তুর্কী আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে কিন্তু তা ব্যর্থও হয়েছিল এ কারণে যে, তা আরবদেরকে তাদের প্রার্থিত মুক্তি ও স্বাধীনতা দেয়নি। তার সম্পূর্ণ বিপরীতে তা পশ্চিমা শক্তিসমূহকে এতদিন ধরে তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেঁচে থাকা অবশিষ্ট ইসলামী ভূখণ্ডগুলোর অধিকাংশের উপরই তাদের কর্তৃত্ব সুসংহত করতে সক্ষম করে তুলেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাগাভাগি যখন সমাপ্ত, তখন ঘটেছিল আরবদের মোহমুক্তি। এবং এই মোহমুক্তির পর ১৯২০ থেকে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চালিয়ে গেল তাদের মুক্তি সংগ্রাম। সে সংগ্রাম ইউরোপীয় খৃস্টশক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থের সপক্ষে অতঃপর ইউরোপীয়দের স্বার্থ সংঘাত এবং ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

হ্যা, আরবরা স্বাধীনতা পেয়েছিল, ইউরোপ আমেরিকার ছত্রছায়ায় দেওয়া স্বাধীনতা। আর তখনই আরব ভূখণ্ডের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খুবই খর্বাকৃতি একটি রাষ্ট্র, ইহুদীদের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ইসরাইল।

সমাপ্ত

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ঃ মদীনা গ্রাফিক্স সিস্টেমস
৫৫/বি, পুরানা পল্টন (দোতালা) ঢাকা-১০০০। ফোনঃ ৭১১০৪৬০